ভারতের কীটপতঙ্গ

ভারত——দেশ ও দেশবাসী

ভারতের কীটপতঙ্গ

এম. এস. মানি

অনুবাদ

ঈশানী রায়চৌধুরী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ভূমিকা

ভারতের কীটপতঙ্গের বিচিত্র জগৎ ও জীবনযাত্রার কিছু দিক তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইটিতে। কীটপতঙ্গের বৈচিত্র্যময়তায় ও সৌন্দর্যে পৃথিবীর অন্য যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় এই দেশ সমৃদ্ধতর। বইটি লিখতে গিয়ে বারে বারে তাই চিন্তা করতে হয়েছে কোন্ প্রসঙ্গ বাদ দেব, কোন্‌টি উল্লেখ করব। পতঙ্গ বিশেষজ্ঞদের জন্য এই বই নয়; সাধারণ পাঠকদের আগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টাই করেছি। তত্ত্বের কূটকচালি বাদ দিয়ে তথ্যের চিত্তাকর্ষক পরিবেশনই মূল লক্ষ্য। গত চল্লিশ বছর ধরে দুচোখ ভরে যা দেখেছি, তাই লিখতে চেষ্টা করেছি এই বইয়ের ছত্রে ছত্রে।

আমার এই প্রয়াস কেতাবী অনুসন্ধান নয়। বক্তব্য হল, মানুষ ও কীটপতঙ্গ একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পারস্পরিক নির্ভরতা, সহনশীলতা ও সমঝোতা অন্তত গত সাত হাজার বছর ধরে সৃষ্টি হয়েছে। ফলশ্রুতি প্রকৃতির ভারসাম্য। আমাদের পূর্বপুরুষরাও ভারসাম্যকে মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু আমরাই সেই ঐতিহ্য ভুলতে বসেছি। কীটপতঙ্গরা আমাদের মতোই ভারতীয়। বিশেষজ্ঞরা ভাবেন যে, কীটপতঙ্গ মাত্রেই ধ্বংস করা উচিত, তাদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। কিন্তু ধারণাটা একেবারেই ভ্রান্ত। কীটপতঙ্গের প্রতি ভালবাসা জাগানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

যেসব আলোকচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তা নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত। বেশির ভাগই জীবন্ত কীটপতঙ্গের ছবি। ছবিতে তাদের নানা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।

যদি পাঠক সমাজে আমার এই বই সমাদৃত হয়, সেটা হবে আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

এম. এস. মানি

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সংখ্যাতীত কীটপতঙ্গ

কীটপতঙ্গ কি?

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের মুনিঋষি ও কবিরা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের গুণগান করেছেন। কিন্তু এটা কেউ ভেবে দেখিনি প্রকৃতির সবুজ সৌন্দর্যের আড়ালে কীটপতঙ্গের অবদান কতখানি। ভাবতে অবাক লাগে যে ফল, ফুল, গাছপালা কোন কিছুরই আস্তিত্ব থাকত না কীটপতঙ্গেরা যদি না থাকত। এমন কি আমরা যে জামা কাপড় পরছি, ফলপাকড় খাদ্যশস্য উৎপাদন করছি—সবই কীটপতঙ্গের অবদান। আমাদের বন-বাগান আলো করে যখন রংবেরঙের ফুল ফোটে, এই ভেবে আমরা উৎফুল্ল হই যে ঘর সাজাবো, দেবতার পূজা করব, জননায়কের গলায় মালা পরাবো। কিন্তু সত্যি যা তা হল, মানুষের আনন্দের জন্য নয়, গাছ ফুল ফোটায় কীটপতঙ্গকে আকর্ষণ করার জনাই, যাতে পরাগমিলন সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত ঘটে। মানুষ ফুল ভালবাসে, তার ভালবাসা আনুষঙ্গিক। কীটপতঙ্গদের বেলায় তা নয়। আমরা ভেবে দেখি না যে, কীটপতঙ্গ না থাকলে সমস্ত জমি আবর্জনায় ভরে যেত, দূষিত হত। মাছ ও পাখি সকলেরই বন্ধু এরা। মধু বা রেশম কিছুরই অস্তিত্ব থাকত না এদের অভাবে। কীটপতঙ্গেরা সুন্দর প্রকৃতিকে সুন্দরতর করে তুলেছে, পৃষ্ঠপোষকতা করেছে আমাদের কৃষি, শিল্প ও সভ্যতাকে।

কীটপতঙ্গদের সঙ্গে আজন্ম পরিচয় আমাদের। মশা, মাছি, ছারপোকা, পিঁপড়ে, প্রজাপতি, মৌমাছি—হাতে গুণে শেষ করা যায় না। প্রত্যেকেরই ছটা করে পা। সংস্কৃতে এদের উল্লেখ আছে 'ষড়্‌পদ' বলে। অনেক পরে ইউরোপের বিজ্ঞানীরা এদের লাতিন নাম দেন হেক্সাপোডা *(Hexapoda)* —হেক্সা অর্থে ছয় ও পোডা অর্থে পদ।

মাকড়সা, কাঁকড়াবিছে শতপদী, সহস্রপদী—এইসব কীট কিন্তু অন্য ধরনের। যেসব কীটপতঙ্গের কথা আমরা আলোচনা করছি আলাদাভাবে তাদের মাথা, দেহকাণ্ড, বুক আর পেট থাকে। মাথার ওপর অত্যন্ত সংবেদনশীল এক জোড়া শুঁড়। শুঁড়ের সাহায্যে তারা চলাফেরা করে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন জিনিসের গন্ধ পেতে, সংবাদ দিতে ও নিতে এবং আরও নানা বিচিত্র কাজ করতে কীটপতঙ্গরা শুঁড়ের সাহায্য নেয়।
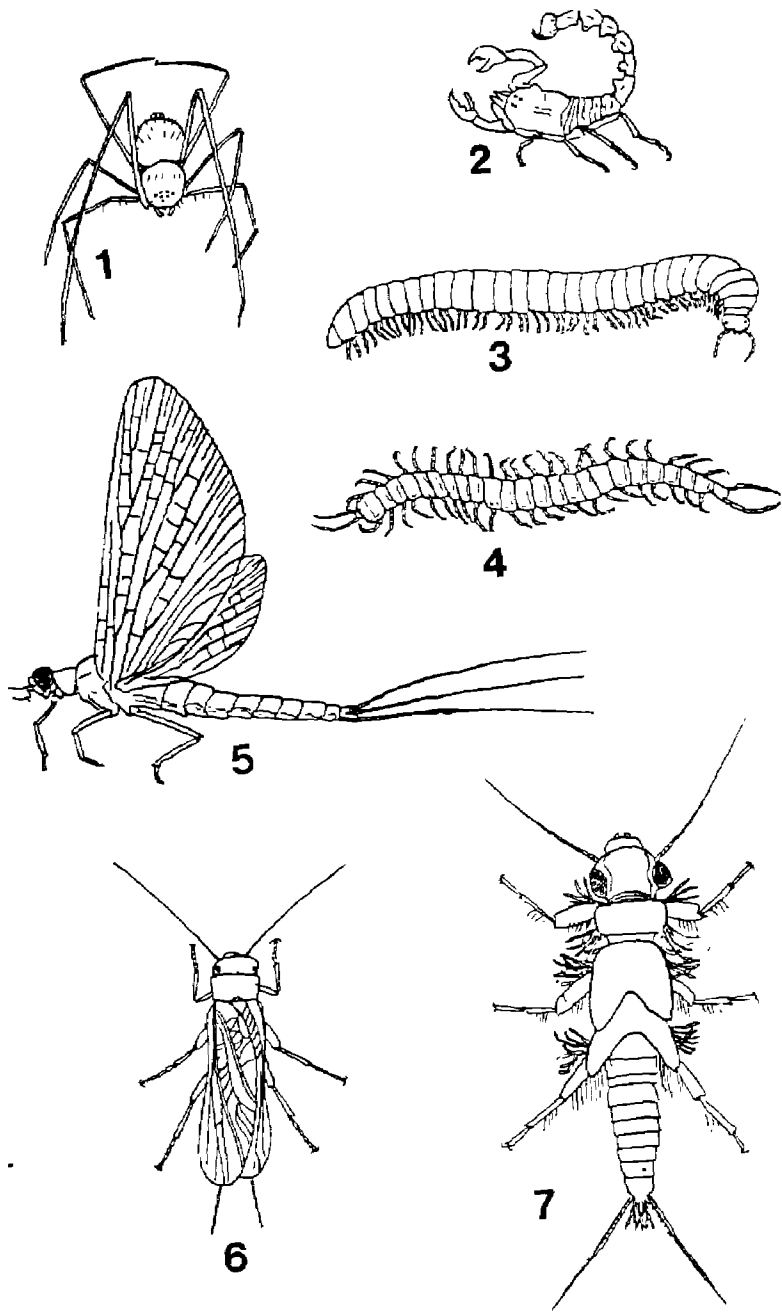
সাধারণ স্থলচর বহুপদী কীটপতঙ্গ : 1. মাকড়সা, আটটি পা বিশিষ্ট, দেহ দুটি খণ্ডে বিভক্ত; 2. কাঁকড়া বিছে, এরও আটটি পা; 3. সাধারণ সহস্রপদী কীট, অগুণতি পা, প্রতি ভাগে দুটি করে; 4. সাধারণ শতপদী কীট, যার প্রতিটি দেহাংশে একজোড়া পা; 5. মে ফ্লাই; 6. স্টোনফ্লাই (পূর্ণাঙ্গ); 7. স্টোনফ্লাইয়ের শূককীট, যার একাধিক কানকোর মতো শ্বাসযন্ত্র, জলের ভেতর শ্বাস নেওয়ার জন্য।

মাথার ওপর শুঁড় ছাড়াও থাকে দুটো পুঞ্জাক্ষি। প্রায় বিশ হাজার আলাদা চোখের সমষ্টি এরা। ছটা পা সংযুক্ত থাকে বুকের সঙ্গে। বেশির ভাগ পতঙ্গেরই থাকে এক বা দুই জোড়া ডানা। বস্তুত, কীটপতঙ্গের জন্ম পৃথিবীর আদিতে, এমন কি পাখিদেরও অনেক আগে।

এদের দেহ ফাঁপা বর্মের মত এক রকম খোলসে ঢাকা যা অত্যন্ত হালকা, ঠাস বুনোট, শক্ত অথচ ইচ্ছেমত নাড়ানো যায়, যা বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়কারক রাসায়নিক পদার্থ প্রতিরোধ করতে পারে। আসলে খোলাটা পতঙ্গের কঙ্কালের মতো, বাইরে থেকে দেখা যায়, আমাদের মতো ভারি ও অস্থিসর্বস্ব নয়। এই ধরনের বহির্কঙ্কাল এক ধরনের জটিল রাসায়নিক পদার্থ চিটিন *(chitin)*-এ তৈরি। অপর বিস্ময় হল, এদের শ্বাসক্রিয়া। মানুষ ও বেশির ভাগ প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় ফুসফুসের মাধ্যমে বাইরের বাতাস দেহের ভেতর আসে, আর রক্ত চলাচলের মাধ্যমে হৃদ্‌পিণ্ড বাতাসের অক্সিজেনটুকু নিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দেয়। বিশুদ্ধ রক্ত আমাদের দেহের প্রতি কোষে অক্সিজেন ছড়িয়ে দেয়। সবই সম্ভব হয় রক্তকণিকা 'হিমোগ্লোবিন'-এর জন্য। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে তৈরি করে এক ধরনের অস্থায়ী যৌগ যা আবার তাড়াতাড়ি ভেঙে গিয়ে কোষে সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন। কিন্তু কীটপতঙ্গের রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে না, থাকে না শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ, থাকে না ফুসফুস। এদের ক্ষেত্রে বাতাস সরাসরি পৌঁছে যায় কোষে সরু সরু নালি বা ট্র্যাকিয়ার মধ্যে দিয়ে। কীটপতঙ্গের জীবনীশক্তি ও কাজ করবার ক্ষমতা তাই অনেক বেশি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটা স্ট্যাগহর্ণ বীটল নিজের ওজনের নব্বুই গুণ বেশি ওজন, নিজের দৈর্ঘ্যের তিরিশ গুণ বেশি লম্বা রাস্তায়, আধঘণ্টা ধরে টানা বয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং একটুও ক্লান্ত হয় না। সাধারণ মাছির পা এক মিলিমিটারও লম্বা নয়, অথচ অনুভূমিকভাবে বত্রিশ সেন্টিমিটার দূরত্ব এবং কুড়ি সেন্টিমিটার উচ্চতা লাফিয়ে পার হতে পারে। একশো আশি (180) সেন্টিমিটার লম্বা মানুষ যদি মাছির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে তাহলে মানুষকে আনুপাতিক ভাবে আড়াইশো (250) মিটার দীর্ঘ ও একশো সাঁইত্রিশ (137) মিটার উঁচু লাফ দিতে হবে। যা একেবারেই অসম্ভব। কীটপতঙ্গের আকার ব্যাপকভাবে বিভিন্ন রকম। এমন ছোট কীটপতঙ্গ আছে যাদের খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না। আবার কিছু রাক্ষুসে আকারেরও হয়। সব থেকে ছোটটা বড় মাপের অ্যামিবার থেকেও ছোট, দৈর্ঘ্যে 0.25 মিলিমিটারের কম। সবচেয়ে বড় জলফড়িং বা গয়ালপোকা বা ড্রাগনফ্লাই-এর জীবাশ্ম প্রায় পঁচাত্তর (75) সেন্টিমিটার লম্বা। বৃহত্তম তাই ক্ষুদ্রতমের প্রায় তিনশো (300) গুণ বড়।

কীটপতঙ্গের আকৃতির মতোই রঙেরও রকমফের হয়। কিছু হয় ম্যাড়মেড়ে, কিছু উজ্জ্বল সাদা, হলুদ, কমলা, লাল, বাদামী, সবুজ, নীল, বেগুনি বা কালো। অনেকের গা আবার রামধনুর মতোই রংবেরঙের, ধাতুর মতো চকচকে সবুজ, নীল বা তামাটে লাল। অধিকাংশ কীটপতঙ্গের দেহে রয়েছে উজ্জ্বল ফুটকি, ডোরা বা অন্য ধরনের দাগ, বিভিন্ন বর্ণের নকশা। কিছু কাঁচপোকা, প্রজাপতি ও মথ খুবই সুন্দর। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই বিচিত্র রঙের উৎস নানা ধরনের রঞ্জক পদার্থ, আলোর প্রতিফলন,

বিশেষ ও বাছাই করা আলোর শোষণ, প্রতিসরণ, প্রতিফলন, বিক্ষেপন, ব্যতিচার—যা ঘটে কীটপতঙ্গের দেহের ক্ষুদ্র ত্বকে। বেশির ভাগ রঙের উৎসই হল গাছে পাতার ক্লোরোফিল ও ক্লোরোফিল-ঘটিত যৌগ যা কিনা জন্মের পর থেকেই কীটপতঙ্গ খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। তাছাড়াও আছে ক্যারোটিন সঞ্জাত রঞ্জক, মেলানিন ইত্যাদি। এদের দেহের সাদা রঙের উৎস হল জমা হওয়া ইউরেট কেলাস। কীটপতঙ্গের ত্বকের ক্ষুদ্রাকৃতি আলোর মিশ্রণে দেখতে হয় চিত্রাভ সবুজ, নীল, লাল, বা বেগুনি। প্রজাপতি, মথ, কাঁচপোকাদের গায়ের বিচিত্র রঙের জন্য রঞ্জক পদার্থ দায়ী নয়, সবটাই শুধু আলোর খেলা।

প্রাচীন গোষ্ঠী

জীবজগতে কীটপতঙ্গ অতি প্রাচীন। প্রত্নপ্রস্তর যুগের (300,000,000 বছর আগে) কার্বোনিফেরাস (অঙ্গার-উৎপাদী) অধ্যায়ে এদের প্রথম জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। সবচেয়ে পুরানো কীটপতঙ্গ অধুনালুপ্ত প্যালিওডিকটিওপটেরা গোষ্ঠীর *(Palaeodyctioptera)*। এরা ডানার সাহায্যে এলোমেলোভাবে উড়ত। সাধারণ আধুনিক পতঙ্গের মতো একজোড়া ডানা ছাড়াও এদের ডানার সামনে থাকত কানের লতির মতো এক জোড়া ক্ষুদ্র অর্ধবৃত্তাকার ডিমালো অংশ। পূর্ণবয়স্ক এই সব নভোচর পতঙ্গের আয়ু ছিল কম, সূর্যের আলো ও বাতাস উপভোগ করত মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য। বরং অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় জীবনকাল ছিল বেশি। তখন এদের জলচর অবস্থা। জন্ম থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ছিল যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ, এক বছর, দু বছর বা আরও বেশি। এরা ছাড়া এই একই সময়ে ছিল অতিকায় সব আরশোলা। পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের আবির্ভাব ঘটার বহু বছর পর মানুষের জন্ম তুলনায় শিশু। প্রাচীনকালে এই কীটপতঙ্গরাই পৃথিবীর বুকে একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করেছিল। অবশ্য ভেবে দেখলে এখনও তাই, মানুষ যা করেছে তাকে জবরদখল ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

কোথায় জন্মায় ?

সারা পৃথিবী জুড়েই কীটপতঙ্গের বসতি—সাগরতীর থেকে শুরু করে দুর্গম পাহাড়চূড়া পর্যন্ত—মালভূমিতে, মরুভূমিতে, ঘনজঙ্গলে, তৃণভূমিতে, সবজিবাগানে, ফলের বাগানে, শস্যক্ষেত্রে, হ্রদে, পুকুরে, জলায়, নদীতে, ঝর্ণায়, কুয়োয়, গুহায়, মাটিতে, তুষারে, হিমবাহে, এমন কি সুমেরু, ও কুমেরু অঞ্চলেও। এদের পাওয়া যায় মনুষ্যবসতিতে, রান্নাঘরে, অফিসে, স্কুল-কলেজে, রসায়নাগারে, গুদামে, কলকরখানায়, গ্রন্থাগারে, যাদুঘরে, গাছপালায়, মায় মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের দেহে—কোথায় নয়। আছে পাথরের নিচে, ঝরাপাতার তলায়, গাছের গুঁড়িতে, পচা খাবারে ও জীবজন্তুর দেহে, আবর্জনার গাদায়, শষ্যের গোলায়, তৈরি জিনিষে, বইয়ের তাকে, জামা কাপড়ে—সর্বত্র। পৃথিবীতে এক বর্গ সেন্টিমিটার জায়গাও বোধহয় খালি পাওয়া যাবে না যেখানে কোন না কোন কীটপতঙ্গ নেই।

সংখ্যায় কত ?

পৃথকভাবে বা প্রজাতিগত বিচারে এই কীটপতঙ্গের সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের থেকে বেশি। ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিকেরা পঁচাত্তর (75) লক্ষ কীটপতঙ্গের নাম নথিবদ্ধ করেছেন। অনামা ও অনাবিষ্কৃত কীটপতঙ্গ যে আরও কত আছে কে জানে! সবার পরিচয় দিতে গেলে পাঠাগার ভরে যাবে। এই নিয়ে অসংখ্য প্রকৃতি বিজ্ঞানী নিরলস গবেষণা করে চলেছেন।

কীটপতঙ্গের জন্মহার অত্যন্ত বেশি। ভাবা যায় না। এদের শ্রেণীবিন্যাস করা তাই খুবই অসুবিধা। আবার এদের মৃত্যুহারও যথেষ্ট বেশি। তবু যুগ যুগ ধরে এদের আধিপত্য বজায় আছে, এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে এরা প্রসার লাভ করেছে। অবশ্য বহু প্রজাতি লুপ্ত হয়ে গেছে। জীবাশ্ম থেকে অন্তত বারো হাজারেরও (12,000) বেশি লুপ্ত প্রজাপতির হদিশ পাওয়া গেছে। আবার বহু প্রজাতি লুপ্ত হয়ে গেছে যাদের জীবাশ্ম নেই।

শ্রেণীবিভাগ

কীটপতঙ্গ প্রাণীজগতের যে প্রজাতির অন্তর্গত তা হল ফাইলাম আর্থ্রোপোডা *(Phylum arthropoda)*। অর্থাৎ সংযুক্তপদ বিশিষ্ট জীব। এই একই প্রজাতির মধ্যে পড়ে বাগদাচিংড়ি, গলদাচিংড়ি, কুচোচিংড়ি, দশপেয়ে কাঁকড়া, কাঁকড়াবিছে, মাকড়সা, ঘুণপোকা, উইপোকা, এঁটুলি (আট পায়ের কীট), তেঁতুলবিছে, আর কেন্নো (প্রায় দুই ডজন পা)।

বিজ্ঞানীরা কীটপতঙ্গকে চৌত্রিশটি বড় শাখায় ভাগ করেছেন। এরা আবার অসংখ্য প্রশাখায় বিভক্ত। কীটপতঙ্গের ডানার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, খাদ্য গ্রহণের বিভিন্নতা, ডিম থেকে পূর্ণবয়স্ক হবার প্রকারভেদ ও শারীরিক গঠনের ওপর ভিত্তি করেই এই বিচার সম্ভব।

পতঙ্গের নামকরণ

উদ্ভিদ ও জন্তুর মতোই কীটপতঙ্গের বৈজ্ঞানিক নামও দুটো অংশে বিভক্ত। প্রথম নামের প্রচলন 1758 খ্রীষ্টাব্দে, যখন কার্ল ভন লিন (বা লিনেয়াস) তাঁর বিশাল গ্রন্থ 'সিস্টেমা-নেচার'-এর দশম সংস্করণ প্রকাশ করেন। কার্ল ছিলেন একজন সুইডিশ প্রকৃতিবিদ। দুইভাগবিশিষ্ট নামের প্রথম অংশ বড় হরফ দিয়ে শুরু, নির্দেশ করে কীটপতঙ্গের বর্গ, এবং দ্বিতীয় অংশ (ছোট হরফ দিয়ে শুরু) নির্ণয় করে প্রজাতি। সাধারণ মাছির নাম মুসকা নেব্যুলো *(Musca nebulo)* । আরশোলা হল পেরিপ্ল্যানেটা আমেরিকানা *(Periplaneta americana)*। ছারপোকার নাম সাইমেক্স রোটাণ্ডেটাস *(Cimex rotundatus)*। আর মরুভূমির পঙ্গপাল হল সিস্টোসারকা গ্রেগারিয়া *(Schisto-cerca gregaria)*। আন্তর্জাতিক প্রাণীবিদ্যার নামকরণের নিয়ম পুরোপুরি মেনে নিয়ে বিশেষজ্ঞরা এই নামকরণ করেছেন সব দেশে যা সমানভাবে স্বীকৃত।

বিভিন্ন প্রজাতি

সর্বাধুনিক শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী বিভিন্ন কীটপতঙ্গকে নিম্নলিখিত প্রজাতিতে ভাগ করা যায় :

প্রজাতি 1 : **এফেমেরিডা** *(Ephemerida)*— মেফ্লাই *(Mayflies)*। অল্প আয়ুর পতঙ্গ। অপরিণত অবস্থায় জলচর প্রাণী। পূর্ণতা আসতে সময় লাগে এক বছর কি তারও বেশি। প্রাপ্তবয়স্কের দুই জোড়া ডানা—আয়ু কয়েক ঘণ্টা মাত্র। সেইটুকু সময় এরা খায় না, কিন্তু বাতাস টেনে নিয়ে শরীরের প্লবতা বাড়িয়ে নেয়, যাতে উড়ন্ত অবস্থায় বংশবৃদ্ধির জন্য পরস্পর মিলিত হতে পারে। জলে ডিম প্রসব করাব সামান্য পরেই স্ত্রী পতঙ্গের মৃত্যু ঘটে।

প্রজাতি 2 : **প্লিকপ্টেরা** *(Plecoptera)*—স্টোনফ্লাই। অপরিণত অবস্থায় এক বা দুই বছর এরা বাস করে পাহাড়ী ঝর্ণার ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার জলে। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এক জোড়া ডানা নিয়ে এরা বেরিয়ে আসে শীতের সময়, তারপর পাথরের নিচে ঢুকে পড়ে, বংশবৃদ্ধি করে। ডিম প্রসব করার পরই মারা যায়।

প্রজাতি 3 : **ওডোনাটা** *(Odonata)*—জলফড়িং বা গয়ালপোকা ও তরুণী ফড়িং। রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে এরা সর্বদাই শিকার খোঁজে—অপরিণত ও পূর্ণাঙ্গ দুই অবস্থাতেই। অপরিণত অবস্থায় এরা জলে বাস করে। পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গেব দুই জোড়া ডানা, খুব জোরে উড়তে পারে। বিশাল পুঞ্জাক্ষি, প্রায় সারা মাথা জুড়ে। পাগুলো শক্ত হাড়ের তৈবি, দেখতে যেন ছোট একটা ঝুড়ি, যাতে উড়ন্ত অবস্থায় শিকার ধরে রাখা যায়।

প্রজাতি 4 : **অর্থোপ্টেরা** *(Orthoptera)*—ঘাসফড়িং, পঙ্গপাল ও ঝিঁঝিপোকা। বেশির ভাগ সময়ই ওড়ে। আছে দুই জোড়া ডানা, সামনের জোড়া চামড়ার সরু আবরণের মতো আব পেছনের জোড়া বড় আর ঝিল্লীময়। সামনেব পায়ের তুলনায় পেছনের পা মোটা আর লম্বা। এতে লাফানোব সুবিধা। এরা সাধারণত তৃণভোজী।

প্রজাতি 5 : **ফ্যাসমিডা** *(Phasmida)*—পত্রাকৃতি পতঙ্গ ও ছড়িপোকা। এদের শরীর গাছের পাতার মতো চ্যাপটা, নয়তো শুকনো ডালের মতো সরু, লম্বা।

প্রজাতি 6 : **ডারম্যাপ্টেরা** *(Dermaptera)*—-কেওড়া জাতীয় কীট। বেশির ভাগই গাঢ় রঙের। শক্ত শরীর। সামনে ছোট, ছুঁচালো ডানা, পেছনের ঝিলিককাটা ডানা জোড়াকে লুকিয়ে রাখে। তবু পেটের খানিকটা অংশ অনাবৃত থাকে। শরীরের সামনে থাকে সাঁড়াশির মতো এক জোড়া উপাঙ্গ। এই সব পতঙ্গ সাধারণত থাকে মাটির নিচে, প্রাণধারণ করে গাছের শিকড় খেয়ে।

প্রজাতি 7 : **ব্ল্যাটারিয়া** *(Blattaria)*—আরশোলা। এরা চ্যাপ্টা দেহের দ্রুতগামী পতঙ্গ। সামনের ডানাজোড়া চকচকে পাতলা চামড়ার মতো। পেছনের ডানা জোড়ায় ঝিল্লীময়। এরা সর্বভূক।
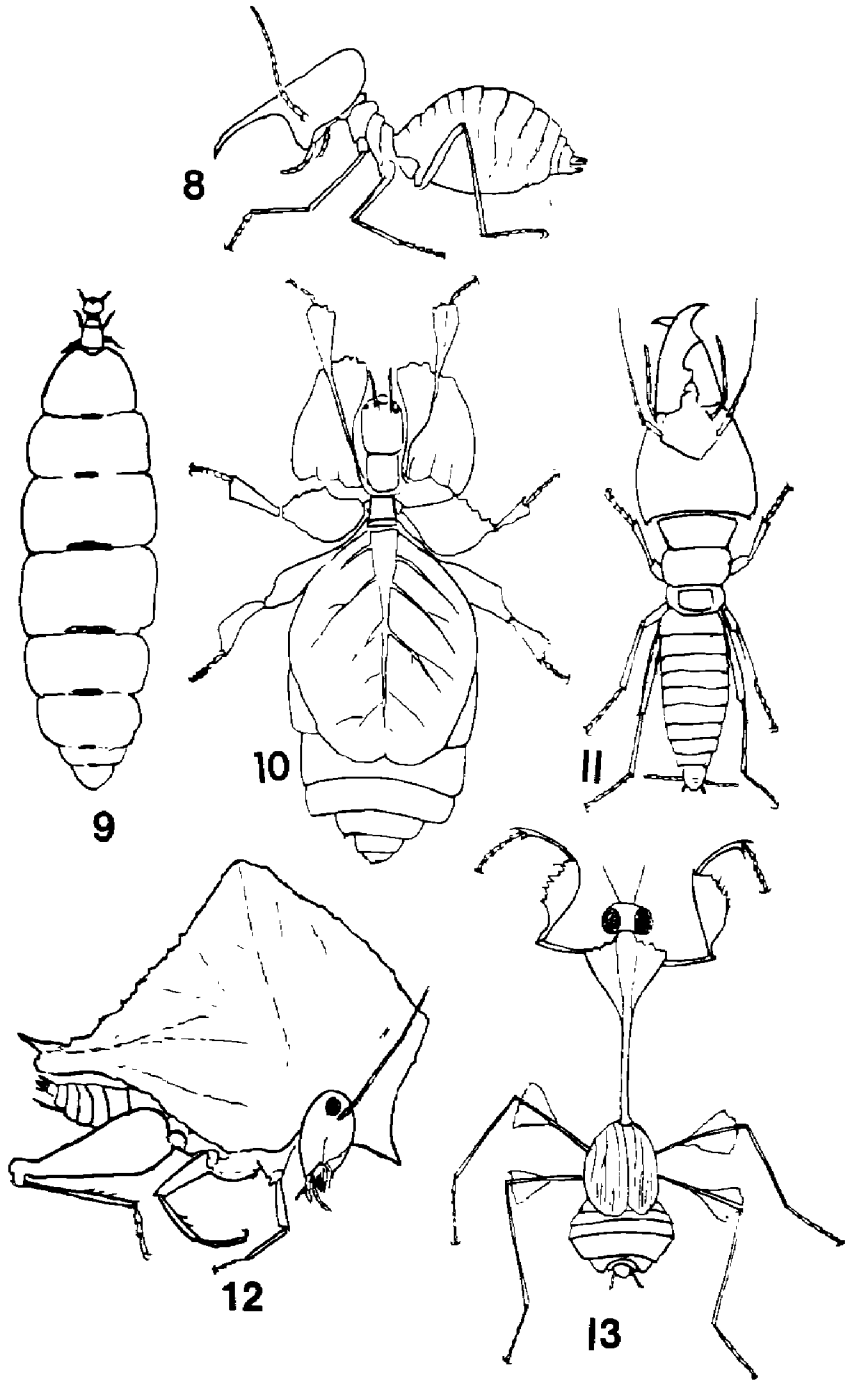
৪. ন্যাসিউট সোলজার টারমাইট (উইপোকা); 9. রাণী উইপোকা; 10. পাতা পতঙ্গ; 11. সৈনিক উইপোকা; 12. *ইলোটেটিক্স;* 13. অদ্ভুতদর্শন প্রেইং ম্যানটিড, *গনজিলাস গনজিলোইডেস,* দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা। দেহ কাঠির মতো আর পায়ের কাছটা চওড়া, গাছের পাতার মতো। এরা ঘাসে বসবাস করে।

প্রজাতি 8 : **ম্যানটোডিয়া** *(Mantodea)*—প্রেইং ম্যানটিড। ডানা দুইজোড়া। সামনের পাগুলো এমনভাবে তৈরি যাতে চট করে জীবন্ত শিকার ধরতে পারা যায়।

প্রজাতি 9 : **আইসপ্টেরা** *(Isoptera)*—ঘুণপোকা, উইপোকা। দেহ নরম। ডানা থাকতেও পারে, নাও পারে। বাস সাধারণত মাটির নিচে। খাদ্য হল গাছ, কাঠ, বন বা শাকসবজি। এরা সমাজবদ্ধ জীব। প্রায়ই দেখা যায় মাটির নিচে ঢিবি বানিয়েছে।

প্রজাতি 10 : **সকোপ্টেরা** *(Psocoptera)*—বই ও গাছের ছালের পোকা। আকারে ছোট। দেহ নরম। ডানাযুক্ত বা ডানাবিহীন। দৌড়াতে ও লাফাতে পারে। বাসস্থান গাছের ছালে, শুকনো বা ঝরা পাতায়, পুরনো স্যাঁতসেঁতে বই বা কাগজে।

প্রজাতি 11 : **থির‍্যাপ্টেরা** *(Phthiraptera)*—দংশক কীট ও শোষক কীট। উকুন, এঁটুলি জাতীয় কীট। মানুষের মাথায়, বানর ও পাখির দেহে বাসা বাঁধে। খুব ছোট, ডানাবিহীন পরাশ্রয়ী কীট। পাখি ও স্তন্যপায়ী জীবদেহের নানা অংশে বাসা বাঁধে ও আশ্রয়দাতার শরীর থেকে রক্ত, পালক, চুল, মরা চামড়া খায়।

প্রজাতি 12 : **থাইস্যানপ্টেরা** *(Thysanoptera)*—ফুলের পোকা। ছোটখাটো দেখতে, শরীরে অত্যাধিক মাত্রায় রঞ্জক পদার্থ থাকে। সরু ঝিল্লীময় ডানা—যার গায়ে হালকা পাতলা লোম। সাধারণত দেখা যায় ফুলে।

প্রজাতি 13 : **হেটেরপ্টেরা** *(Heteroptera)*—ছারপোকা জাতীয় বাগ। দেখতে বড়। শক্ত দেহের জীব। সামনের ডানা জোড়া মোটা চামড়ার মতো, কখনও বা ছুঁচালো। গোড়ার অংশ ঝিল্লীময়। পেছনের ডানাজোড়া পুরোপুরি ঝিল্লীময়। মাথার আগা ঠিক পাখির ঠোঁটের মতো। আগা ঢুকিয়ে গাছের গা থেকে রস বা মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর গা থেকে রক্ত শোষণ করে। এরা অস্থায়ীভাবে পরাশ্রয়ী।

প্রজাতি 14 : **হোমোপ্টেরা** *(Homoptera)*—সিকাডা, জাবপোকা বা এফিড্, আঙ্গুরে পোকা, চাম। কখনও আকারে বড়, বেশির ভাগ সময় ছোট। নরম গা, দু জোড়া ডানাতেই ঝিল্লী। মাথার প্রান্ত ভাগ শোষণযন্ত্রের মতো। এরা ডানা বিহীনও হয়। খাদ্য প্রধানত গাছের রস।

প্রজাতি 15 : **কোলিওপ্টেরা** *(Coleoptera)*—গুবরেপোকা, কাঁচপোকা। বড় ছোট বা সূক্ষ্ম ধরনের। শরীর শক্ত। কখনও বা গায়ের রঙে আলোর ছটা দেখা যায়। সামনের ডানাজোড়া ছুঁচালো শক্ত বর্মের মতো। রক্ষা করে পেছনের নরম ঝিল্লীময় ডানাজোড়া। এরা সর্বভূক, কখনও কখনও নিরামিষাশীও।

প্রজাতি 16 : **হাইমেনপ্টেরা** *(Hymenoptera)*—বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছি ও পিঁপড়ে। এদের দুই জোড়া ডানাতেই ঝিল্লী। পেছনের ডানাজোড়া সব সময়ই সামনের জোড়ার থেকে ছোট। এরা অনেক সময় শিকার ধরে খায়, কখনও বা শাকাহারী, আবার গলিত মাংস, পরাগরেণু বা মধুও খায়। অধিকাংশ সময়ে এরা পরাশ্রয়ী জীবও বটে।
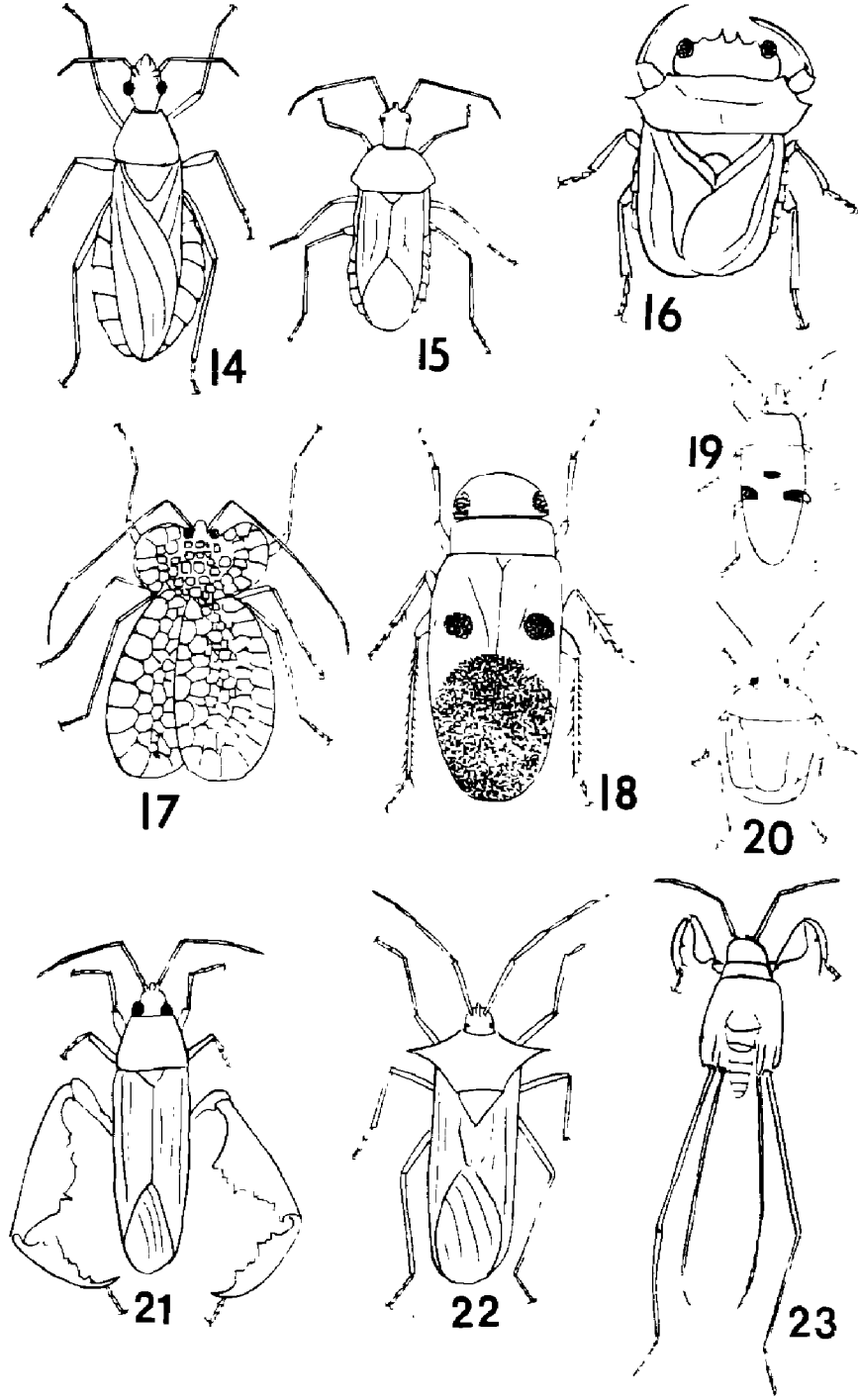
কিছু সাধারণ বাগ : 14. রেডুভিড *(কনোরহাইনাস)*; 15. *গনোসেরাস*; 16. *মনোনিক্স* ওয়াটার বাগ; 17. টিটনগিড (লেসবাগ); 18. *নেফোটেটিক্স*; 19. স্কুটেলারিড বাগ, *ক্রাইসোকোরিস*; 20. পেণ্টাটোমুইড *ইউসারককোরিস*; 21. স্পাইনি বাগ *মেরোপ্যাকিস*; 22. *ক্ল্যাভিগ্রেরা*; 23. অ্যাকোয়াটিক বাগ, *ইউরাটিস*।
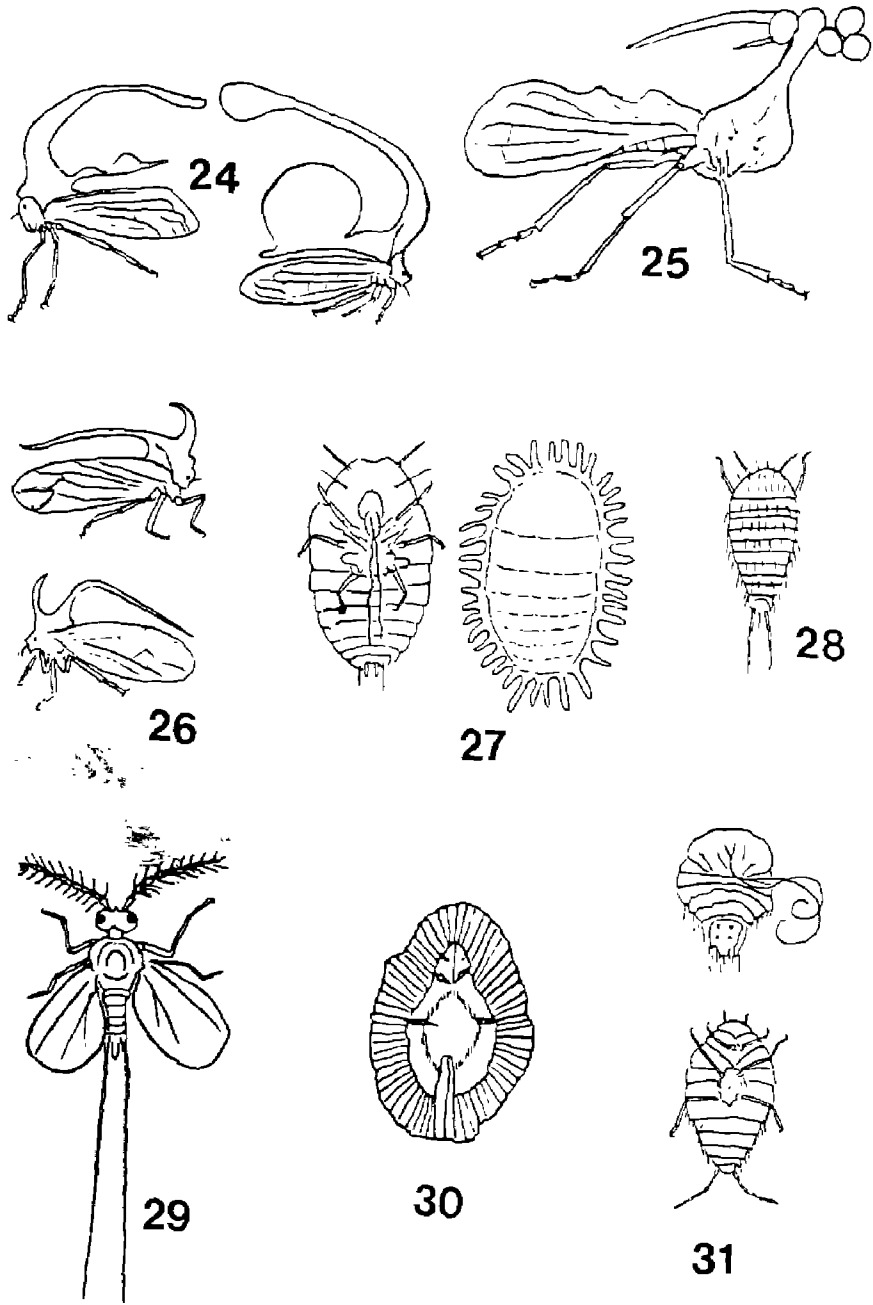
24, 25, 26. কিছু বিচিত্র মেমব্রাসিড বাগ, যাদের অদ্ভুত শৃঙ্গ, মুণ্ডজাতীয় অংশ, শিরদাঁড়ার মতো অংশ ও প্রত্যঙ্গ। এরা নিরীহ, গাছের রস পান করে। 27, 28, 29, 30, 31. মিলি বাগ্‌স, ককিডস আর স্কেল কীটপতঙ্গ। স্থায়ীভাবে গাছের রস পান করে নিয়ে গাছকে নষ্ট করে দেয়। দেহ থেকে মোমজাতীয় নির্যাস নিঃসৃত করে। কেবলমাত্র অল্পবয়স্ক শূককীটই(28) পছন্দসই জায়গার খোঁজে ঘোরফেরা করে আর সরু সূচের মতো প্রত্যঙ্গ (31) দিয়ে গাছের গায়ে ফুটো করে ওই জায়গাতেই স্থায়ীভাবে থেকে যায়। এরা গাছের রস পান করে করে গাছকে শুষ্ক করে দেয়।
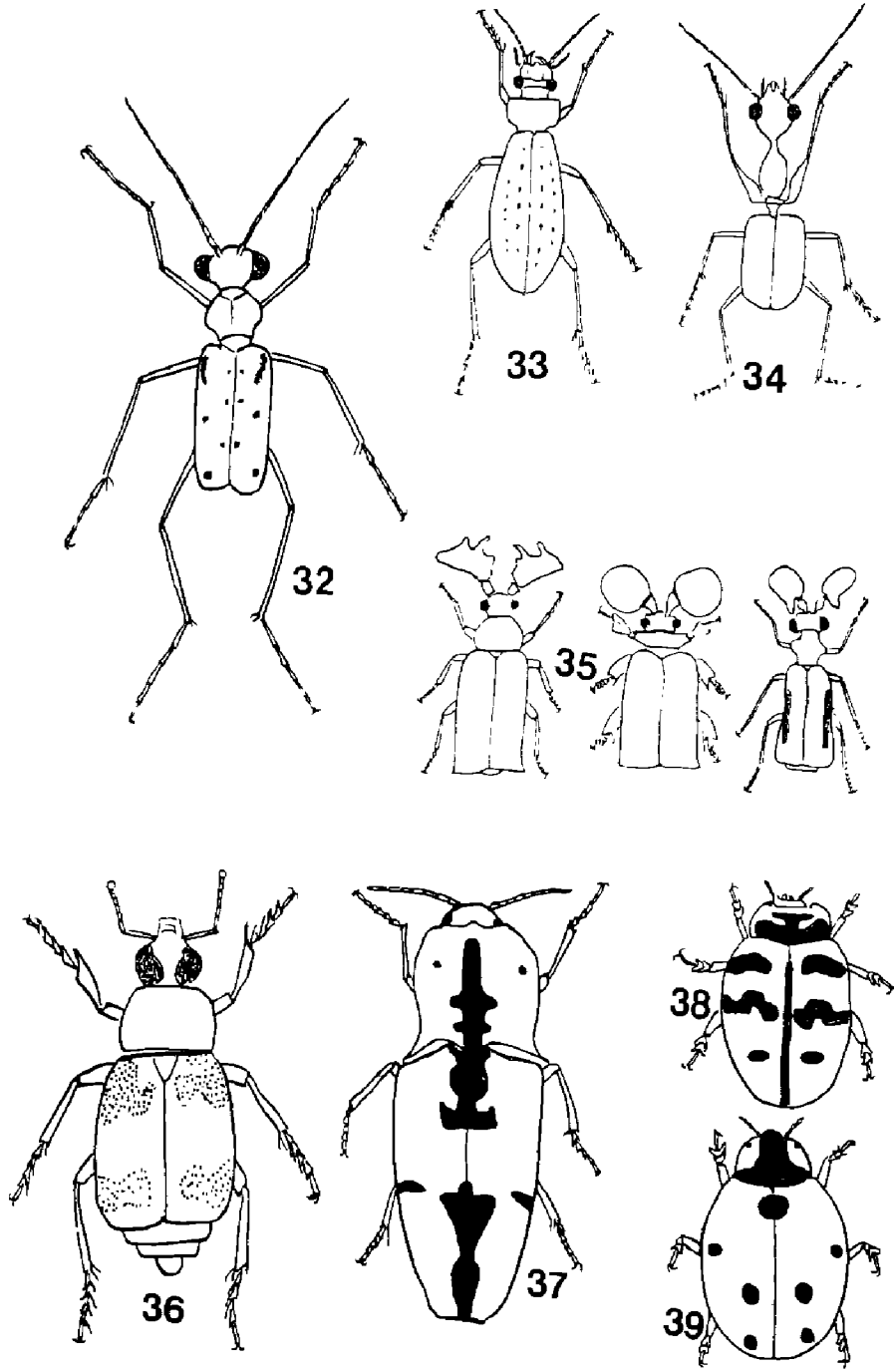
32. সাধারণ টাইগার বীটল, *সিসিনডেলা;* 33. সাধারণ গ্রাউণ্ড বীটল, *ক্যারাবাস;* 34. পিঁপড়ের মতো গ্রাউণ্ড বীটল, *সেলিনা।* 35. কিছু সাধারণ পসিড বীটল যার অদ্ভুত দর্শন শুঁড়; 36. সেক্সটন বীটল, *নেক্রোফেরাস;* 37. ক্লিক বীটল, *অ্যালস স্পেসিওসাস;* 38. ছয় বিন্দুর লেডীবার্ড বীটল, *মেনোকাইলিস;* 39. সাতটি বিন্দুযুক্ত লেডীবার্ড বীটল, *ককিনেলা সেপটেমপাংকটাটা।*
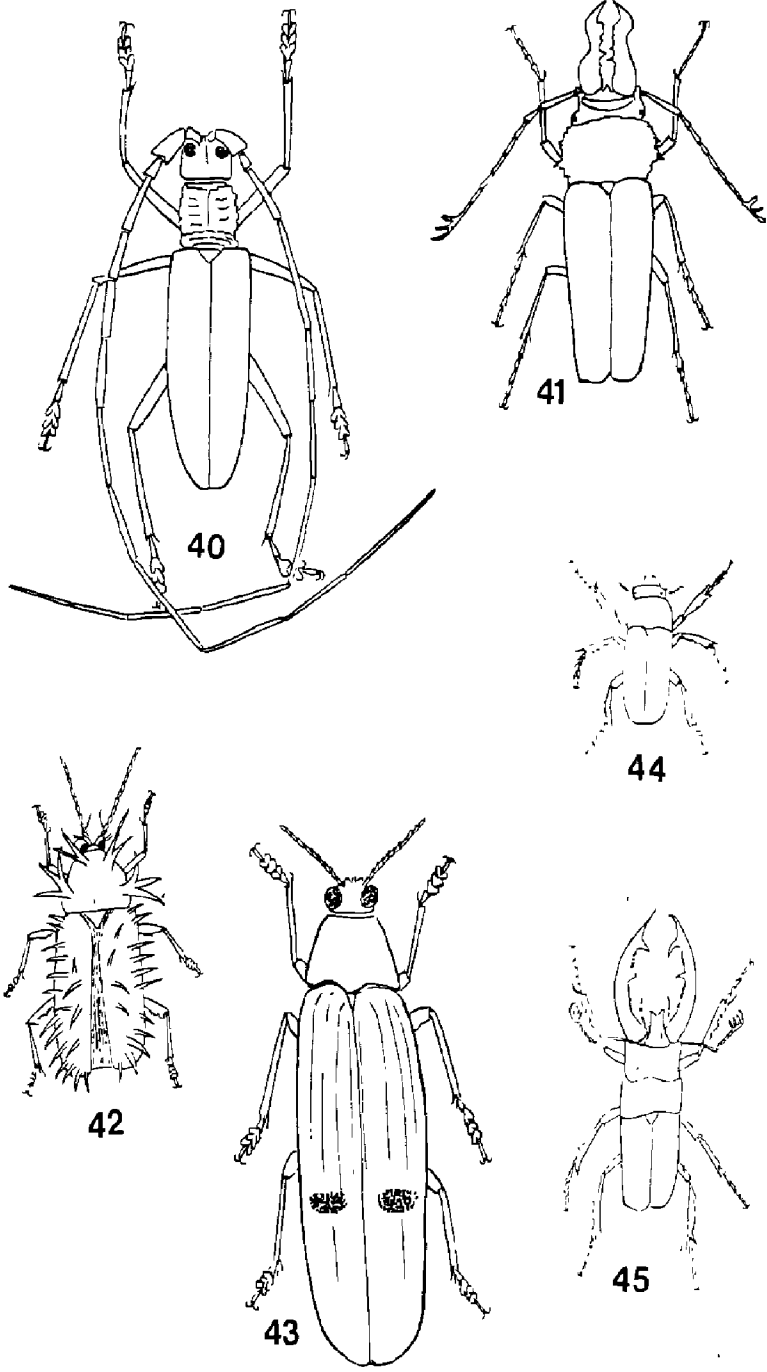
কিছু সাধারণ বীটল বা গুবরে পোকা : 40. লঙ্গিকর্ণ বীটল, *নিওসেরাম্বিকস প্যারিস;* 41. *অটোক্রেটস এভিয়াস,* একটি ট্রিকটোনোমিড বীটল, পূর্ব হিমালয়ের অরণ্যে এদের বাস; 42. সাইসোমেলিড বীটল, রাইস হিসপা, *হিসপা আরমিগেরা;* 43. *ক্যাটাজ্যানথা বাইকলর;* 44. স্ত্রী স্ট্যাগহর্ন বীটল (সাধারণ প্রজাতি) *লুক্যানাস;* 45. *লুক্যানাস* প্রজাতির পুরুষ স্ট্যাগহর্ন বীটল।
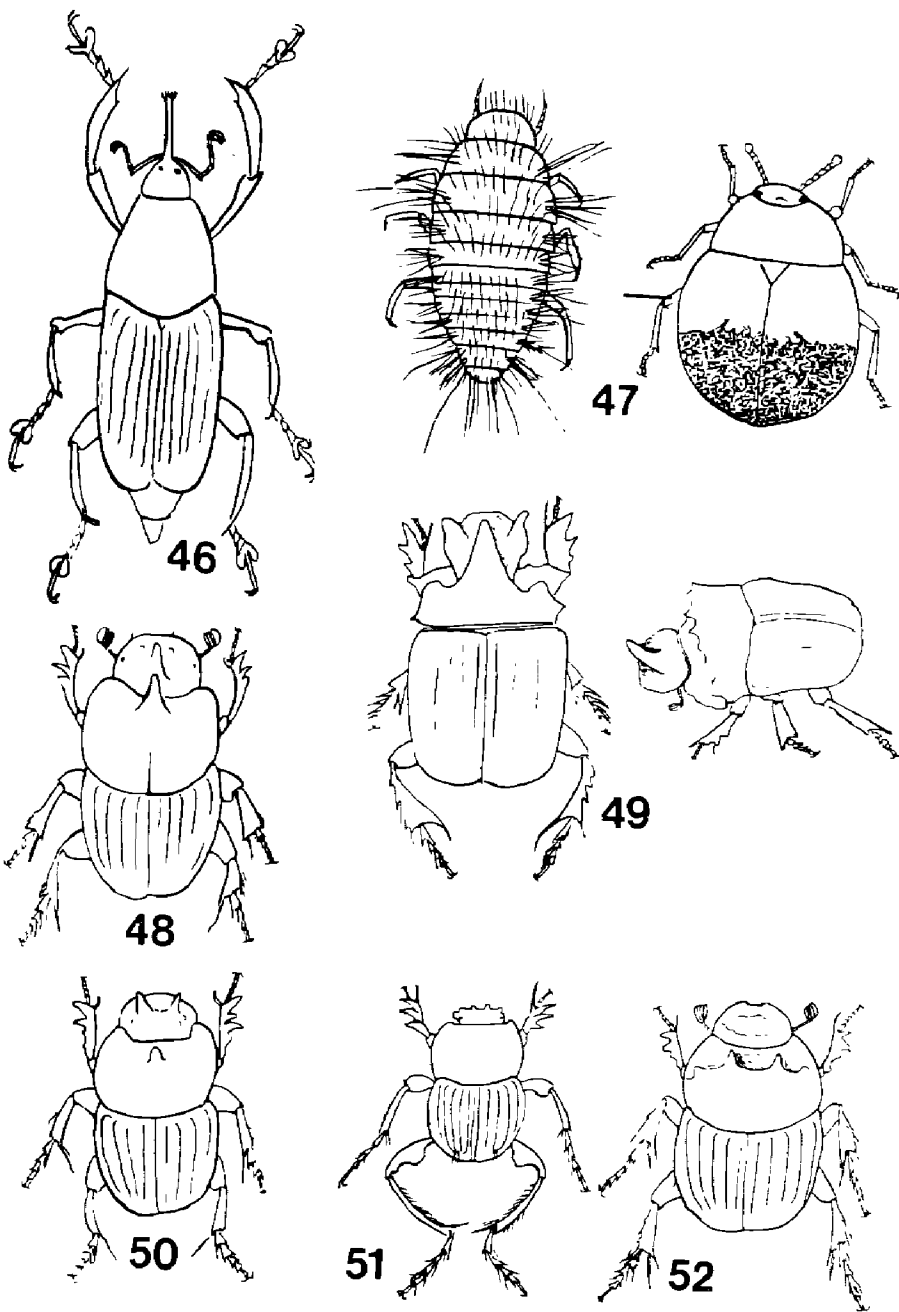
কিছু সাধারণ বীটল বা গুবরে পোকা : 46. একটি বিরাট স্নাউট বীটল (উইভিল), *প্রটোসেরাস গ্র্যাণ্ডিস;* 47. উলিবীয়র বীটল, বাঁদিকে এটির শুককীট যা পশমী কাপড়ের ক্ষতি করে, আর ডানদিকে পূর্ণাঙ্গ বীটল; 48. একটি সাধারণ ডাং রোলার বীটল, *অন্‌থোফ্যাগাস স্যানিটেরিয়াস,* স্ত্রী জাতীয়; 49. সাধারণ রাইনোসেরাস বীটল *(হলিওকপরিস ব্যুসেফ্যালাস)* ওপর ও পাশ থেকে দেখানো হয়েছে; 50. পুরুষ *অন্‌থোফ্যাগাস স্যানিটেরিয়াস;* 51. একটি সাধারণ স্কারাব বীটল, মাকড়সার মতো, *সিমিফাস হিরটাস;* 52. *ককোবিয়াস ডেলিকলিস,* পুরুষ বীটল।
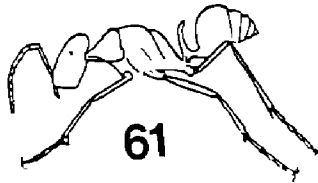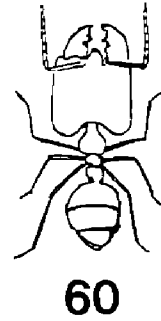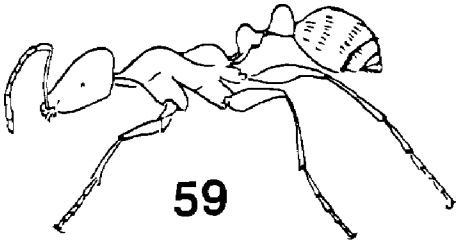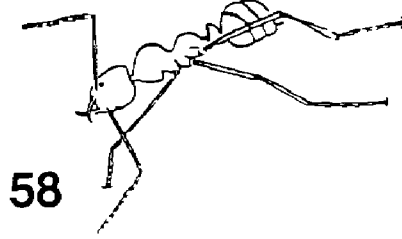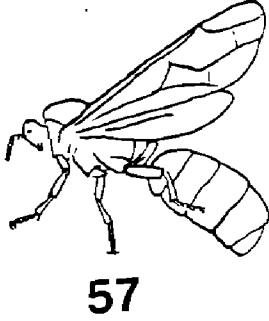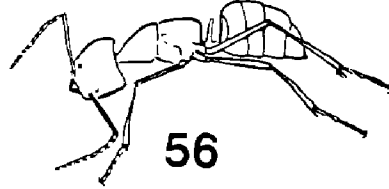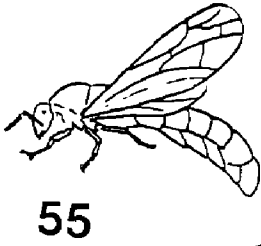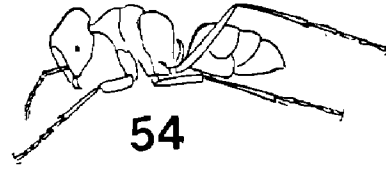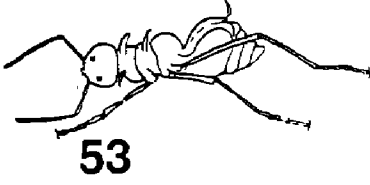
কিছু সাধারণ পিপীলিকা : 53. *পলির‍্যাকিস*; 54. *ক্যাম্পোনোটাস* ছুতোর পিপীলিকা; 55. ড্রাইভার পিপীলিকা, *ডরিলাস* (পুরুষ); 56. *ডলিকোভেরড্রন*, শ্রমিক; 57. *অ্যানিসেটাস*, শ্রমিক; 58. সাধারণ ফ্যারাও পিপীলিকা *একোফাইলা স্মারাগডিনা*, শ্রমিক; 59. *সোলেপসিস*, শ্রমিক; 60. *ফাইডোল*, শ্রমিক; 61. *পলিয়ারগাম*, শ্রমিক।
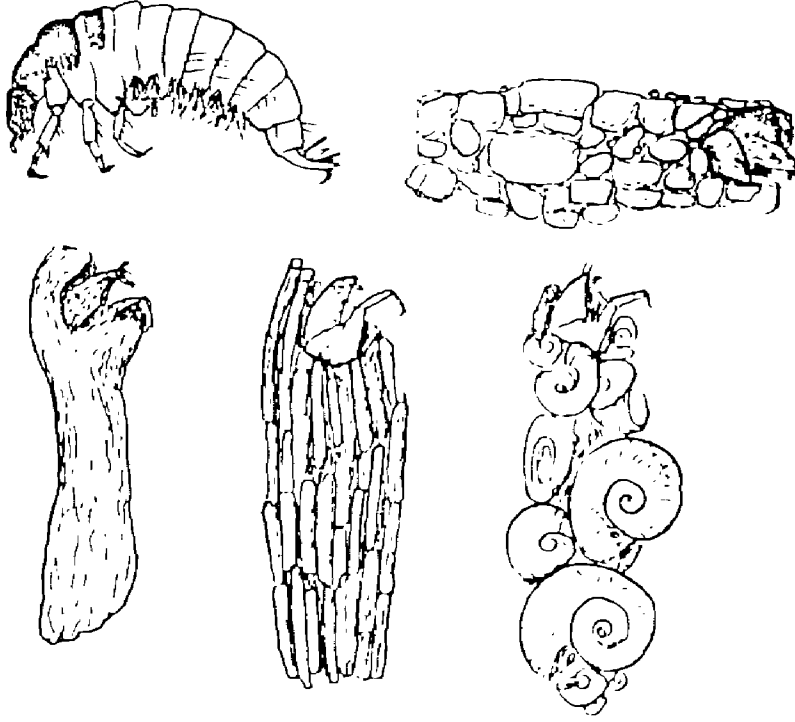
62. ক্যাডিস্ওয়র্ম এবং তাদের খোল, যা তৈরী হয় বালুকণা, ছোট্ট ছোট্ট নুড়িপাথর, কাঠি, শামুকের পরিত্যক্ত খোলা ইত্যাদিকে রেশমী সুতোর মতো বস্তু দিয়ে জোড়া দিয়ে দিয়ে

প্রজাতি 17 : **নিউরোপ্‌টেরা** *(Neuroptera)*—লেসউইং ইনসেক্ট, অ্যান্ট লায়ন। এরা ছোট বা মাঝারি মাপের। দুই জোড়া ডানাতেই ঝিল্লী, জালিকার মতো নালী আছে দেহের অভ্যন্তরে। স্বভাবে লুঠেরা।

প্রজাতি 18 : **ট্রাইকপ্‌টেরা** *(Trichoptera)*—ক্যাডিসফ্লাই। অপরিণত অবস্থায় জলের পোকা। কাঠি, ছোট ছোট নুড়ি আর কিছু টুকিটাকি জিনিস নিয়ে সিল্কের মতো সুতো দিয়ে তৈরি করে বাক্সের-মতো বাসা। যেখানে যায় বাসা সঙ্গে করে নিয়ে যায়। পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গের থাকে দুই জোড়া খোলায় ঢাকা রোমশ ডানা।

প্রজাতি 19 : **লেপিডপ্‌টেরা** *(Lepidoptera)*—প্রজাপতি ও মথ। এরা বেশির ভাগই বড় ও রংবেরঙের। দুইজোড়া ডানা আছে। হুল লম্বা প্যাঁচানো, ফুলের মধু চুষে খায় হুল দিয়ে। শরীর ও ডানা পাতলা, চ্যাপটা, ছোট সুতোর মতো আঁশে ভরা।

প্রজাতি 20 : **ডিপ্‌টেরা** *(Diptera)*—মাছি, মশা, ডাঁশ ও ডাঁশ জাতীয় পতঙ্গ। বেশির ভাগই আকৃতিতে খুবই ছোট। শুধুমাত্র সামনের ডানা জোড়া আছে। পেছনের ডানাজোড়া গুটিয়ে ফাঁসের মতো হয়ে গেছে।
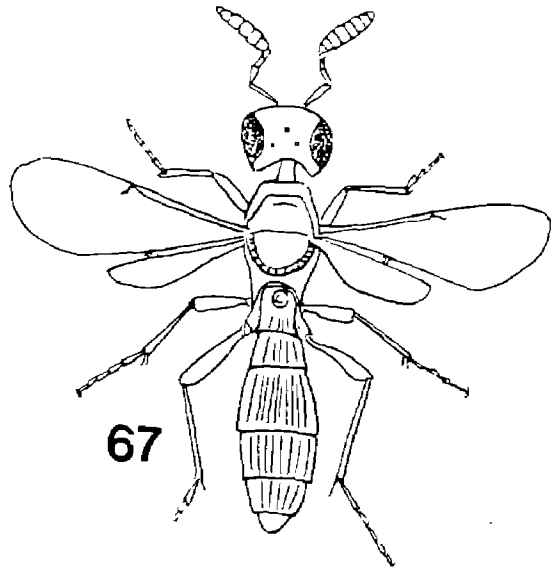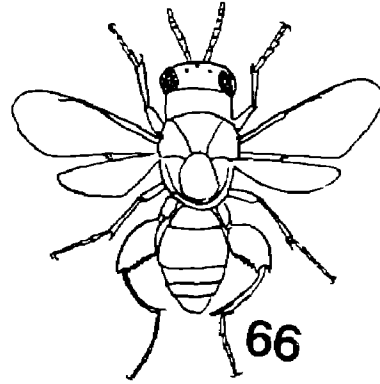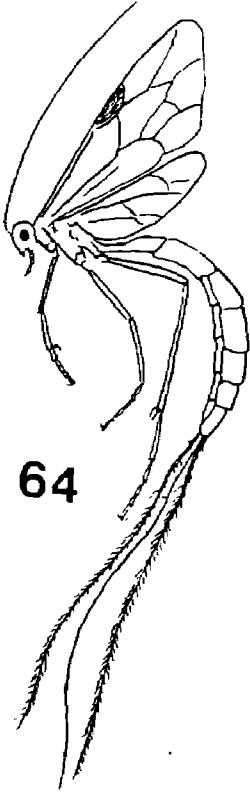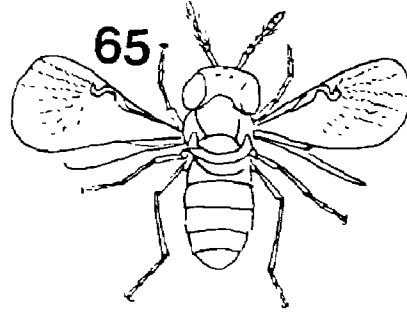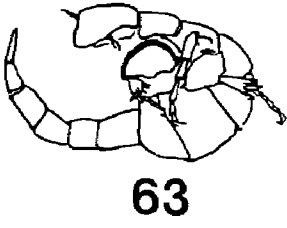
কিছু উপকারী কীটপতঙ্গ : 63. ফিগ ইনসেকট; 64. ইকনিউমন; 65. *ট্রাইকোগ্র্যামা*, একটি পরজীবী যা বহু ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের ডিমে বসবাস করে; 66. *ব্র্যাকিমোরিয়া*, এই পরজীবীর আশ্রয়দাতা শুঁয়োপোকা; 67. *স্কেলিও*, এই পরজীবীর বাস ঘাসফড়িং-এর ডিমে।

প্রজাতি 21 : **অ্যাফানিপ্‌টেরা** *(Aphaniptera)*—ফ্লী বা ডানাবিহীন মাছি। লাফ দিতে পারে। আকার ছোট বলে জন্তু জানোয়ারের চামড়ায় ও রোমে থাকে। পুরোপুরি পরাশ্রয়ী। ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর ও অন্যান্য উষ্ণ রক্তের জীবজন্তুর দেহে এদের আবাস।

প্রজাতি 22 : **থাইস্যানুরা** *(Thysanura)*—বই ও কাপড় কাটার পোকা। ছোট, ডানাহীন দ্রুতগামী এইসব পতঙ্গের দেহ সরু সরু রূপোলী তন্তুতে ভরা। অবস্থান পাথরে, গাছের ছালে, ছবির পেছনে আর ছাতাধরা পুরানো বইয়েব পাতায়।

প্রজাতি 23 : **কলেমবোলা** *(Collembola)*—স্প্রিংটেইল ও স্নোফ্লী। ছোট আকারের ডানাবিহীন নরম শরীরের কীট। লেজের অংশ স্প্রিং-এর মতো হেলিয়ে হঠাৎ হঠাৎ লাফ দিতে পারে। অবস্থিতি মাটিতে, শ্যাওলায় এবং জলাধারের ওপর, হ্রদে, পুকুরে ও তুষার ঢাকা মাঠে।

এ ছাড়া আরও যে সব ছোটখাটো প্রজাতির কীট পতঙ্গ ভারতে পাওয়া যায় তা হল এমবায়োপ্‌টেরা *(Embioptera)*, জোরাপ্‌টেরা *(Zoraptera)*, গ্রাইলোব্ল্যাটোডিয়া *(Grylloblattodea)*, স্ট্রেপসিপ্‌টেরা *(Strepsiptera)*, মেগালপ্‌টেরা *(Megaloptera)*, মেকপ্‌টেরা *(Mecoptera)*, র‍্যাফিডিওডিয়া *(Raphidiodea)*, অ্যাপ্‌টেরা *(Aptera)* ও প্রটুরা *(Protura)*। ডিপ্লোগসাটা *(Diplogossata)*, গেছো ইঁদুরের গায়ের পরাশ্রয়ী কীট, ভারতে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কীটপতঙ্গের রীতিপ্রকৃতি

পতঙ্গ ওড়ে

কীটপতঙ্গ অত্যন্ত চঞ্চল। তাদের কায়িক শ্রমের ক্ষমতা, ওড়ার ক্ষমতা, বেঁচে থাকার ক্ষমতা সত্যিই অবাক করে দেওয়ার মতো। এরা বুকে হেঁটে চলতে পারে, দৌড়ে পালাতে পারে, মাটি খুঁড়তে পারে, ঝকঝকে পালিশ করা মসৃণ দেওয়াল বেয়ে অবলীলায় উঠে যেতে পারে, পুকুর নদী-নালার জলে স্বচ্ছন্দে ভেসে বেড়াতে পারে, ডুব দিতে পারে, আবার সাঁতার কাটতেও পারে। সব সময়ই দেখা যায় এরা কাজে ব্যস্ত। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চলাফেরা করছে। কিন্তু আদপে তা নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার অবশ্য পতঙ্গের ওড়া। শরীরের গঠন এদের এমনই যা উড়তে সহায়তা করে। অনেক পতঙ্গ এই উড়ন্ত অবস্থাতেই খায়, বংশবৃদ্ধির কাজে মিলিত হয়, এমনকি ডিমও পাড়ে। ওড়ার গতি কখনও বেশি, কখনও কম। অনেক পতঙ্গ আরামে আস্তে আস্তে ওড়ে, অনেকে ওড়ে অলসভাবে। আবার অনেকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে শাঁ শাঁ উড়ে যায়। হক মথ সবচেয়ে দ্রুত গতিতে ওড়ে (সেকেণ্ড 15 মিটারেরও বেশী। গয়ালপোকা ওড়ে সেকেণ্ডে 10 মিটার গতিতে। উড়তে উড়তেই অনেকে আবার শূন্যে স্থির হয়ে ভাসে, তারপর গতির দিক পরিবর্তন করে এবং দ্রুত এপাশ ওপাশ করে।

পৃথিবীর বুকে পতঙ্গই সবচেয়ে আগে উড়তে শেখে। ওড়ার কলকব্জা খুবই সহজ ও মজবুত। উড়োজাহাজ বা পাখির থেকে অনেক বেশি সুগঠিত এদের দেহ। ডানাই এদের ওড়ার যন্ত্র। সর্বজনীন যদিও নয় তবু দেখা যায় সামনের ডানাজোড়া পেছনের ডানাজোড়ার থেকে বড়। কিছু কিছু পতঙ্গে আবার সামনের ডানাজোড়া চামড়ার বর্মের মতো পেছনের ডানাজোড়াকে রক্ষা করে, আর সেক্ষেত্রে তারা পেছনের ডানাজোড়ার সাহায্যেই ওড়ে। ডানাতে অনেক সময় আঁশ, রোম বা এবড়ো খেবড়ো গর্ত থাকে। মশা মাছির ক্ষেত্রে পেছনের ডানাজোড়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সামনের ডানাজোড়ার পেছনে থাকে। মাত্র একজোড়া ডানাই সেখানে কার্যকর।

পতঙ্গের ডানা আসলে ধড়ের অংশ—পাতের মতো বিস্তৃত পার্শ্বলতি। এদের প্রস্থ অনুপাতে দৈর্ঘ্য বেশি। আগার কাছটা সরু হয়ে গেছে। একটা সরু অংশ দিয়ে ধড়ের

সঙ্গে লাগানো। ডানার সামনের দিকের কিনারা সোজা, পেছনের দিকে গোল। ডানার ঝিল্লী টেনে টেনে কয়েকটা জালির মতো শিরা দিয়ে বাঁধা যাতে কুঁচকে না যায়। এতে দেহের ওজন উড়ন্ত অবস্থায় ডানার ওপর সমানভাবে বিস্তৃত হয়। ফলে বায়ুর চাপ, টান ইত্যাদি উপেক্ষা করে পতঙ্গ সহজ ভাবে উড়তে পারে।

ওড়ার সময় দ্রুতগতিতে ও তালে তালে পতঙ্গের ডানা ওপরে, নিচে, সামনে ও পেছনে নড়তে থাকে। পতঙ্গ যখন নিচের দিকে ডানা কাঁপায় তখন সামনের দিকে সে কিছুটা এগোয়। এতে ডানার অগ্রভাগের কিনারা সরে গিয়ে পশ্চাদভাগ ওপরে উঠে যায়। ডানা ওপর দিকে কাঁপানোর সময় সে খানিকটা পিছিয়ে যায়। ডানার পেছনের দিকের কিনারা একইভাবে সরে যায়। বারবার এই জটিল প্রক্রিয়ার ফলে ডানার আগায় নানা ছিদ্র সৃষ্টি হয়। ডানার এই দ্রুতগতির সঙ্গে তুলনা করা যায় বিমানের প্রতিটি যন্ত্রাংশের সুষ্ঠু কাজকে। ডানার কম্পনের ফলে পতঙ্গের দেহের ওপরে ও সামনে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় ও নিচে ও পেছনে উচ্চচাপের। ফলে পতঙ্গ অনায়াসেই ওপরে ওঠে ও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। যারা অত্যন্ত দ্রুতগতির, তাদের সামনের ডানাজোড়ার কম্পনের সঙ্গে যুক্ত পেছনের ডানাজোড়ায় আলোড়নের সৃষ্টি করে। পেছনের ডানাজোড়া তাতে আকারে ছোট হয়ে যায়, কখনও হয়ে যায় অদৃশ্য। হাইমেনপ্টেরা *(Hymenoptera)* ও ডিপ্টেরা *(Diptera)* প্রজাতির ক্ষেত্রে এই কম্পন সেকেণ্ডে হাজারেরও (1000) বেশী। ছোট ছোট পুরুষ মাছির ক্ষেত্রে (ফরসিপোমিয়া—*Forcipomyia* প্রজাতি) এই কম্পন সেকেণ্ডে 988-1041 বার। মশার গান বা ভ্রমরের গুণগুণ বা মথের বোঁ বোঁ সবই বিভিন্ন গতির কম্পনের ফল।

ডানার কম্পনের জন্য দায়ী পতঙ্গের ধড়ের পেশীর দ্রুত সঙ্কোচন। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হল, অধিকাংশ পতঙ্গের ডানার সঙ্গে সরাসরি কোনো পেশী যুক্ত নেই; অনেক দ্রুতগামী পতঙ্গের ডানায় আদৌ কোনো পেশী নেই। পায়ের গোড়ায় ভেতর থেকে শুরু করে ধড়ের ওপরের খোলস পর্যন্ত বিস্তৃত সব পেশী। আর বুকের এক অংশ থেকে অন্য অংশ পর্যন্ত দেহকাণ্ডের লম্বালম্বি সব পেশীর পরোক্ষ সাহায্যে ডানার এই কম্পন সম্ভব হয়। ডানার গঠনই এমন যে পায়ের নিচের মূল অংশ আলম্ব হিসেবে কাজ করে। ধড়ের ওপরের খোলস বেঁকে গেলে ডানা সঙ্কুচিত ও চ্যাপ্টা হয়, চ্যাপ্টা হলে ওপরে ওঠে। ধড়ের পেশীর সঙ্কোচন পতঙ্গকে মাটির ওপর হাঁটতে, পালাতে বা লাফাতে সাহায্য করে। উড়ন্ত অবস্থায় পা স্থির হয়ে যায়, ধড়ের সঙ্গে লেগে থাকে। পেশীর সঙ্কোচনে তখন পতঙ্গ উড়তে পারে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন জায়গার ও বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন পেশীর সমন্বিত কাজ পতঙ্গের ওড়ার মূলে। অবশ্য এই সব বর্ণনা সহজবোধ্য ভাষায় করা হয়েছে। আরও বিশদ জানতে গেলে আরও উন্নত বইপত্র ঘাঁটতে হবে। তবে এটাও ঠিক পতঙ্গের ওড়ার ব্যাপারে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনও পুরোপুরি পাইনি।

খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ

কীটপতঙ্গের খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ প্রণালী তাদের ওড়ার মতোই চিত্তাকর্ষক। গাছের

পাতা, ছাল, সরু ডালপালা, কুঁড়ি, ফুল, পরাগরেণু, ফল, বীজ, বাদাম, গাছের শিকড়, শ্যাওলা, পুষ্পল ছত্রাক, সাধারণ ছত্রাক, গরু ঘোড়া ইত্যাদির খুর, মরা চামড়া, চুল, নখ, চামড়া, এমনকি জীবজন্তুর মাংস এরা খেয়ে থাকে। শুনলে অবাক লাগে এক প্রজাতি কখনও বা অন্য প্রজাতিকেও ভক্ষণ করে। এছাড়া মৃত ও পচনশীল জৈব পদার্থ, বিভিন্ন প্রাণীর মল, কাঠ ও কাঠের আসবাবপত্র, আবর্জনা, কলকারখানার কাঁচামালের, তৈরি মাল, বই, চামড়ার জিনিস, পশম, জামাকাপড়, রেশম, সিগার, সিগারেট, ময়দা, রুটি, বিস্কুট, শুকনো ফল, বাদাম, বীজ, চকোলেট, যাদুঘরে সংরক্ষিত জিনিস, ছবি, রবার ও রবারজাত দ্রব্য, সবই কীটপতঙ্গের খাদ্য তালিকায় পড়ে।

কিছু কীটপতঙ্গ সর্বভূক, কিছু বা পছন্দসই কোনো কোনো জিনিস খায়, আবার কিছু প্রজাতি বিশেষ ধরনের খাবার ছাড়া খায়ই না। অনেক প্রজাতিই নিরামিষাশী। যেমন ফড়িং। আবার গয়ালপোকা ইত্যাদি মাংসাশী। কিছু আছে যারা শুধু মৃত ও পচন ধরেছে এমন জৈব বস্তুই খায়।

খাদ্যগ্রহণ প্রণালী খাদ্য তালিকার মতোই বৈচিত্র্যময়। খাদ্যের রকমফের, কীটপতঙ্গের লিঙ্গ, বয়স ও প্রজাতির ওপরও নির্ভর করে খাদ্যগ্রহণ প্রণালী। অপরিণত বয়স থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত গ্রহণ বহু কীটপতঙ্গ নিয়মিতভাবে প্রথমে কঠিন ও পরে তরল খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। অথবা নিরামিষ থেকে আমিষ খাবারে রুচি পাল্টায়। অথবা কিছুই খায় না। শুধু বাতাস ছাড়া। এই ব্যাপারে অবশ্য কীটপতঙ্গদের দুইভাগে ভাগ করা যায়: এক দল আছে যারা খাবারের টুকরো মুখে নিয়ে চিবিয়ে তারপর খায়। অন্যদল তরল পদার্থ বা গাছের পাতার রস বা প্রাণীদেহের রক্ত শোষণ করে। অনেক কীটপতঙ্গ অপরিণত অবস্থাতেই কেবলমাত্র খাবার খায়, পরিণত অবস্থায় উপোসী থাকে। একেবারেই সাধারণ অপরিণত মেফ্লাই, জলে বাড়ার সময় খায় শ্যাওলা, এককোষী শৈবাল ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ। পূর্ণবয়স্ক মেফ্লাই, যে মাত্র কয়েকঘণ্টা বেঁচে থাকে, কিছু খেতে পারে না। শুধু গ্রহণ করে বাতাস, তাও শরীরের প্লবতা বজায় রেখে। উড়ন্ত অবস্থায় বংশবৃদ্ধির জন্য মিলিত হতে হয় বলে। শুঁয়োপোকা গাছের পাতার অংশ, কুঁড়ি ইত্যাদি খায়, কিন্তু পূর্ণতা প্রাপ্তির পর, প্রজাপতি হয়ে গেলে, খায় শুধু ফুলের মিষ্টি মধু। মশার শূককীট খায় জলে ভাসমান আবর্জনা, খায় পচা জৈব পদার্থ। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় খায় রক্ত। একটা কথা, রক্ত খায় কেবলমাত্র স্ত্রীমশা, পুরুষমশার খাদ্য গাছের রস। অথবা উপবাসী। সাধারণ ফোনকা পোকার শূককীট বিভিন্ন জাতের ফড়িংয়ের ডিম খায়, পূর্ণবয়স্ক হলে খায় ফুলের নরম পাপড়ি ও পরাগরেণু।

ফড়িং, আরশোলা, গুবরেপোকা, কাঁচপোকা ও প্রজাপতির শুঁয়োপোকা খায় শক্ত খাবার। এদের মুখ, ঠোঁট ও চোয়াল এমনভাবে তৈরি যাতে খাবার ভেঙে চিবিয়ে গিলতে পারে। এদের ওপরের ও নিচের চোয়ালে সাজানো থাকে ক্ষুদে ক্ষুদে শক্ত দাঁত যার জোরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে কঠিন খাবারকে আয়ত্ত্বে আনা যায়।

যেসব কীটপতঙ্গ তরল পদার্থ খেয়ে জীবন ধারণ করে, তাদের ক্ষেত্রে ওপরের ঠোঁট ও নিচের ঠোঁট এক সঙ্গে জুড়ে অনেকটা পাখির ঠোঁটের আকার পায়। আর ওপর ও নিচের চোয়াল লম্বাটে হয়ে সরু সূচের মতো হয় যাতে গাছের বাকল

বা জীবজন্তুর চামড়া ফুটো করতে পারে। মুখগহ্বর হয় শোষকযন্ত্রের মতো। ছারপোকা, প্রজাপতি, মৌমাছি, মশা ও মাছি তরল পদার্থ খেয়ে বাঁচে।

ছারপোকার (সাইমেক্স রোটান্ডেটাস- *Cimex rotandatus* প্রজাতি) ক্ষেত্রে এই চঞ্চু আসলে ওপর ও নিচের ঠোঁট লম্বাটে হয়ে জুড়ে গিয়ে তৈরি, আছে দুইজোড়া সরু সূচের মত জিনিস যা দিয়ে ফুটো করা যায়। একজোড়া হল লম্বা হয়ে যাওয়া ওপরের চোয়াল, অন্য জোড়া পরিবর্তিত নিচের চোয়াল যা নিচের দিকে গর্ত করা। দুই জোড়া একসঙ্গে মিলে তৈরি হয়েছে শোষক যন্ত্র। প্রজাপতির ক্ষেত্রে মুখের সামনের অংশ অদ্ভুত সূচালো, ধারণ করেছে শুঁড়ের আকার। শুঁড়ের দৈর্ঘ্য প্রজাপতির দেহের তুলনায় বেশি। যখন কাজে লাগে না, তখন শুঁড় গুটিয়ে মাথার নিচে লুকানো থাকে। শুঁড় দিয়ে প্রজাপতি ফুলের ভিতরকার মধুভান্ড থেকে মধু পান করে। শক্ত খাবার খায় না বলে প্রজাপতির ওপরের চোয়াল বলে কিছু নেই। মৌমাছির ক্ষেত্রে ওপরের চোয়াল মসৃণ ও দাঁতবিহীন। এরই সাহায্যে মৌচাকের মোম তৈরি হয়। নিচের চোয়াল তীক্ষ্ম ছুরির মতো, ফুলের মধুভাণ্ড ফুটো করা যায়। যে জিভ দিয়ে মধু চেটে সংগ্রহ করে আসলে তা পরিবর্তিত অধর। স্ত্রীমশার ক্ষেত্রে ওপর ও নিচের চোয়াল ও ওপর ও নিচের ঠোঁট সব মিলে সূচের আকার পায়। মাছি যখন খাবার চেটে খায়, সে সাহায্য নেয় নিচের ঠোঁটের, অবশ্য দৈহিক পরিবর্তিত অবস্থায়। ঠিক যেমন স্পঞ্জ শুষে নেয় জল।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন, খাবার হজম হয় অন্ত্রে, হজম করবার জারক রস ও এনজাইমের সহায়তায় কিছু কীটপতঙ্গ আপাতদৃষ্টিতে দুষ্পাচ্য খাবার সেলুলোজ ও কাঠ অবলীলায় হজম করে ফেলে। ঘুণপোকা ও উইপোকা জাতীয় কীট তো শুধু কাঠ খেয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়। এদের পাকস্থলীতে আছে কিছু অনুজৈবকোষ। এদেরই সাহায্যে কাঠজাতীয় খাদ্যবস্তু দ্রাব্য শর্করাতে রূপান্তরিত হয়। এইসব জৈব বস্তু এনজাইমের সাহায্যে নিজেদের প্রয়োজনেই শর্করা তৈরি করে যা ঘুণপোকা বা উইপোকার রক্তে মিশে যায়। রক্তশোষক কিছু কিছু ছারপোকার দেহে এমন জীবাণু থাকে যা আংশিকভাবে শোষিত রক্ত হজম করতে সাহায্য করে।

শিকারী কীটপতঙ্গ, নিখরচা কীটপতঙ্গ ও পরজীবী কীটপতঙ্গ

যদিও কীট পতঙ্গ প্রায় সর্বভূক, তাহলেও এটা ধরে নেওয়া অন্যায় যে তারা খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে অলস। প্রত্যেক প্রজাতির নিজস্ব খাদ্যতালিকা আছে যা পুষ্টিকারক, আছে রুচি এমন সব খাদ্যের যা হয়তো সহজে মেলে না। অন্যান্য প্রাণীর মতোই এরা কঠোর কায়িক পরিশ্রম করে, তবুও হয়তো সব সময় পর্যাপ্ত আহার পায় না। খাবার সংগ্রহের জন্য এরা যথেষ্ট পরিশ্রম করে, এক জায়গায় তা জড়ো করে, নিজের পেট ভরানো ছাড়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ও করে। কিছু কিছু প্রজাতি আছে যারা খাবার পেলেই খেয়ে ফেলে, তবে বেশির ভাগই নিরাপদ জায়গায় খাবার নিয়ে যায় যাতে তারা আরামে খেতে পারে। অনেক প্রজাতি রুচি সম্পর্কে বিশেষ সচেতন, হয়তো নির্দিষ্ট জাতের ঘাস বা ছত্রাক ছাড়া খায়ই না। অনেক কীটপতঙ্গ আছে যারা

শিকারী, যারা সুযোগ বুঝে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কব্জা করে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় উদরস্থ করে। অনেকে আবার অন্যদের খাবার চুরি করে নিজের পেট ভরাবার ধান্দায় থাকে। আবার অনেকে এসব ঝামেলা বা পরিশ্রম করেই না, অন্য জীবের দেহে অবাঞ্ছিত অতিথি হয়ে জীবনধারণ করে।

শিকারীর কূটকৌশল : জ্যান্ত শিকার ধরার দিকে ঝোঁক কীটপতঙ্গের মধ্যে ব্যাপক। সব সময়ই একে অন্যকে হত্যা করত সচেষ্ট। কীটপতঙ্গের সবচেয়ে বড় শত্রু কীটপতঙ্গই। অনেক শিকারী কীটপতঙ্গের নজর পোকামাকড়, স্থলচর শামুক, জলচর শামুক, মাকড়সা, ছোট টিকটিকি বা গিরগিটি, পাখি ও স্তন্যপায়ী জীবের দিকে। তবে ফাঁদে পড়ে বেশি অন্যান্য কীটপতঙ্গ। প্রায়শই এক প্রজাতি অন্য প্রজাতির ভক্ষ্য। যেসব প্রজাতি জাতশিকারী তারা হল প্লেকপ্‌টেরা *(Plecoptera)*, ওডোনাটা *(Odonata)*, ম্যানটোডিয়া *(Mantodea)*, কিছু বিশেষ ধরনের হাইমেনপ্‌টেরা *(Hymenoptera)*, কোলিওপ্‌টেরা *(Coleoptera)* বিশেষ করে কারাবিডা *(Carabidae)*, কিছু কিছু হেটেরপ্‌টেরা *(Heteroptera)* ও বহু ডিপ্‌টেরা *(Diptera)*।

বিভিন্ন প্রজাতির শিকারের কলাকৌশল নির্ভর করে শিকারের স্বভাব ও আয়তন, এবং স্থানীয় পরিবেশের ওপর। সাধারণত সব জাতশিকারী কীট বা পতঙ্গ বিদ্যুৎ গতিতে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। এদের শারীরিক শক্তি বেশি। সুচতুরভাবে শিকার খুঁজে বের করে, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেক শিকারী কীটপতঙ্গ গন্ধ ছড়িয়ে বা রং বদলিয়ে শিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদের পুঞ্জাক্ষি অত্যন্ত উন্নতমানের এবং অনেক সময়ই সারা মাথা জুড়ে থাকে। এদের দৃষ্টি শক্তি এতো বেশি যে আশেপাশের সামান্যতম নড়াচড়াও টের পায়। দেখা গেছে, সম্পূর্ণ চুপচাপ অবস্থায় থাকলে ভক্ষ্য প্রাণীর জীবন নিরাপদ, সামান্য নড়াচড়া করলেই বরং জীবনসংশয়।

শিকারী অনেক সময় শিকারকে তাড়া করে। কখনও বা সজাগ হয়ে অপেক্ষা করে কখন ভাগ্যহত শিকার তাদের কাছে এগিয়ে আসবে ও তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শিকারের পিছু নেওয়া : শিকারের পেছনে ভক্ষক কীটপতঙ্গের ছোটা ডাঙায় বা আকাশে হতে পারে। গুবরেপোকা *(Carabidae)*, জোনাকি *(Lampyridae)* এবং অন্যান্য বোলতা, ভীমরুল ইত্যাদি পোকা শিকার ধরবার জন্য মাটির ওপরে দিয়ে ছোটে। শিকার ধরে ওপরের শক্ত ও ধারালো চোয়ালের সাহায্যে কেটে টুকরো টুকরো করে খেয়ে নেয়। ডানাওয়ালা কীটপতঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বোধহয় জলফড়িং বা গয়ালপোকা। উড়ন্ত অবস্থায় এরা মশা, ডাঁশ পোকা ধরে শক্ত পায়ের সাহায্যে, ঠিক যেন ঝাঁপিয়ে খপ্ করে শিকার ধরার মতো। রবারফ্লাই *(Asilidae)* মাছি, মশা ও অন্যান্য ছোট পতঙ্গ ধরে রস শুষে ছিবড়ে করে ফেলে দেয়। বোলতা, ভীমরুলকে অনেক সময় দেখা যায় মাকড়সা বা ঝিঁঝি পোকার আস্তানা আবিষ্কার করেছে ও মাটি খুঁড়ে তাকে হত্যা করেছে। কখনও বা তাকে প্রলুব্ধ করেছে গর্ত থেকে বাইরে

বেরিয়ে আসবার জন্য। তারপর খোলা মাঠে পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হুল ফুটিয়ে হত্যা করে খাদ্য হিসেবে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গেছে নিজেদের ডোবায়।

অসতর্ক শিকার ধরা : অনেক শিকারী কীটপতঙ্গ শিকারের আশায় চুপচাপ বসে থাকে। অসতর্ক শিকারকে মুহূর্তে আঘাত করে মেরে ফেলে। এরা অপেক্ষা করে যেখানে শিকারের আসার সম্ভাবনা বেশি। আঘাত হানার আগেই মুহূর্ত পর্যন্ত শিকার বুঝতে পারে না যে তার মরণ ঘনিয়ে এসেছে।

প্রেইং ম্যানটিসের ধড় হয় সরু, লম্বা; মাথাটা এমনভাবে ধড়ের ওপর বসানো থাকে যাতে ইচ্ছেমত এপাশ ওপাশ ঘোরানো যায় অথচ মাথায় আঘাত লাগার সম্ভাবনা নেই। এমনকি ধড়কেও মাথার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরাতে হয় না। এদের সামনের পাগুলো শক্ত ও শিকার ধরার উপযুক্ত। পায়ে দাঁতের মতো অংশ থাকে। পা যখন ভাঁজ করে শিকারের সাধ্য কি সেই পায়ের ফাঁদ থেকে সে মুক্তি পায়। শিকারের অপেক্ষায় এরা এমনভাবে সামনের পা ভাঁজ করে দেহের সঙ্গে রাখে মনে হয় প্রার্থনা করছে। তাই নাম প্রার্থনারত ম্যানটিস। আসলে শিকার ধরার প্রার্থনা। যে কোনো কীটপতঙ্গ, জন্তু, টিকটিকি, গিরগিটি, ছোট পাখি, এমন কি কোন অসতর্ক ম্যানটিসও, ভুল করে যদি এদের ফাঁদে পা দেয়, আর রক্ষা নেই। বিদ্যুতের বেগে শক্ত দাঁড়ার মতো পা দিয়ে চেপে ধরে শক্ত দাঁত ও শিরদাঁড়ার সাহায্য একটু একটু করে খাবে। যেন ভুরি ভোজন।

গোয়ালপোকা যখন অপরিণত অবস্থায় শূককীট হিসেবে জলে বাস করে, তখন তাদের নিচের ঠোঁট অদ্ভুতভাবে লম্বা হয়ে ফাঁদের আকার নেয়, যেন লুকোনো থলি। শূককীট নিশ্চল হয়ে কাদায় অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে অপেক্ষা করে, থলি লুকানো থাকে মাথার নিচে। দেখে মনে হয় কত নিস্পৃহ জীব। শিকার কাছে আসা মাত্র থলি ছিটকে বেরিয়ে খুলে গিয়ে সরু দাঁতের আগা দিয়ে চেপে ধরে শিকারকে মেরে ফেলে।

সাধারণ অ্যান্টলায়ন-এর শূককীট ওস্তাদিতে আরও এক কাঠি ওপরে। কতক্ষণে শিকার আসবে তার জন্য এরা অপেক্ষা করে না। বিশেষ ধরনের ফাঁদ পেতে রাখে শিকারের জন্য। শূককীটের এই নাম সার্থক কারণ এরা পিঁপড়ের যম, শুধুমাত্র পিঁপড়ে দিয়েই এরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, সারা বছর, সারা জীবন।

আমরা তো জানি পিঁপড়ে সর্বদাই ব্যস্ত। দ্রুত যাতায়াত করছে, নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করছে, বাধা মানছে না, গর্তে পড়ছে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। যেন কিছুই হয়নি। চালাক অ্যান্টলায়ন সুযোগ নেয় পিঁপড়েদের এই স্বভাবের। এরা লুকোনো গর্ত খুঁড়ে রাখে ঝুরঝুরে বালিতে বা মাটিতে। আর নিজেরা গর্তের নিচে হাঁ করে অপেক্ষা করে। বোকা পিঁপড়ে দ্রুত যেতে গিয়ে ফাঁদে পা দেয়, গর্তে পড়ে যায়। ভয় পেয়ে উঠে আসার চেষ্টা করলেও ঝুরঝুরে বালি বা মাটি সেই চেষ্টায় বাধ সাধে। পিঁপড়েরা সোজা গিয়ে পড়ে অ্যান্টলায়নদের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে রস, রক্ত শুষে নেয়, ছিবড়ে করে দেয়।

নিখরচায় থাকা, খাওয়া : জীবন ধারণের সবচেয়ে সহজ উপায় বোধ হয় কারোর বাড়ি যাওয়া, এমন ভাব দেখানো যেন সে তোমার প্রাণের বন্ধু। মাথা ঘামিও না তোমার বন্ধু তোমার সম্বন্ধে কি ভাবছে তাই নিয়ে। অনেক কীটপতঙ্গ এই ধাঁচের। কোনো কোনো প্রজাতি পরিমার্জিত করে একে প্রায় শিল্পের রূপ দিয়েছে। কিছু কিছু কীটপতঙ্গ নির্বিকার ভাবে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙে—ঘাড় ধাক্কা খেলেও গায়ে মাখে না। আবার কেউ বা অনাহুত অতিথি হয়ে আস্তানা গাড়লো তো গাড়লোই, সারা জীবনের জন্য রয়ে গেল ঘাড়ে চেপে। কখনও বা নিজে তো থাকেই, বংশধরদের জন্যও পাকাপাকি ব্যবস্থা করে রেখে যায়।

অনেক কীটপতঙ্গ ভেবেচিন্তে বাছবিচার করে নিখরচার আশ্রয় পছন্দ করে। সতর্ক দৃষ্টি রাখে যাতে 'গলা ধাক্কা' খেতে না হয়। অনেকে আবার 'গৃহস্বামীর' অনুগ্রহভাজন হওয়ার চেষ্টা করে। এদের প্রশ্ন : সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও কোথায় গেলে সবচেয়ে বেশি আদর যত্ন পাওয়া যায়? উত্তরটা সহজ : বিয়েবাড়িতে। সেখানে এত বেশি লোকজন, ব্যস্ততা, যে কারোর নজর তুমি কাড়বে না। সবাই না সেখানে কাজে অকাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কন্যাপক্ষ ভাববে তুমি বরযাত্রী আর বরযাত্রীরা ভাববে তুমি কুটুম বাড়ির লোক। তুমিও দিব্যি বরের ঘরের মাসি কনের ঘরের পিসি হয়ে চালিয়ে দেবে। ভিড়, গণ্ডগোলের মধ্যে সেটাই তো সুবর্ণ সুযোগ!

উইপোকা, ঘুণপোকা, পিঁপড়ে ও বোলতাদের বাসাতেও একই অবস্থা। হাজারে হাজারে কীটপতঙ্গ এমনিতেই সেখানে। যে যার নিজের কাজে, নানাভাবে ব্যস্ত। যদি দলে ভিড়ে পড়তে পারো কাউকে বিরক্ত না করে, কেউ তোমায় লক্ষ্য করবে না। তাই সেইসব বাসায় বহু অবাঞ্ছিত অতিথি কীটপতঙ্গের ভিড় লেগেই থাকে। যেমন ঝিঁঝিঁ পোকা, কিছু বিশেষ ধরনের গুবরেপোকা *(Paussids staphylinids),* লিসেনিড *(Lycaenid)* গোষ্ঠীভুক্ত প্রজাতির শুঁয়োপোকা, ফোরিড *(Phorid)* ফ্লাই এর শূককীট, ইত্যাদি। এদের টারমাইটোফিলাস (বা উইপোকা প্রেমী) অথবা মিরমিকোফিলাস (পিঁপড়েপ্রেমী) কীটপতঙ্গ বলা হয়। উইপোকা, ঘুণপোকা বা পিঁপড়েদের কষ্ট করে সঞ্চয় করা খাবার এরা নির্বিকারচিত্তে উদরসাৎ করে। 'গৃহস্বামীর' উচ্ছিষ্টও বাদ যায় না। পিঁপড়েপ্রেমী কিছু প্রজাতি তো আবার ঠিক পিঁপড়েদের চালচলন এমনভাবে নকল করে বা চেহারাও এমন করে ফেলে যে সময়ে সময়ে ঝানু কীটপতঙ্গ বিশারদও প্রথম নজরে এদের আলাদা করে চিনতে পারেন না।

পরজীবী গোষ্ঠী : পরজীবী কীটপতঙ্গের বাস হল আশ্রয়দাতার দেহে বা দেহের ভেতরে। সেখান থেকেই এরা নিজেদের পুষ্টির রসদ সংগ্রহ করে নেয়। বিনিময়ে কিছুই দেয় না। সমাজতান্ত্রিক দেশে এরা যেন সর্বহারার শত্রু। আশ্রয়দাতা ছাড়া এরা বাঁচতেই পারে না। শিকারী কীটপতঙ্গ যেমন শিকারকে হত্যা করে এরা তা করে না। এরা ধীরে ধীরে আশ্রয়দাতার জীবনীশক্তি ক্ষয় করে। অনেক সময় দেখা যায়, পরজীবী পতঙ্গের পূর্ণতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রয়দাতা মারা গেছে।

পুরোপুরি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত এরা আশ্রয়দাতার প্রতি 'দয়া' দেখায়। কিছু কিছু প্রজাতির কীটপতঙ্গ কখনও পরজীবী কখনও বা স্বাধীন। যেমন ছারপোকা। সাময়িকভাবে এরা পরজীবী—দিনেব বেলা খাটের বা দেওয়ালের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকে, শুধু বাত বাড়লে খিদের জ্বালা মেটাতে এরা মানুষের দেহের রক্ত শোষণ করতে বেরিয়ে আসে। উকুন *(Pediculus humanus)* থাকে মানুষের মাথায় বা শরীরে। মানুষ ছাড়া এরা বাঁচতেই পারে না। যদিও প্রায় প্রত্যেক প্রাণীই কোনো না কোনো পবজীবীর আশ্রয়স্থল, তবুও সাধারণভাবে বেশিরভাগ পরজীবী কীটপতঙ্গদের প্রথম লক্ষ্য অন্যান্য কীটপতঙ্গ। যে সব কীটপতঙ্গ অন্য কীটপতঙ্গকে আশ্রয় করে, তারা হল এনটোমোফ্যাগাস *(Entomophagous)* গোষ্ঠীর পরজীবী।

প্রায় প্রতিটি প্রজাতির কীটপতঙ্গ অন্য প্রজাতির কীটপতঙ্গকে আশ্রয় দেয়, আবার দেখা যায় পরাশ্রয়ীর ওপরও হয়তো অন্য কোনো প্রজাতি নির্ভর করছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরাশ্রয়ীকে বলা হয় হাইপার প্যারাসাইট বা পবজীবী-নির্ভর পরজীবী।

অদ্ভুত ব্যাপার হল, কীটপতঙ্গের ওপর নির্ভরশীল কীটপতঙ্গ বা এনটোমোফ্যাগাস শ্রেণীর পরাশ্রয়ী কীটপতঙ্গ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শূককীট অবস্থাতেই আশ্রয়দাতার ওপর নির্ভরশীল, পূর্ণবয়স্ক হলে অনেক সময় ডানাব সাহায্যে উড়ে যায় ও স্বাধীন জীবনযাপন করে। পরাশ্রয়ী কীটপতঙ্গ আশ্রয়দাতা কীটপতঙ্গের ডিম, শূককীট, গুটিবাঁধা অবস্থা বা পিউপা ও পূর্ণাবয়ব—সবই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। বহু কীটপতঙ্গই পরাশ্রয়ী কীটপতঙ্গের আশ্রয়দাতা যদিও, তবু বিশেষভাবে এনটোমোফ্যাগাস গোষ্ঠীভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় হাইমেনপ্টেরা প্রজাতির ইক্‌নিউমনিড্‌স *(Ichneumonids)*, ব্র্যাকোনিড্‌স *(Braconids)*, ইভানাইড্‌স *(Evanüds)*, ক্যালসিডয়েড *(Chalcidoide)*। এবং কিছু কিছু ডিপ্‌টেরা গোষ্ঠীভুক্ত কীটপতঙ্গ। এরা প্রায় অন্য সব প্রজাতির কীটপতঙ্গের ডিম ও শূককীটকে আশ্রয় করে। অধিকাংশ এনটোমোফ্যাগাস পরাশ্রয়ীর পছন্দমাফিক আশ্রয় আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ইভানাইড্‌স প্রজাতি আরশোলার ডিমের ওপর নির্ভরশীল। ইভানিয়া অ্যাপেন্ডিগাস্টার *(Evania appendigaster)* এক ধরনের মাছি, যারা নিজের চ্যাপ্টা পেট-পিঠ পতাকার মতো ওপরে নিচে দোলায়। এরা ডিম অবস্থায় সাধারণ আরশোলার *(Periplaneta americana)* ওপর নির্ভরশীল। ছোট্ট ছোট্ট ধাতব সবুজ রঙের ক্যালসিডয়েড পোডাগ্রিয়ন *(Podagrion)* একান্তভাবে প্রেইং ম্যানটিসের ডিমের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে।

কীটপতঙ্গের সমাজ : শ্রমিক সম্প্রদায়, রাজ সম্প্রদায় ও জাত-নির্ভর সমাজতান্ত্রিক যন্ত্রজীব

সাম্য বোধ হয় অলীক বস্তু, আয়ত্ত করা যায় না। প্রাণীজগতে যেখানে বৃহত্তম জীব ক্ষুদ্রতমের তিনশো গুণ বড়, যেখানে 'সর্বহারা' কিছু প্রজাতি সব সময়ই 'বিত্তবান'দের বাসস্থান ও আহার্যের দখল নিচ্ছে, যেখানে কিছু প্রজাতি শিকার করে আর অনেকেই হয় ভক্ষ্য, এবং যেখানে এমন কোনো প্রজাতি নেই যে পরাশ্রয়ী জীবের আওতা

থেকে মুক্ত, সেখানে 'সমভাব' বজায় থাকে কি করে? কীটপতঙ্গের সমাজে স্ত্রীজাতীয় জীব পুরুষ জাতীয় জীবের তুলনায় বেশি সঙ্ঘবদ্ধ। পুরুষ বহু অসুবিধার শিকার; থাকে দুর্ব্যবহার, অপমান ও মৃত্যুর অপেক্ষায়। কীটপতঙ্গের সমাজ মূলত স্ত্রীশাসিত; এখানে পুরুষের স্থান তেমন নেই। কর্মক্ষমতা, রুচি, সম্মান, পুরস্কার ও সুযোগ প্রভৃতি রয়েছে অসীম। বহু সংখ্যক কীটপতঙ্গ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছে, মুষ্টিমেয় কিছু জাতভাই ভোগ করছে সুখসুবিধা, দিন কাটাচ্ছে আলস্যে। শ্রমজীবী যারা তারা লুটপাট করে খাদ্য সংগ্রহ করে, ফসল ঘরে তোলে, বাড়ি পরিষ্কার করে। অথবা তারা রাজমিস্ত্রী, নির্মাতা, ছুতোর, তাঁতী, সৈনিক—কি নয়! জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ! কাজের ভিত্তিতেই এদের জাতপাত। সেই সব বিভাগ থেকে না মরা পর্যন্ত রেহাই নেই। শ্রমিকদের রক্ত জল করা পরিশ্রমের ফসল ভোগ করে পুরো প্রজাতি, বঞ্চিত শ্রমিকরা। অসাম্য রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এদের সমাজতন্ত্রে রাজন্যবর্গ মর্যাদা পায়। রাজতন্ত্র এখানে সুরক্ষিত; বিপ্লব ও উচ্ছেদ কল্পনার বাইরে। রাজতন্ত্র এখানে সমাজতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সমাজবদ্ধ প্রজাতি হল ঘুণপোকা, উইপোকা, বোলতা, মৌমাছি ও পিঁপড়ে। ঘুণপোকা উইপোকারা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ। উপনিবেশ এক। জাতিভেদ আছে—বন্ধ্যা স্ত্রীশ্রমিক, সৈনিক, পুরুষ বা রাজা, এবং বংশবৃদ্ধিতে সক্ষম একটি মাত্র রাণী। আলাদা আলাদাভাবে এদের চিনতে পারা যায় এদের আকার, মাথার মাপ, তথাকথিত স্পর্শেন্দ্রিয় ও অন্যান্য নানা উপায়ে। রাণী ও রাজার কাজ শুধুমাত্র বংশবৃদ্ধি। রাণী আকৃতিতে বিরাট, লম্বা ও মোটা প্রায় 10 সেন্টিমিটার লম্বা। আয়ু পনেরো থেকে পঞ্চাশ বছর।

যৌনমিলনে সক্ষমতা এলে এদের ডানা গজায়, পুঞ্জাক্ষি দেখা দেয়। প্রথম বর্ষার শেষে ঝাঁকে ঝাঁকে এরা উড়তে থাকে, তারপরই স্ত্রী পুরুষ মিলিত হয় ও ডানা ঝরে যায়। পুরুষ মারা যায় ও রাণী হয়ে স্ত্রী নতুন বসতি স্থাপন করে। বংশবৃদ্ধিতে সক্ষম দুই রকমের জাত আছে—একটি মুখ্য, অপরটি সম্পূরক। মুখ্য জাত তারাই যারা বয়স্ক ডানাওয়ালা, জন্ম দেয় উর্বর ও বন্ধ্যা প্রজন্মের। সম্পূরক জাতেরা কোনো সময়েই নভোচারী হয় না। এদের চোখ ও ডানা আকারে অনেক ছোট। বংশবৃদ্ধিতে অক্ষম জাতেরা সাধারণভাবে শ্রমিক ও সেনাদল গঠন করে। এদের ডানা নেই, চোখেও এরা দেখতে পায় না। যৌনাঙ্গ উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে অপরিণত। বা থাকেই না। এই সমাজে শ্রমিক শ্রেণীরই সংখ্যাধিক্য। এদের গায়ের রং ফ্যাকাশে, শরীর নরম, অন্ধ। কিন্তু চোয়াল খুব পরিণত ও শক্ত। এরা লুটপাট করে খাবার সংগ্রহ করে, রাণীকে খাওয়ায়, রাণী যে ডিম প্রসব করে তার যত্ন নেয়, ডিম ফুটে সদ্য বের হওয়া বাচ্চা লালন পালন করে, বিশেষ ধরনের ছত্রাকের চাষ করে, মাটি বা কাঠ খুঁড়ে বাসা বানায়, মাটির ওপর ঢিবি তৈরি করে। এবং অন্যান্য কাজকর্মও করে।

সেনাদলের সদস্যরা এক বিশিষ্ট জাতের। এরা অস্বাভাবিক বড়। মাথা শক্ত। বিরাট পরিণত ও সূচালো ওপরের চোয়াল। অথবা মাথা লম্বাটে যা পাখির ঠোঁটের মতো সরু হয়ে গেছে। সৈনিকরা পুরুষ বা স্ত্রী দুই রকমেরই হতে পারে। স্যুডারগেটসরা

বয়সে তরুণ ও অন্ধ। এরা অনেক সময়ই সত্যিকারের শ্রমিকদের কাজগুলো নিজেদের ঘাড়ে নেয়। এরা অনেকটা দিনমজুর ধরনের। উইপোকা বা ঘুণপোকা সাধারণত মাটি কেটে ঢিবি বানিয়ে নিচের সুড়ঙ্গে থাকে। ঢিবির উচ্চতা সমতল থেকে ছয় মিটার। অনেক সময় এরা কাঠের জিনিসের মধ্যেও বাসা বাঁধে। খাদ্য মৃত বা জীবিত গাছের বিভিন্ন অংশ। খায় বিশেষভাবে প্রস্তুত এক ধরনের ছত্রাক, এবং দলের অন্য সদস্যদের মল, মৃতদের চামড়া ও দেহ। এদের অন্ত্রে আছে এক ধরনের প্রোটোজোয়া যার সহায়তায় এরা কাঠ ও গাছের সেলুলোজ হজম করে ফেলতে পারে। সম্ভবত এরাই গাছপালার সবচেয়ে বড় শত্রু। অথচ এরাই আবার মৃত গাছপালা ভক্ষণ করে মাটির উর্বরাশক্তি বাড়ায়।

কীটপতঙ্গের মধ্যে ঘুণপোকা ও উইপোকাই সবচেয়ে বেশি সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। একটা রাণী সারা জীবনে 15,000,000 ডিম পাড়তে পারে। ডানা গজানো মাত্র ঝাঁকে ঝাঁকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে গিয়ে এরা নতুন বসতি স্থাপন করে। পুরানো বসতি অর্থাৎ মাটির নিচের সুড়ঙ্গ বা ঢিবি থেকে স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে। আলোর দিকে আকৃষ্ট হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে থাকে। অবশ্য খুব বেশি দূর উড়তে পারে না। ক্যালোটারমিস *(Kalotermes)* প্রজাতির গন্তব্য এক কিলোমিটারের তিন-চতুর্থাংশের মতো, অন্যদের দৌড় পুরনো বাসা থেকে কয়েক মিটার মাত্র। অবশ্য উড়ে যাবার পথে অনেকেই ব্যাঙ, সরীসৃপ ও পাখির খাদ্য হয়। পিঁপড়েরাও অবশ্য এদের বড় শত্রু। মিলনের জন্যই ওড়া তারপর ডানা ঝরে যায়। পুরুষকীট স্ত্রীকীটের সঙ্গে মাটির নিচে মিলিত হয়। রাণী নতুন বসতিতে প্রথমে প্রায় পঞ্চাশটা (50) ডিম পাড়ে, পরে প্রতিদিন প্রায় কয়েক হাজার করে। রাণী শারীরিক পূর্ণতা অন্যভাবে অর্জন না করলেও প্রজননে দেরি করে না।

প্রজাতিটির শত্রু অনেক। ব্যাঙ, পিঁপড়ে ইত্যাদির কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এছাড়াও আছে অস্ট্রেলিয়ার মেরুদণ্ডী পিপীলিকাভুক একিড্না *(Echidna)*, ভারতীয় প্যাঙ্গোলিন *(Pangolins)*, দক্ষিণ আমেরিকার মিরমেকোফাগা *(Myrmecophaga)*।

এদের বাসায় অগুন্তি স্বজাতি ছাড়াও অতিথি হিসেবে থাকে স্পিংটেইল, সিলভার ফিস পতঙ্গ, ঝিঁঝিঁপোকা, গুবরেপোকা ও মাছি। আছে গৃহস্বামী ও অতিথিদের পরাশ্রয়ী জীবও।

ভাবতে অবাক লাগে, বিশাল সংখ্যক উইপোকা বা ঘুণপোকার জন্ম দেয় একটা মাত্র রাণী ; বলা যায়, বিরাট বসতিতে সকলেই একই মায়ের পেটের সন্তান।

মৌমাছি : মৌমাছিরাও সমাজবদ্ধ জীব। সাধারণত চারটে প্রজাতি : অ্যাপিস মেলিফেরা *(Apis mellifera)*, অ্যাপিস ইন্ডিকা *(Apis indica)*, অ্যাপিস ডরসাটা *(Apis dorsata)* ও অ্যাপিস ফ্লোরিয়া *(Apis florea)*। শ্রমিক মৌমাছি নিজের দেহ থেকে ক্ষরিত মোম দিয়ে মৌচাক তৈরি করে এবং তাতে পরাগরেণু ও ফুলের মধুকোষ থেকে সঞ্চিত মধু সঞ্চয় করে রাখে। এদের জিভ এতই লম্বা যে সহজেই ফুলের ভেতরকার মধুভাণ্ড পর্যন্ত গিয়ে তাকে ফুটো করে দিতে পারে। এদের পেছনের পা রোমশ,

ঠিক যেন বুরুশের মতো, যাতে পরাগরেণু লেগে থাকতে পারে; এই পা ভাঁজ করলেই দেখতে হয় ঝুড়ির মতো। সেই ঝুড়ি খাদ্য সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজে লাগে। মৌমাছিরা মৌচাক তৈরি করে গাছের ডালে, কোটরে বা বড় পাথরের কিনারায়। গৃহপালিত মৌমাছি বাসা বাঁধে কাঠের বাক্সে রাখা কাঠের লম্বা লম্বা তাকের মধ্যে, যে সব তাক ইচ্ছেমতো নড়ানো যায়।

মৌমাছিদের বাসায় আমরা পাই প্রসবে সক্ষম একটা রাণী মৌমাছির মিলনে সক্ষম কিছু পুরুষ মৌমাছি, আর অসংখ্য বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছি ও শ্রমিক মৌমাছি। রাণী মৌমাছিই বসতি স্থাপন করতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ডিম পেড়ে রাণী নিজের লালা দিয়ে বাচ্চাদের লালন করে যতদিন না তারা পূর্ণ বয়স্ক হয়ে শ্রমিক মৌমাছি হয়। শ্রমিক মৌমাছিরা রাণীকে আর কুটোগাছ নাড়তে দেয় না; রাণী ব্যস্ত থাকে শুধু ডিম পাড়তে। শ্রমিকেরা বাসা বড় করে, অপরিণত শিশু মৌমাছিকে খাওয়ায়, পরিষ্কার করে, লালনপালন করে। বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে বাসা ও স্বজাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব ও এই শ্রমিক মৌমাছিদের, পরাগরেণু ও মধু সংগ্রহ করাও দায়িত্ব এদেরই। পুরুষ মৌমাছি অলস, বংশবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই পারদর্শী নয়। এরা অপেক্ষা করে থাকে নতুন জন্মানো রানীর জন্য। যখন বাসিন্দার সংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন শ্রমিক মৌমাছিরা এমন একটা শিশু মৌমাছিকে বেছে নেয়—যে হয়তো সাধারণ অবস্থায় পূর্ণতা প্রাপ্তির পর একটা শ্রমিক মৌমাছিই হত। তাকে বিশেষ যত্ন নিয়ে, খাবার খাইয়ে নতুন রাণী মৌমাছিতে পরিণত করে তোলে। নতুন রাণী এক ঝাঁক শ্রমিক বন্ধু ও কয়েকটা পুরুষ নিয়ে পুরানো দল ও বাসা ত্যাগ করে নতুন বাসা বানাতে উদ্যোগী হয়। মজার কথা, মৌমাছির ক্ষেত্রে নিষিক্ত ডিম স্ত্রীজাতির ও অনিষিক্ত ডিম পুরুষজাতির জন্ম দেয়।

পিঁপড়েদের কথা: পিঁপড়েরাই বোধ হয় আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত কীট। বনে, জঙ্গলে, ঘাসে, মরুভূমিতে, উষ্ণ পরিমণ্ডলে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, মেরুপ্রদেশে এমন কি হিমালয়ের দুর্গমতম জায়গাতেও, এরা বাস করে। সব জাতের পিঁপড়েই সমাজবদ্ধ জীব। একাকিত্ব ব্যাপারটাই এদের কাছে অজানা। কোনো পিঁপড়েই নিজের সমাজ ছেড়ে বেশিদিন বাঁচতে পারে না। এদের সামাজিক জীবন মৌমাছি বা উইপোকা বা ঘুণপোকাদের তুলনায় অনেক বেশি জটিল। এই নিয়ে কীটপতঙ্গ-বিশারদদের চিন্তাও কম নয়। পিঁপড়েদের বসতির আকার ও গঠনবৈচিত্র্যও বিভিন্ন ও বিস্ময়কর।

একটা প্রজাতির পিঁপড়েদের মধ্যে প্রায় একুশটা (21) জাত লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে একটা আস্তানায় থাকে: (i) স্ত্রী শ্রমিক যারা উপযুক্ত পুষ্টি পেলে রাণী পিঁপড়েতে পরিণত হতে পারে; (ii) অগুস্তি শ্রমিক, এরা স্ত্রীজাতীয় ও বন্ধ্যা, ডানাবিহীন; (iii) সৈনিক, যারা বিশাল মাথা ও শক্ত চোয়ালের অধিকারী, যাদের দাঁত ধারালো, শত্রুকে ঘায়েল করতে সক্ষম; (iv) বংশরক্ষায় সক্ষম ডানাযুক্ত স্ত্রীপিঁপড়ে, এরা আকারেও বড়; (v) মিলনে পারদর্শী পুরুষ পিঁপড়ে। পুরুষ পিঁপড়ের সঙ্গে মিলিত

হবার পর রাণী পিঁপড়ের ডানা ঝরে যায়। ডানার দরকারও নেই। এক ঝাঁক ডিম প্রসব করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে রাণী নিজের লালা খাইয়ে তাদের পুষ্ট করে। সৃষ্টি হয় বসতিতে প্রথম শ্রমিক দলের। এরপর থেকে শুধু ডিম পাড়া ছাড়া রাণী পিঁপড়ের আর কোন কাজ নেই। শ্রমিক দলই সব কাজের দায়িত্ব নেয়; এমন কি নতুন বাচ্চাদের প্রতিপালনেরও। রাণী পিঁপড়ে প্রায় পনেরো বছর পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। একটা বসতিতে প্রায় পাঁচ লক্ষ পিঁপড়ে থাকতে পারে। এদের বাসা মাটির নিচে, গাছে, ফাঁপা কোটরে, গাছের কাঁটায়, ফলে, এমন কি পাতাতেও।

সাধারণ ভারতীয় ইকোফাইলা *(Oecophylla)* আমগাছের পাতায়, থেসপেসিয়া *(Thespesia)* ও অন্যান্য গাছেও বাসা বাঁধে। এদের শূককীট সিল্কের মতো সুতো উৎপাদন করে, আর তারই সাহায্যে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে শ্রমিক পিঁপড়ে বাসা বানায়। পিঁপড়েরা নিজেদের বাসার ধারে কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না এবং দরকার মতো বিষাক্ত ফরমিক অ্যাসিড শরীর থেকে নিঃসৃত করে দূর থেকে তাদের আক্রমণ করে।

নিরামিষাশী পিঁপড়ে বীজ, পাতা, মধু ও ছত্রাকভোজী। অনেক পিঁপড়ে যেমন হলকোমিরমেক্স *(Holcomyrmex)* কৃষিজীবি। এরা নিয়মিতভাবে নানা ধরনের ঘাস ও শস্যের চাষ করে থাকে এবং ফসল পাকলে ঘরে তোলে। বর্ষার সময়ে শ্রমিক পিঁপড়ে বাসার চারপাশে ফসলের বীজ বপন করে। ফসল তোলার পর শুকনো গাছ ও ডালপালা সুন্দর করে বাসার প্রবেশদ্বারে সাজিয়ে রাখে। অধিকাংশ পিঁপড়ে এফিড ও মেমব্রাসিড গোষ্ঠীর প্রাণীদের পোষে। এদের দেহ থেকে নির্গত মিষ্টি রস পান করে। অ্যাটিনি গোষ্ঠীর পিঁপড়ে বাসার ভেতর জমি তৈরি করে বিশেষ ধরনের সুস্বাদু

68. ব্যস্ত পিপীলিকা। বাঁদিকে একটি শ্রমিক পিপীলিকা সবে 'অ্যান্ট-কাউ' অর্থাৎ পিপীলিকাদের 'গরু' অ্যাফিডকে দোহন করছে মিষ্টি টলটলে মধুর জন্য। এখন সেই খাদ্য তার চোয়ালে শুধু গিলবার অপেক্ষা। ডানদিকে একটি শ্রমিক পিপীলিকা শূককীট বহন করছে।

ঠিক যেন বুরুশের মতো, যাতে পরাগরেণু লেগে থাকতে পারে; এই পা ভাঁজ করলেই দেখতে হয় ঝুড়ির মতো। সেই ঝুড়ি খাদ্য সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজে লাগে। মৌমাছিরা মৌচাক তৈরি করে গাছের ডালে, কোটরে বা বড় পাথরের কিনারায়। গৃহপালিত মৌমাছি বাসা বাঁধে কাঠের বাক্সে রাখা কাঠের লম্বা লম্বা তাকের মধ্যে, যে সব তাক ইচ্ছেমতো নড়ানো যায়।

মৌমাছিদের বাসায় আমরা পাই প্রসবে সক্ষম একটা রাণী মৌমাছির মিলনে সক্ষম কিছু পুরুষ মৌমাছি, আর অসংখ্য বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছি ও শ্রমিক মৌমাছি। রাণী মৌমাছিই বসতি স্থাপন করতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ডিম পেড়ে রাণী নিজের লালা দিয়ে বাচ্চাদের লালন করে যতদিন না তারা পূর্ণ বয়স্ক হয়ে শ্রমিক মৌমাছি হয়। শ্রমিক মৌমাছিরা রাণীকে আর কুটোগাছ নাড়তে দেয় না; রাণী ব্যস্ত থাকে শুধু ডিম পাড়তে। শ্রমিকেরা বাসা বড় করে, অপরিণত শিশু মৌমাছিকে খাওয়ায়, পরিষ্কার করে, লালনপালন করে। বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে বাসা ও স্বজাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব ও এই শ্রমিক মৌমাছিদের, পরাগরেণু ও মধু সংগ্রহ করাও দায়িত্ব এদেরই। পুরুষ মৌমাছি অলস, বংশবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই পারদর্শী নয়। এরা অপেক্ষা করে থাকে নতুন জন্মানো রানীর জন্য। যখন বাসিন্দার সংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন শ্রমিক মৌমাছিরা এমন একটা শিশু মৌমাছিকে বেছে নেয়—যে হয়তো সাধারণ অবস্থায় পূর্ণতা প্রাপ্তির পর একটা শ্রমিক মৌমাছিই হত। তাকে বিশেষ যত্ন নিয়ে, খাবার খাইয়ে নতুন রাণী মৌমাছিতে পরিণত করে তোলে। নতুন রাণী এক ঝাঁক শ্রমিক বন্ধু ও কয়েকটা পুরুষ নিয়ে পুরানো দল ও বাসা ত্যাগ করে নতুন বাসা বানাতে উদ্যোগী হয়। মজার কথা, মৌমাছির ক্ষেত্রে নিষিক্ত ডিম স্ত্রীজাতির ও অনিষিক্ত ডিম পুরুষজাতির জন্ম দেয়।

পিঁপড়েদের কথা : পিঁপড়েরাই বোধ হয় আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত কীট। বনে, জঙ্গলে, ঘাসে, মরুভূমিতে, উষ্ণ পরিমণ্ডলে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, মেরুপ্রদেশে এমন কি হিমালয়ের দুর্গমতম জায়গাতেও, এরা বাস করে। সব জাতের পিঁপড়েই সমাজবদ্ধ জীব। একাকিত্ব ব্যাপারটাই এদের কাছে অজানা। কোনো পিঁপড়েই নিজের সমাজ ছেড়ে বেশিদিন বাঁচতে পারে না। এদের সামাজিক জীবন মৌমাছি বা উইপোকা বা ঘুণপোকাদের তুলনায় অনেক বেশি জটিল। এই নিয়ে কীটপতঙ্গ-বিশারদদের চিন্তাও কম নয়। পিঁপড়েদের বসতির আকার ও গঠনবৈচিত্র্যও বিভিন্ন ও বিস্ময়কর।

একটা প্রজাতির পিঁপড়েদের মধ্যে প্রায় একুশটা (21) জাত লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে একটা আস্তানায় থাকে : (i) স্ত্রী শ্রমিক যারা উপযুক্ত পুষ্টি পেলে রাণী পিঁপড়েতে পরিণত হতে পারে ; (ii) অগুন্তি শ্রমিক, এরা স্ত্রীজাতীয় ও বন্ধ্যা, ডানাবিহীন ; (iii) সৈনিক, যারা বিশাল মাথা ও শক্ত চোয়ালের অধিকারী, যাদের দাঁত ধারালো, শত্রুকে ঘায়েল করতে সক্ষম; (iv) বংশরক্ষায় সক্ষম ডানাযুক্ত স্ত্রীপিঁপড়ে, এরা আকারেও বড় ; (v) মিলনে পারদর্শী পুরুষ পিঁপড়ে। পুরুষ পিঁপড়ের সঙ্গে মিলিত

হবার পর রাণী পিঁপড়ের ডানা ঝরে যায়। ডানার দরকারও নেই। এক ঝাঁক ডিম প্রসব করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে রাণী নিজের লালা খাইয়ে তাদের পুষ্ট করে। সৃষ্টি হয় বসতিতে প্রথম শ্রমিক দলের। এরপর থেকে শুধু ডিম পাড়া ছাড়া রাণী পিঁপড়ের আর কোন কাজ নেই। শ্রমিক দলই সব কাজের দায়িত্ব নেয়; এমন কি নতুন বাচ্চাদের প্রতিপালনেরও। রাণী পিঁপড়ে প্রায় পনেরো বছর পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। একটা বসতিতে প্রায় পাঁচ লক্ষ পিঁপড়ে থাকতে পারে। এদের বাসা মাটির নিচে, গাছে, ফাঁপা কোটরে, গাছের কাঁটায়, ফলে, এমন কি পাতাতেও।

সাধারণ ভারতীয় ইকোফাইলা *(Oecophylla)* আমগাছের পাতায়, থেসপেসিয়া *(Thespesia)* ও অন্যান্য গাছেও বাসা বাঁধে। এদের শূককীট সিল্কের মতো সুতো উৎপাদন করে, আর তারই সাহায্যে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে শ্রমিক পিঁপড়ে বাসা বানায়। পিঁপড়েরা নিজেদের বাসার ধারে কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না এবং দরকার মতো বিষাক্ত ফরমিক অ্যাসিড শরীর থেকে নিঃসৃত করে দূর থেকে তাদের আক্রমণ করে।

নিরামিষাশী পিঁপড়ে বীজ, পাতা, মধু ও ছত্রাকভোজী। অনেক পিঁপড়ে যেমন হলকোমিরমেক্স *(Holcomyrmex)* কৃষিজীবি। এরা নিয়মিতভাবে নানা ধরনের ঘাস ও শস্যের চাষ করে থাকে এবং ফসল পাকলে ঘরে তোলে। বর্ষার সময়ে শ্রমিক পিঁপড়ে বাসার চারপাশে ফসলের বীজ বপন করে। ফসল তোলার পর শুকনো গাছ ও ডালপালা সুন্দর করে বাসার প্রবেশদ্বারে সাজিয়ে রাখে। অধিকাংশ পিঁপড়ে এফিড ও মেমব্রাসিড গোষ্ঠীর প্রাণীদের পোষে। এদের দেহ থেকে নির্গত মিষ্টি রস পান করে। অ্যাটিনি গোষ্ঠীর পিঁপড়ে বাসার ভেতর জমি তৈরি করে বিশেষ ধরনের সুস্বাদু

68. ব্যস্ত পিপীলিকা। বাঁদিকে একটি শ্রমিক পিপীলিকা সবে 'অ্যান্ট-কাউ' অর্থাৎ পিপীলিকাদের 'গরু' অ্যাফিডকে দোহন করছে মিষ্টি টলটলে মধুর জন্য। এখন সেই খাদ্য তার চোয়ালে শুধু গিলবার অপেক্ষা। ডানদিকে একটি শ্রমিক পিপীলিকা শূককীট বহন করছে।

ছত্রাকজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে। জমি তৈরি হয় পাতা দিয়ে। এক দল শ্রমিক ভোরবেলা বাসা থেকে বেরিয়ে ঝোপে ঝাড়ে বা গাছে চড়ে ও পাতা কেটে কেটে নিচে ফেলে। সেখান থেকে আর একদল শ্রমিক পাতা বয়ে নিয়ে যায় বাসায়। মাথার ওপর পাতা তুলে নেয়, ছাতার মতো, যাতে একদৌড়ে খুব তাড়াতাড়ি বাসায় পৌছে যাওয়া যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে আরও একদল। তারা ওই পাতা নিয়ে ভেতরে যায় ও স্তূপ করে সাজিয়ে রাখে বিশেষভাবে তৈরি সব কুঠুরিতে। এবার অন্য একদল শ্রমিক নিয়ে আসে ছত্রাকের বীজ ও কলম লাগানের মত তা ছড়িয়ে দেয় পাতার স্তূপে। আগাছা যা ফলে সরিয়ে রাখে। পিঁপড়েরা ওই ছত্রাক খায়। মেলোপোরাস *(Meloporus)* বা মধুভাণ্ড প্রজাতির পিঁপড়ে শ্রমিক তাদের অস্বাভাবিক বড় মাপের পেটে মধু ভর্তি করে নিয়ে যায় বসতির অন্যান্য পিঁপড়েদেব জন্য। 'দাস-তাড়ানো' পিঁপড়েরা অন্যদের বাসায় হানা দেয়, বাসায় ঢুকে তাদের যুদ্ধে পরাজিত করে, বন্দী করে নিয়ে যায় শূককীটদের পরে তাদেব কাজে লাগানো হয় শ্রমিক হিসেবে। প্রভু পিঁপড়েরা নির্ভর করে, ভৃত্য পিঁপড়েদের ওপর। এরা মুখে খাবার তুলে না দিলে খাওয়াই হয় না।

পিঁপড়েদের বাসায় বাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত ও অনাহূত অতিথি থাকে যেমন ঝিঁঝিঁপোকা, এফিড্, মেমব্রাসিড্, কোসিড্, মাছি, স্পিংটেইল ইত্যাদি। তাছাড়া পরাশ্রয়ী জীবেরা তো আছেই। আবার ঠিক পিঁপড়েদের মতো দেখতে খুদে মাকড়সাও বাদ যায় না।

অনুরাগ ও বংশবৃদ্ধি

কীটপতঙ্গের ব্যবহারিক জীবনের মত যৌনজীবনও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। অধিকাংশ উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর মতো কীটপতঙ্গও সাধারণভাবে স্ত্রী ও পুরুষ দুইভাগে বিভক্ত, সংখ্যা প্রায় সমান সমান। অবশ্য বেশ কয়েকটা প্রজাতিতে পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি, আবার কিছু প্রজাতি আছে যেখানে পুরুষ অত্যন্ত কম, প্রায় অনুপস্থিত। কয়েকটা প্রজাতিতে দেখা যায় স্ত্রীজাতীয় কীট বা পতঙ্গ মিলন ছাড়াই প্রসবে সক্ষম। সেক্ষেত্রে হয় পুরুষ একেবারেই অনুপস্থিত বা দীর্ঘ সময় ও কয়েক প্রজন্ম বাদে বাদে অনিয়মিতভাবে তাদের আবির্ভাব ঘটে। স্টোনফ্লাইয়ের বিশেষ কয়েকটা উপশাখা উভলিঙ্গ। লিঙ্গভেদে আকৃতি, রং ও অন্যান্য স্বভাবের বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রী কীটপতঙ্গ সাধারণত আকারে বড়। এদের স্পর্শেন্দ্রিয় অনেক বেশী উন্নত। আয়ুও বেশি। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীরা খাদ্যগ্রহণে সক্ষম, পুরুষেরা নয়। আগেই বলা হয়েছে, একমাত্র স্ত্রীমশাই রক্তপান করে। সাইকিড *(Psychid)* প্রজাতির স্ত্রীমথ ডানাহীন ও শূককীটের মতো দেখতে; পুরুষেরা কিন্তু ডানাযুক্ত। ডুমুরের মধ্যে যে সব পোকা হয়, তাদের মধ্যে আবার পুরুষেরা ডানাহীন, স্ত্রীরা ডানাযুক্ত। স্ত্রী ভেলভেট পোকা (মিউটিলিড জাতীয় বোলতা) ডানাহীন, কিন্তু পুরুষ ভেলভেট পোকা ডানাযুক্ত। স্ত্রীদের সঙ্গে এদের কোনোই সাদৃশ্য নেই। বোলতার (বিষাক্ত সায়নিপিড) ক্ষেত্রে এক প্রজন্ম বাদে বাদে ডানা দেখা যায়।

কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে সাধারণত মিলনের আগে কিঞ্চিৎ অনুরাগপর্ব লক্ষ্য করা যায়। পুরুষেরা শুঁড় নাড়ায়, পাখা নাচায় স্ত্রীদের শরীর স্পর্শ করে নিজেদের প্রণয় ব্যক্ত

করে। কিছু কিছু কীটপতঙ্গ, যেমন মেফ্লাই, গয়ালপোকা, ঘুণপোকা ও উইপোকা, মিলনের আগে দলবদ্ধ অবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষ মিলে শূন্যে ডানা নাড়িয়ে নৃত্য করে। আলাদ আলাদা তারপর স্ত্রী ও পুরুষ যুগলবন্দী হয়ে উঠে যায় আরও অনেক ওপরে। প্রাক্‌মিলন প্রণয়পর্বে পুরুষ স্কারাবিড বীটল প্রেমের নিদর্শন হিসেবে স্ত্রী বোলতাকে ভবিষ্যৎ শূককীটের জন্য সঞ্চিত খাদ্য উপহার দেয়। তাছাড়া মিলনের কক্ষ নির্মাণে উভয়পক্ষই থাকে সমান উৎসাহী, কখনও বা পুরুষ একাই এই কাজ করে, এবং পরে প্রেমিকাকে মিলনে আহ্বান করে।

অনেক কীটপতঙ্গ অনুরাগপর্বের পর শূন্যেই পরস্পর মিলিত হয়; আবার অনেকে যুগলে চলে যায় নিরাপদ আশ্রয়ে যেমন পাথরের ফাটলে। কেউ বা মিলিত হয় গাছের পাতার ফাঁকে, ঝোপে, ঘাসের মধ্যে, নানা জায়গায়। সাধারণত মিলনের পর ক্লান্ত পুরুষ মারা যায়। শিকারী মাকড়সার ক্ষেত্রে পুরুষের অবস্থা মর্মন্তুদ। মিলনের চরম মুহূর্তে স্ত্রীসঙ্গী তাকে ভক্ষণ করে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মিলনে। আগে বলা হয়েছে, বহু ক্ষেত্রে স্ত্রী কীটপতঙ্গ পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত না হয়েও ডিম পাড়ে। কুমারী মাতার এই ধরনের জন্মদান পার্থেনোজেনেসিস নামে খ্যাত। বহু প্রজাতিতে এটা লক্ষ্য করা যায়; অনেক প্রজাতিতে পর্যায়ক্রমে একটা প্রজন্ম বাদ দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মে এইধরনের প্রজনন প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। পার্থেনোজেনেসিস ও উভলিঙ্গতা সাধারণত এফিড ও স্ফীতি-বোলতা প্রজাতিতে পর্যায়ক্রমে দেখা যায়। অনিষিক্ত ডিম পুরুষ জাতির ও নিষিক্ত ডিম স্ত্রীজাতির জন্মের জন্য দায়ী। বিশেষভাবে লক্ষণীয় সায়নিপিড বোলতা ও মৌমাছির ক্ষেত্রে। এফিডের ক্ষেত্রে জন্মদান প্রণালী অত্যন্ত জটিল। একটা নিষিক্ত ডিম থেকে জন্ম নেয় ডানাহীন স্ত্রী এফিড; তার থেকে পার্থনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় কয়েকটা প্রজন্মের ডানাবিহীন স্ত্রী এফিড। আসে তারপর স্ত্রী ও পুরুষ একই পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায়। স্ত্রী ও পুরুষেরা অন্য জায়গায় গিয়ে এবার নতুন বসতি স্থান করে, মিলিত হয় ও বংশবৃদ্ধি করে। প্রসূত ডিম সবই নিষিক্ত। কিছু কিছু ডিপটেরা গোষ্ঠীতে বংশবৃদ্ধিতে সক্ষম স্ত্রীপ্রাণী ছাড়াও অপরিণত শূককীট ওই একই পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় জন্মদানে সক্ষম। অপরিণত অবস্থায় জন্মদান ক্ষমতার বিজ্ঞান সম্মত নাম পেডোজেনেসিস। মায়াস্টর ও বিষাক্ত ডাঁশের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই ধরনের বংশরক্ষা। স্ত্রী এক থেকে কয়েক লক্ষ ডিম পাড়তে পারে। জরায়ুজ কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে মায়ের দেহের ভেতরেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় ও শূককীট বা গুটিপোকা বা একেবারে পূর্ণাঙ্গ শিশু জন্ম নেয়। অনেক জরায়ুজ কীটপতঙ্গের জরায়ু অত্যন্ত উন্নতমানের; মায়ের জরায়ু থেকেই সন্তান প্রয়োজনীয় পুষ্টি আহরণ করে।

রূপান্তর: খুব দ্রুত ডিম পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু ডিম ফুটে সদ্য বেরোনো বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ কীটের মতো দেখতে হয় না। সাধারণত এটা অপরিণত শূককীট। ডানাহীন,

পুঞ্জাক্ষি ও শুঁড় অনুপস্থিত। এরা রাক্ষসের মতো খায় এবং বড় হওয়ার সময়ে বার কয়েক খোলস বদলায়। শূককীট সম্পূর্ণ বড় হয়ে গেলে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এরা তখন অলস। নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। বেশির ভাগ সময়ে নিজেদের চারপাশে রেশম সুতোর মতো তন্তু দিয়ে আবরণ তৈরি করে। তারপর শেষবারের মতো খোলস ছেড়ে গুটির মধ্যে ঢুকে যায়। কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর গুটির রং বদলায়। এবং অবশেষে গুটি কেটে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তবয়স্ক কীট বা পতঙ্গ (গুবরেপোকা, মথ, প্রজাপতি, মাছি ইত্যাদি) বেরিয়ে আসে। শূককীটের বৃদ্ধি ও ক্রমিক পরিবর্তন (যতক্ষণ না পূর্ণতা আসছে) মেটামরফসিস নামে পরিচিত। প্রজাপতি, মথ, গুবরেপোকা, মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়ে, মশা ও মাছির বেলায় শূককীট থেকেই পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে লোকচক্ষুর অগোচরে, গুটির মধ্যে। মেটামরফসিস একটা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। যেসব কীটপতঙ্গের পরিপূর্ণ মেটামরফসিস হয় তাদের এক কথায় হলোমেটাবোলা *(Holometabola)* বলা হয়। ফড়িং, আরশোলা ও ছারপোকা জাতীয় কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আসে খুবই ধীরে। শূককীটের ডানা থাকে, তবে প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেকবার খোলস ছাড়ার সময় তা বাড়তে থাকে। এদের ক্ষেত্রে গুটি অবস্থা তেমনভাবে দেখা যায় না। এদের মেটামরফসিস অসম্পূর্ণ, এরা হেটেরোমেটাবোলা *(Heterometabola)* গোষ্ঠীর। মেটামরফসিস নির্ভর করে উষ্ণতা, আর্দ্রতা, খাদ্য ও কীটপতঙ্গের মস্তিষ্কনিঃসৃত হরমোনের ওপর।

খুবই অবাক লাগে ভাবতে কি করে অত্যন্ত কুৎসিত একটা শুঁয়োপোকা আমাদের বাগানের গাছের পাতা খেয়ে বড় হয়ে অত সুন্দর রঙবেরঙা প্রজাপতি হয়ে যায়, আবার আমাদেরই বাগানের গাছের ফুলে ফুলে মধুর সন্ধানে উড়ে বেড়ায়। প্রজাপতি গুটি কেটে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসছে, গোটানো ডানা মেলে দিচ্ছে দুপাশে, ডানাগুলো বাইরের বাতাস লেগে শুকিয়ে শক্ত হচ্ছে—এক আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু কি করে ডানা তৈরি হয়? কি করেই বা শিশু প্রজাপতি বুঝতে পারে কোন ফুলে মধুর ভাণ্ডার? কেনই বা এই রূপান্তর? এসবই কীটপতঙ্গ-বিষয়ক গবেষণার বিরাট ক্ষেত্র, এক মজার কাহিনী।

তৃতীয় অধ্যায়

কীটপতঙ্গের শিশুপালন

অন্যান্য প্রাণীদের মতো কীটপতঙ্গদেরও অনাহার প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অসুখবিসুখ, শত্রু ও অন্য অনেক বিপদের মোকাবিলা করতে হয়। পূর্ণাঙ্গ কীটপতঙ্গ সাধারণত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিপদ আপদ এড়িয়ে চলাফেরা করতে সক্ষম। এরা খাবার সংগ্রহ করে, শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করে। কিন্তু এদের ডিম ও শূককীট অত্যন্ত অসহায়। ডিম ফুটে শূককীটের জন্ম হওয়ার আগে অনেক রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়, যেমন তুষারপাত, উষ্ণতা, আর্দ্রতা বা শুষ্কতা। তাছাড়া অগণিত শত্রু তো আছেই। শূককীটকে আবার খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে থাকতে হয়। অনেকে পথ হারিয়ে ফেলে, খিদেয় ও ক্লান্তিতে মারা যায়; বাকিদের উদরসাৎ করার জন্য শত্রুরও অভাব নেই। এতো প্রতিকূলতার মধ্যে এরা বেঁচে আছে কিভাবে?

সমস্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রেই বাবা মা সাধারণত শিশুদের বিপদ থেকে আগলে রাখে, বাইরের অমঙ্গলের আঁচ লাগতে দেয় না, খাওয়ায়, শিক্ষা দেয়, যতদিন না পর্যন্ত তারা নিজেদের ভালো বুঝতে পারে। পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণের ফলেই প্রাণীজগতের শিশুমৃত্যুর হার এতো কম।

বেশির ভাগ কীটপতঙ্গই অবশ্য জন্মেই অনাথ। বাবা শিশুর জন্মের আগেই মৃত, মা মরে গিয়ে জন্মদান করে। যদিও অধিকাংশ কীটপতঙ্গ নিজেদের সন্তান দেখার জন্য বেশি দিন বাঁচে না, তবু শিশুরা অনেকেই অভিভাবকদের স্নেহ পায়। ডিম, শূককীট, গুটি, এমন কি গুটি কেটে বেরিয়ে আসা পূর্ণাঙ্গ কিন্তু তরুণ কীটপতঙ্গকে দেখাশুনা করতে একই বসতির অন্যান্য বাসিন্দারা উপস্থিত থাকে।

ডিমের যত্ন

স্ত্রী কীটপতঙ্গ অত্যন্ত সাবধানে সঠিক ও নিরাপদ জায়গায় ডিম প্রসব করে যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়ানো যায়, যাতে ডিম ফুটে সদ্য বেরোনো শূককীট সহজেই নিজের খাদ্য ও আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে। শত্রুদের কবল থেকেও এরা ডিম লুকিয়ে রাখে।

সঠিক ও নিরাপদ জায়গায় ডিম প্রসব করা বেশ শক্ত কাজ। যথেষ্ট সতর্ক হয়ে স্ত্রী কীটপতঙ্গ কাজটা করে। প্রথম চিন্তা সঠিক মাধ্যম (জল, স্থল, ইত্যাদি) পাওয়ার। বহু নভোচর কীটপতঙ্গের শূককীট জলজ, তাই স্ত্রীরা জলেই ডিম পাড়ে। পূর্ণাঙ্গ ক্যাডিসফ্লাই স্টোনফ্লাই, জলফড়িং বা গয়ালপোকা, মেফ্লাই ও মশা জলে থাকে না, তবু ডিম পাড়ার সময় হলে এরা ঝর্ণা বা পুকুর খোঁজে। এদের শূককীট জলজ বলে জলে বা জলের কাছাকাছি এরা ডিম পাড়ে। ডিম এদিক ওদিক ছড়ানো থাকে না; ডিমগুলোকে ধরে আঁকড়ে রাখার জন্য বহু উপায় অবলম্বন করে দেখে যাতে জলে ডুবে না যায় বা স্রোতের টানে ভেসে না যায়। তাছাড়া অন্যান্য ধরনের বিপদ থেকেও রক্ষা করার দায় আছে। পুকুর বা জলাশয়ের জলের ওপর যখন মা ডিম পাড়ে তখন তা ডুবে যাবার ভয় থাকে, মা তাই ভেলা বানিয়ে নেয়। বহু কীটপতঙ্গ বসন্তে ও গ্রীষ্মে গাছের পাতায় ডিম পাড়ে, শরৎকাল এলেই তারা শুরু করে দেয় দেহনিঃসৃত আঠালো রসের সাহায্যে গাছের পাতা ডালের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখার কাজ। ডিমভরা পাতা যেন মাটিতে না পড়ে যায়। ডিমকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য শত্রু ভাবাপন্ন প্রাণীদের কবল থেকে মুক্ত রাখার জন্য প্রতি প্রজাতির কীটপতঙ্গ সচেষ্ট থাকে। কোনো কোনো কীটপতঙ্গ আবার মাটির নিচে ডিম রাখে; অনেকে আবার ডিম পেড়ে মাটি খুঁড়ে তা আলগা করে তাই দিয়ে ডিম ঢেকে রাখে। ফড়িং মাটি খুঁড়ে সেই আলগা মাটির মধ্যে তাদের লম্বা পেট ঢুকিয়ে দিয়ে ডিম পাড়ে। বাঘপোকা মাটির নিচে সুড়ঙ্গ কেটে একেবারে শেষ প্রান্তে ডিম পেড়ে রাখে, পরে সুড়ঙ্গ কাদামাটি দিয়ে ভর্তি করে। এমন কি ওপরের মাটিও এমনভাবে সমান করে রেখে দেয় যাতে শত্রুপক্ষ কোনো সন্দেহজনক চিহ্ন দেখতে না পায়। অনেক কীটপতঙ্গ আবার ডিম এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে শত্রুপক্ষকে ঠকাবার জন্য অন্য জায়গায় সুড়ঙ্গ বানিয়ে রাখে। কয়েকটা প্রজাতির কীটপতঙ্গ ধুলোবালি আবর্জনা, শরীর নিঃসৃত মোমজাতীয় পদার্থ ও রেশমের সুতোর মতো জাল দিয়ে ডিম ঢেকে রাখে। অনেকে আবার পরিশ্রম করে ডিম রাখার বাক্স, ভেলা, গুটি বানিয়ে তার ভেতর ডিম পাড়ে। ডিম রাখার এইসব খোলক সব সময় ডিম লুকিয়ে রাখার জন্য নয়। গর্ভাবস্থা থেকেই মা চিন্তায় থাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে কিসে তার আরাম হবে। বাক্স বা খোলক বানাবার জন্য যা নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করে রাখে। অ্যাসপিডোমরফা মিলিয়ারিস *(Aspidomorpha miliaris)* প্রজাতির গুবরেপোকা (ভারতে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় কনভলভুলাস—*Convolvulus* জাতীয় গাছে) 30 থেকে 40টা ডিমের উপযোগী বাক্স বানায়। লম্বালম্বিভাবে এতে আটটা প্রকোষ্ঠ বা কুঠুরির সারি থাকে, শুধু মাঝের চারটিতে ডিম থাকে। আর দুই পাশের দুটো করে কুঠুরি খালি থাকে নিরাপত্তার জন্য। একটা বাক্স বানাতে সময় লাগে ঘণ্টা দেড়েক। সারা জীবনে একটা গুবরেপোকা এই রকম প্রায় সত্তরটা (70) বাক্স তৈরি করে। শিকারী মাকড়সা (যে প্রজাতির স্ত্রী পুরুষসঙ্গীকে মিলনের পরই ভক্ষণ করে) আদর্শ মা কিন্তু ভাবী শিশুর নিরাপত্তার জন্য দেহনিঃসৃত এক ধরনের বিশেষ

রস দিয়ে সে প্রচুর বাষ্প তৈরি করে। বাষ্প আসলে বাতাস ভরা, জমে যাওয়া সাবানের ফেনার মতো। উষ্ণতা, আর্দ্রতা সবই ডিমের উপযোগী। সাধারণত রাতে গাছের ডালে স্ত্রী মাকড়সা বাসা বাঁধে। হাইড্রোফিলিড জলচর গুবরে পোকা রেশমী সুতো জাতীয় তন্তু দিয়ে অত্যন্ত জটিল ধরনের ভেলা তৈরি করে এবং বাতাস চলাচলের জন্য তাতে সরু নলের আকারের ফোকর রাখে। স্ত্রী কীট জলে ভেসে থাকা পাতার নিচে গিয়ে পাতার ধার সামনের পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে বাসা বোনা শুরু করে। মিনিট দশেক বোনার পর লাফিয়ে উঠে যায় পাতার ওপর। তখনও কিন্তু পাতা ধরেই থাকে। এরপর শুরু হয় পাতার ধার দিয়ে বোনা। ঠিক যেন পকেটের মতো হয়ে যায় পাতাটা। তার ভেতরই স্ত্রীকীট ডিম পাড়ে। ওই পকেটের মতো বাক্সে ডিমের ওপর বাতাস চলাচলের জন্য খাড়াভাবে ঠিক চিমনির আকারের বায়ু-চলাচলের পথ করা থাকে। এবার ওপরে নিচে ছোট ছোট পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় যাতে ডিমভর্তি পকেট জলে ভাসমান অবস্থায় দেখতে না পাওয়া যায়।
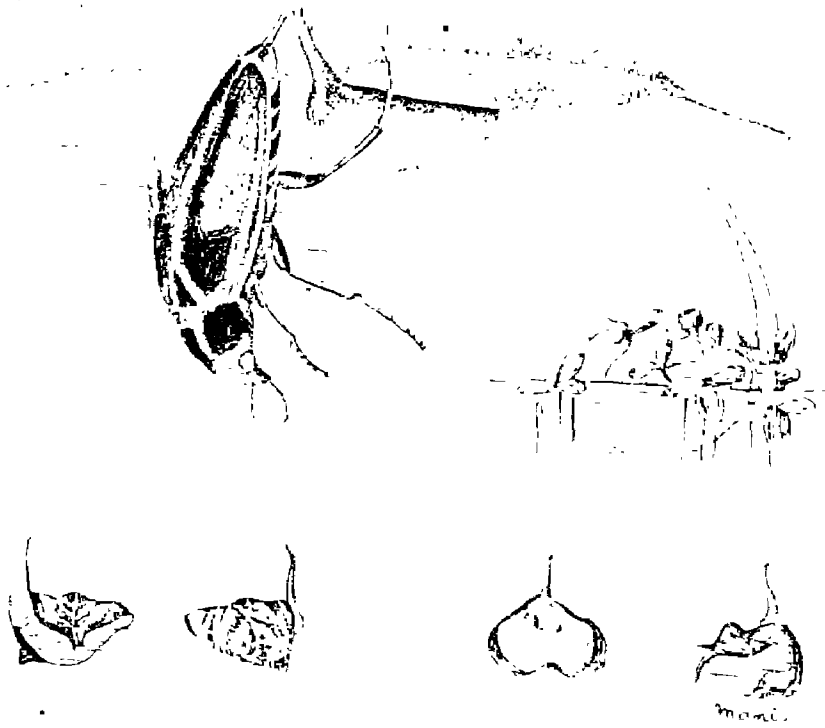
69. স্ত্রী জাতীয় জলের পোকা (অ্যাকোয়াটিক বীটল) *হাইড্রাস* ও তার ডিমের গুটি, যা রেশমী সুতোয় [illegible]নী। ভাসমান পাতার নীচে। পাতায় আছে বায়ু চলাচলের জন্য বাঁকানো নল, যাতে গুটির ভেতর ডিমের বিকাশ সম্ভব হয়। অতি কুশলতার সঙ্গে এমনভাবে সেটা পাতার টুকরো দিয়ে বাইরের দিক থেকে ঢাকা দেওয়া, যাতে শত্রুরা বুঝতে না পারে।
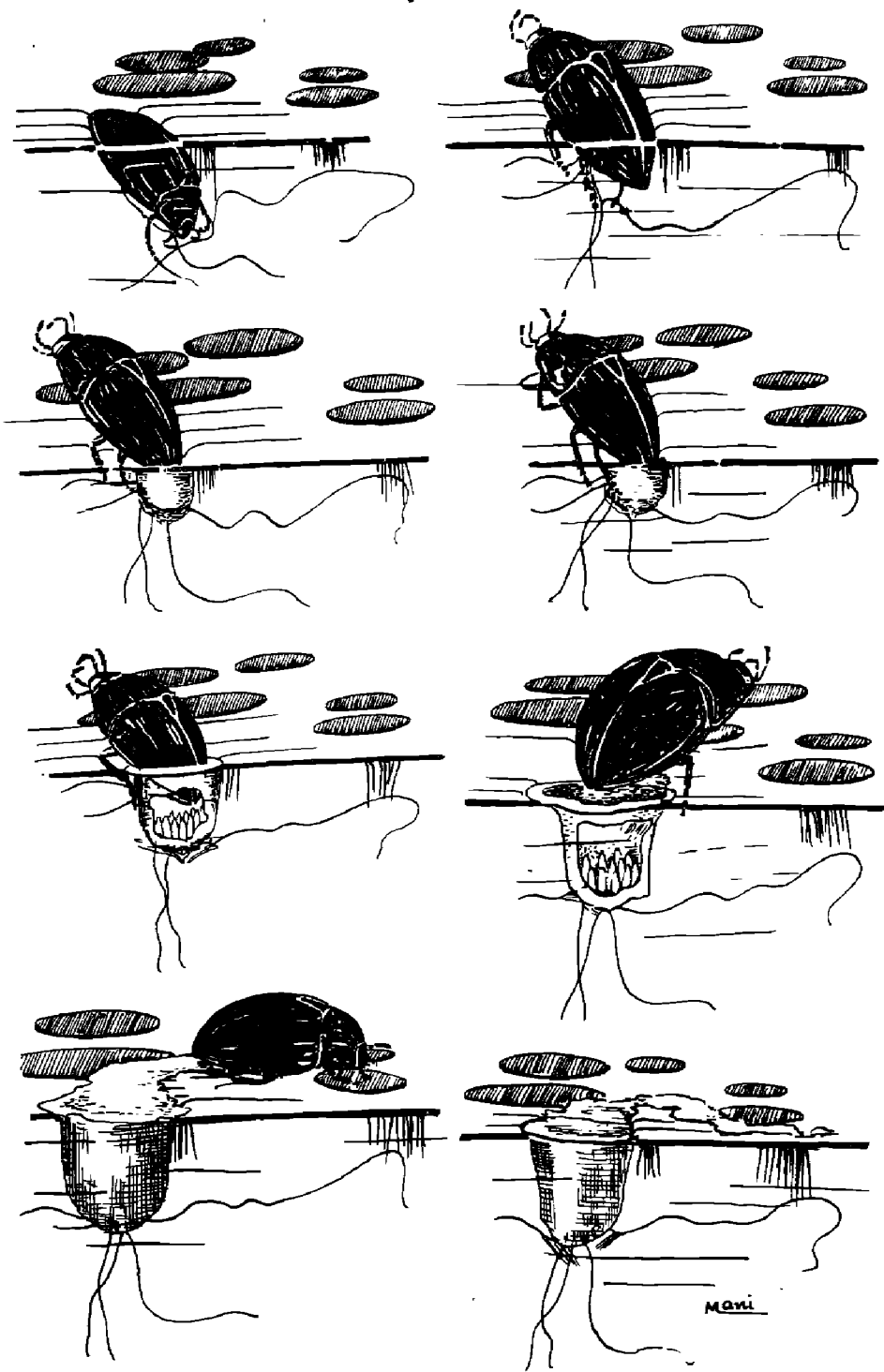
70. স্ত্রী জলের পোকা (অ্যাকোয়াটিক বীটল) রেশমী সুতোর সাহায্যে জলে ডিম ভাসমান রাখছে।
(**লেঙ্গারকেন** থেকে পরিমার্জিত)

অন্ডজ প্রাণীর বাসা

ডিম ও শূককীট—দু-ই রক্ষা করে অন্ডজ প্রাণীর বাসা। অনেক সময় মা তার শূককীটের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য এখানেই সঞ্চিত রাখে, ডিম ও শূককীট পাহারা দেবার জন্য দিনরাত বসে থাকে। যদিও সমাজবদ্ধ কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে এই বাসা বানানোর কৌশল সবচেয়ে উন্নত, তবু সাধারণভাবে অধিকাংশ কীটপতঙ্গ যথেষ্ট মাথা খাটিয়ে বাসা বানায়। অনেকে আবার কষ্ট করে বাসাও বানায় না, ফন্দী আঁটে কি করে অন্যদের বাসার দখল নেওয়া যায়। সেক্সটন জাতীয় গুবরেপোকা সমুদ্রতীরের বালি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে। ভেতরে চারদিকে লম্বাটে ডিম্বাকৃতির কুঠুরি বানায় ডিমের জন্য। প্রধান সুড়ঙ্গ থাকে সদ্যোজাত শূককীটের জন্য।

বহু কীটপতঙ্গ পরিশ্রম বাঁচাতে অন্য কীটপতঙ্গের বাসা জবরদখল করে। অনেক জাতের রাক্ষুসে বোলতা ভাবি শূককীটের খাবার খুঁজতে মাকড়সা বা ঝিঁঝিঁপোকার আস্তানায় গিয়ে হানা দেয় এবং শিকারকে হুল ফুটিয়ে অবশ করে দিয়ে তার দেহের ওপর ডিম পাড়ে। শিকারের বাসার প্রবেশপথ তারপর বন্ধ করে দেয়। সঙ্গীহীন জীবনযাপন করে মেথোকা *(Methoca)* জাতীয় বোলতা। এরা সিসিনডেলিড *(Cicindelid)* জাতীয় গুবরেপোকার শূককীটের বাসায় ঢুকে তাদের ঘাড় মটকে টেনে নিয়ে আসে নিজের ডেরায়, তাদের মুমূর্ষু শরীরের ওপর ডিম পেড়ে নিজেদের গতের্র মুখ বালি দিয় বন্ধ করে ওপরের মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে সমান করে দেয়। সামোকারিড *(Psammocharid)* জাতীয় বোলতার শূককীটের প্রধান খাদ্য হল মাটির নিচের মাকড়সা। মাকড়সার গর্তকেই এরা নিজেদের ডেরা বানিয়ে নেয়। স্ত্রী বোলতা মাকড়সাকে প্রলুব্ধ করে বাইরে আসার জন্য, বাইরে এলেই হুল ফুটিয়ে তার শরীর অসাড় করে দেয়। মাকড়সার নিস্তেজ দেহ গর্তের ভেতর টেনে নিয়ে তাকে চিত করে শুইয়ে পেটের ওপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শূককীট বেরোলে সেই শূককীট ওই নিস্তেজ কিন্তু জীবিত মাকড়সাকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলে।

অনেক প্রজাতির কীটপতঙ্গ মিলিত হবার পরই বাসা বানাবার কাজে উদ্যোগী হয় ও বাসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে। যথেষ্ট খাদ্য সঞ্চিত থাকে এই বাসায়। আর ডিম থাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বাসা বানানো হয় নানা জায়গায়, যেমন মাটিতে, পচা কাদায়, ইঁটের দেওয়ালে, কাদার ঢিপিতে, পাথরে, গাছে, গুঁড়িতে, কোথায় নয়? অস্‌মিয়া *(Osmia)* জাতীয় মৌমাছি বাসা বাঁধে টেলিগ্রাফের খুঁটিতে, পুরানো অব্যবহৃত বইতে, বন্দুকের নলে, অব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বায়ু-চলাচলের নলে, বহু বিচিত্র জায়গায়। অস্‌মিয়া *(Osmia)* প্রজাতির বেশ কিছু মৌমাছি এবং ডিউটেরোজেনিয়া *(Deuterogenia)* প্রজাতির মৌমাছি পুরানো পরিত্যক্ত শামুকের খোলে বাসা বাঁধে। বাসা বাঁধার পর্বে কয়েকটা ভাগ যেমন, স্থান নিবার্চন, মাটি পরিষ্কার, খনন, আবর্জনা সাফাই, দূরদূরান্তর থেকে বাসা বানানোর উপকরণ সংগ্রহ, কুঠুরি বানানো ও গোছানো, বাসার সামনে ছদ্ম আবরণ তৈরি করা, ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রজাতির কলা কৌশল বিভিন্ন রকমের।
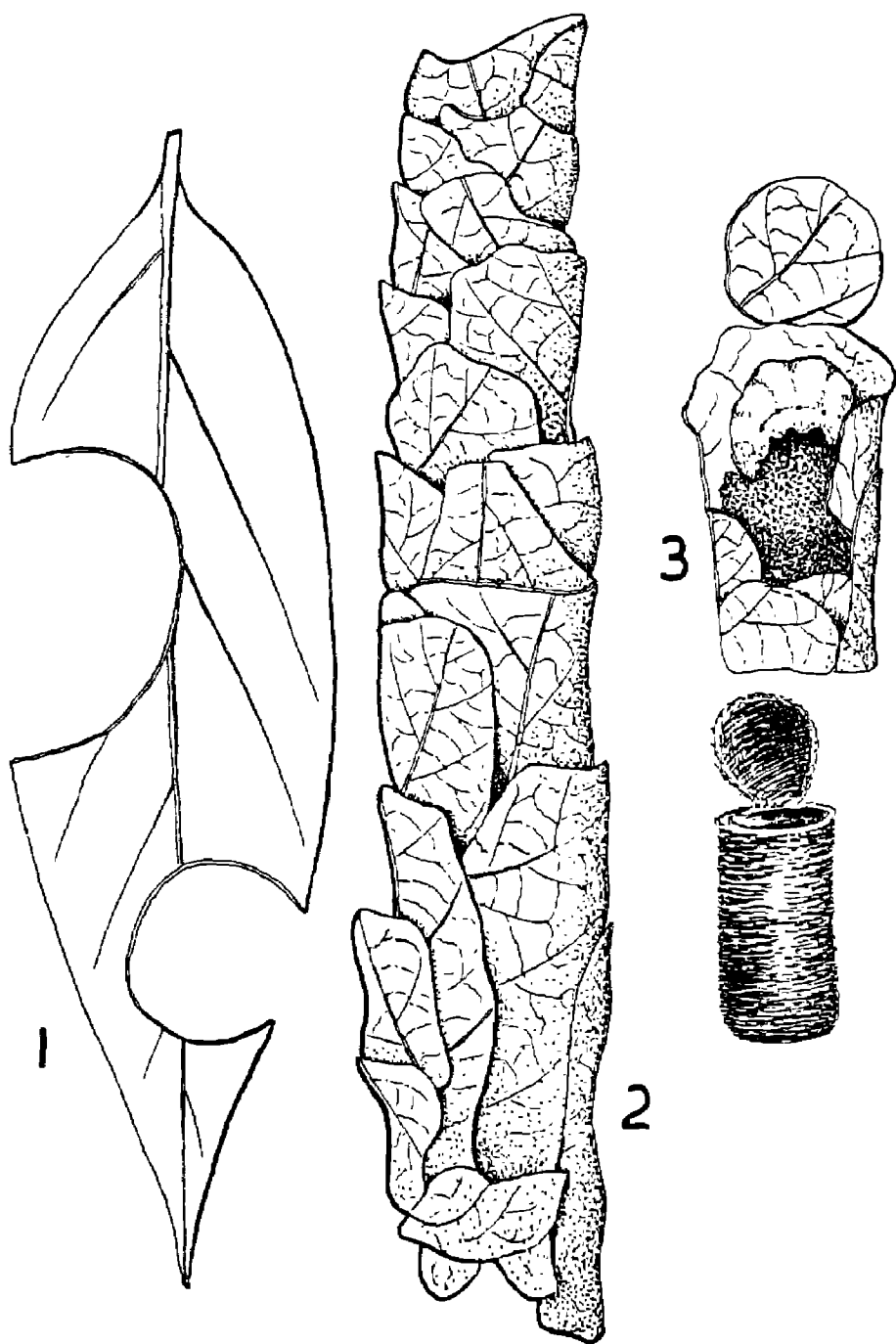
71. লীফ কাটিং বী বা পাতাকাটা মৌমাছির বাড়ি। নিপুণভাবে পাতা কেটে কেটে নির্দিষ্ট নকশায় তৈরী। 1. লাল ছোলাগাছের পাতা কেটেছে; 2. বাইরে থেকে বাসার ছবি; 3. একটি কোষ খুলে দেখানো হয়েছে যাতে পাতার ঢাকনি বোঝা যায়। মৌমাছির শূককীট এই কোষের মধ্যে মায়ের সঞ্চয় করা মধু ও পরাগরেণুর মিশ্রণ খেয়ে খেয়ে বাঁচে।

বেশিরভাগ কীটপতঙ্গই নিজেদের স্বভাব ও কৌশল স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী বদলায়।

মাটি খুঁড়ে বাসা তৈরি : ঝিঁঝিঁপোকা, গুবরেপোকা ও অন্যান্য বেশ কিছু কীটপতঙ্গ মাটি খুঁড়ে বাসা বানায়। ডিম পাড়ার সময় স্ত্রী বাসার বাইরে বের হয় না। বাসার চারদিকে ছোট ছোট কুঠুরি বানায় ডিম রাখার জন্য। ডাং-রোলার জাতের স্ত্রী গুবরেপোকা জিওট্রুপস—*Geotrupes* ও অনথোফ্যাগাস—*Onthophagus)* নিজেকে মাটির প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটার নিচে ঢুকিয়ে দেয় এবং সামনের পা ও শক্ত বুকের সাহায্যে মাটি খুঁড়তে শুরু করে। প্রথমে মাটির ছোট্ট ঢিপি আলগা হয়ে শরীরের তলা দিয়ে মাঝের পা হয়ে শেষের পায়ের দিকে চলে আসে। অবশেষে শরীরের পেছনে চলে যায়। যথেষ্ট পরিমাণে খোঁড়া হলে মাটি খোঁড়া বন্ধ করে পেছনে ঘুরে আলগা মাটি ঠেলতে ঠেলতে ওপরে নিয়ে আসে, আবর্জনা হিসেবে সুড়ঙ্গের সামনের আলগা মাটিকে সমান করে দেয়। এতে গর্তের মুখ হয় নিখুঁত গোল। তারপর পা ও শরীর দিয়ে ঠুকে ঠুকে সব ধার মসৃণ করে। মনের মতো বাসা হলেই নিশ্চিন্ত হয়ে ডিম পাড়ে। স্বচক্ষে দেখলেই এটা বিশ্বাস হবে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া নিরলস পরিশ্রমের ফল। স্ত্রী এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে না বা একটুও বিশ্রাম নেয় না।

বাসা বানানো : বাসা বানাবার জন্য কীটপতঙ্গরা সবচেয়ে আগে উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে। তারপর যাবতীয় উপকরণ নিয়ে গিয়ে সেখানে জমা করে। অনেক সময় উপকরণ মেলে হাতের কাছে। কখনও বা দূরদূরান্তর থেকে তা জোগাড় করে আনতে হয়। কাদামাটির কুঠুরিতে বাস করা বোলতা (স্কেলিফ্রন—*Sceliphron*, রিনকিয়াম—*Rhynchium* ও ইউমেনেস—*Eumenes* প্রজাতি) প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকে কাদামাটির দলা বয়ে নিয়ে আসে। অনেক সময় লালা দিয়ে মাটি ভিজিয়ে তারপর শক্ত ওপরের চোয়াল দিয়ে তা খুঁড়ে দলা সংগ্রহ করে। বাসা বানাবার উপকরণের তালিকার শেষ নেই। যেমন: খাদ্যের কঠিন অপাচ্য অংশের দলা, সবুজ ও শুকনো দুই ধরনের পাতা, চুল, লোম, কাদা মাটি, নুড়ি, খড়িমাটি, মোম, আঠা, রেশমী সুতোর মতো দেহঃনিসৃত রস, কাঠি, গাছের তন্তু, কাঁটা, পাইন গাছের শীষ, সুতো, ও গাছের আঁশ, কত কি? বাসার ভেতরটা সাজাবার জন্য পাতা কেটে তা ব্যবহার করা হয়। কেরাটিনা *(Ceratina)* ও মেগাসিলি *(Megachile)* জাতীয় মৌমাছি পাতা কেটে বাসা বানায়। একেবারে নিখুঁত ও বড় গোলাকার করে গোলাপ পাতা, বোহিনিয়া, লাল-কলাই গাছের পাতা ও অন্যান্য অনেক গাছের পাতা অত্যন্ত দ্রুত কাটতে পারে। পাতার টুকরোগুলো কীটপতঙ্গদের নিজেদের শরীরের থেকে ছয়-সাত গুণ বড় হয়। ওই পাতা নিয়ে উড়ে যায় নিজেদের বাসায়, পাতা ঝুলতে থাকে পায়ের ফাঁকে। বাসার ভেতরের দেওয়াল চার পাঁচটা পাতা দিয়ে প্রথমে ঢেকে দেয়। দুটো কি তিনটে স্তরে পাতা সাজানো হয়। একটার ওপর আর একটা পাতা এমনভাবে লাগানো থাকে যাতে ধারগুলো সুন্দরভাবে ও সমানভাবে একটার ওপর একটা বসে ও চারদিক মোড়ানো
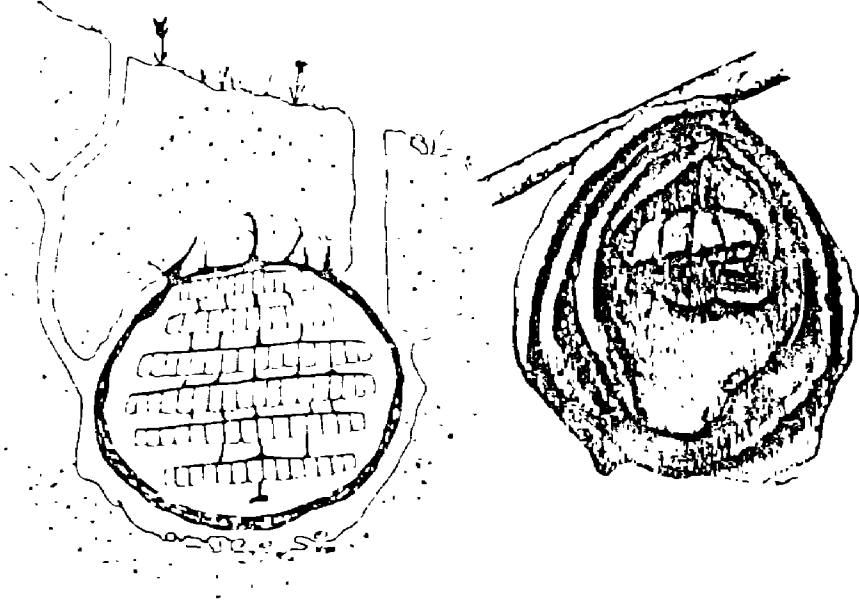
72. বোলতার তৈরী কাগজের বাসা। বাঁদিকে মাটির নীচের প্রকোষ্ঠের নকশা দেখানো হয়েছে। কাগজ দিয়ে বানানো হয়েছে ছয়কোণা প্রকোষ্ঠ, যা সাজানো রয়েছে একটির নীচে একটি, ধাপে ধাপে এবং যাকে বেষ্টন করে রয়েছে অমসৃণ কাগজের মণ্ড। ডানদিকের ছবিতে নতুন বাসা, গাছের ডালে, যার প্রথম কয়েকটি প্রকোষ্ঠ বানিয়েছে রাণী বোলতা, যা ঢাকা আছে চারটি ঢাকনি দিয়ে।

থাকে। একটা করে প্রকোষ্ঠ তৈরি হয় আর মৌমাছি সঙ্গে সঙ্গে তা মধু ও পরাগরেণু দিয়ে ভর্তি করে, তার উপরে একটা করে ডিম পাড়ে। প্রকোষ্ঠ অন্তত আটটা করে পাতা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাতার ঢাকনার ব্যাস আর প্রকোষ্ঠের মুখের ব্যাস সমান। কোষের ঢাকনার ওপর নতুন করে দ্বিতীয় কোষ, তৃতীয় কোষ ও এইভাবে প্রায় বারোটা কোষ বানানো হয়।

সঙ্গীহীন জীবনযাপন করে ট্রাইপক্সিলন *(Trypoxylon)* প্রজাতির বোলতা। এদের বাসা তৈরি হয় নলাকৃতি কাদামাটি দিয়ে। একেকটা বাসা প্রায় দশ সেন্টিমিটার লম্বা ও এক সেন্টিমিটার চওড়া। স্ত্রী বোলতা একদলা কাদামাটি নিয়ে নল তৈরি শুরু করে, ধীরে ধীরে নলের ভেতর ঢুকে যায়, ভেতর থেকে বাইরে দেওয়াল শক্ত করে তৈরি করার জন্য ওই তাল বেলনার আকারে পাকাতে থাকে। নলের চারধারে কাদামাটি সমানভাবে লেপে দেওয়া হয়। নল ক্রমশ লম্বা হতে থাকে। কাজ শেষ হলে বাইরে থেকে এলোমেলোভাবে নরম কাদার তাল লেপে দেওয়া হয় যাতে চট করে বোঝা
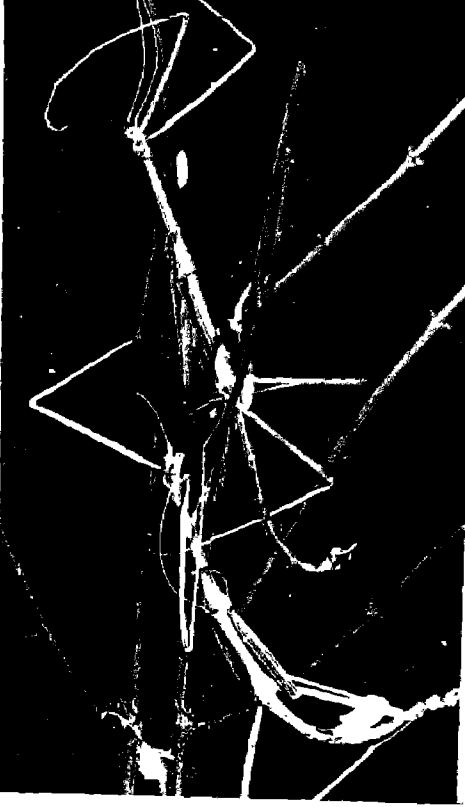
I. A দুটি সাধারণ স্টিক পতঙ্গ। ঝোপে শুকনো কাঠির মধ্যে নিশ্চুপ বসে আছে। B-C প্রেইং ম্যানটিসের দুটি সাধারণ ধাচের ডিম রাখার কোষ, D- সাইকিড মথ ক্ল্যানিয়া ক্রামেরির শুঁয়োপোকা সুরক্ষিত কোষ তৈরী করেছে ছোট ছোট কাঠি আব বাবলা কাঁটা দিয়ে; শুঁয়োপোকা এই কোষের মধ্যেই থাকে আর যেখানে যায়, কোষটিকে বহন করে নিয়ে যায়। শুধু খাবার সময় মাথা বের করে।

II. উইটিবির দুটি ছবি (A, B)। বেশ কয়েক বছরের পুরোনো এই ঢিবি, প্রচুর গাছ গাজয়ে গেছে, একজন মানুষেরও বেশী উঁচু। এটা দক্ষিণ ভারতের অতি সাধারণ দৃশ্য। ঢিবির মাটির নিচের অংশে আছে জটিল নকশার নানা প্রকোষ্ঠ, তাতে রয়েছে হাজার হাজার উইপোকা, এবং তাদের বিভিন্ন অতিথি।

B
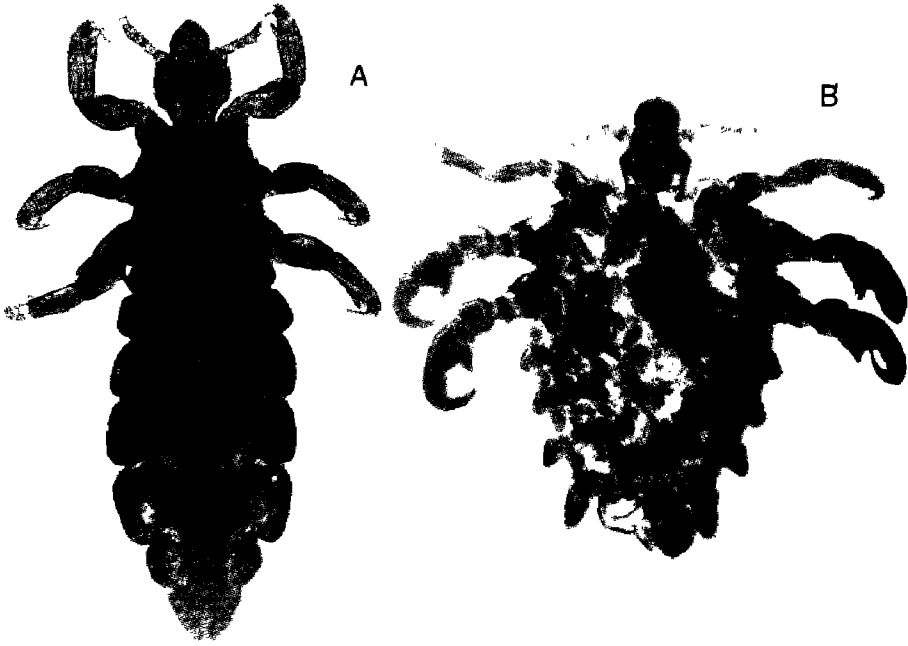
III. মানবদেহে বসবাসকারী সাধারণ উকুনের ফটো-মাইক্রোগ্রাফার
বাঁদিকে : সাধারণ মাথার উকুন *পেডিকিউলাস হিউম্যানাস ক্যাপিটিস।* **ডানদিকে** : যৌনাঙ্গকেশে বসবাসকারী উকুন বা তথাকথিত *ক্র্যাবলাউস ফিথিরাস পিউবিস।* পুরুষের যৌনাঙ্গকেশে এদের বাস। লক্ষণীয়, এদের বাঁকানো শৃঙ্গের মতো নখর, যা দিয়ে এরা আশ্রয়দাতার শরীর আঁকড়ে ঘোরাফেরা করে।

IV. A : ভারতের সাধারণ মাছি *মুসকা নেব্যুলো।* B : *বিনসিয়াম নিটিডুলাম* বোলতার কাদামাটির চাক। চাকভর্তি আঠার গুলি।
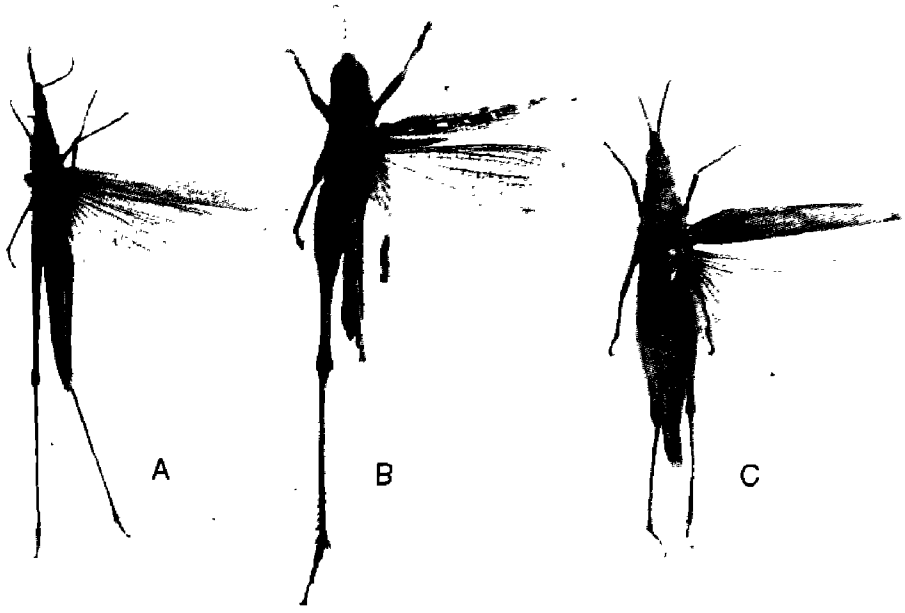
V. **কিছু সাধারণ ঘাসফড়িং**— A : *অ্যাক্রিডা টারিটা;* B : *ক্যাটানটপস ডমিনস;* C : *অ্যাট্রাকটোমরফা ক্রেনুলাটা*
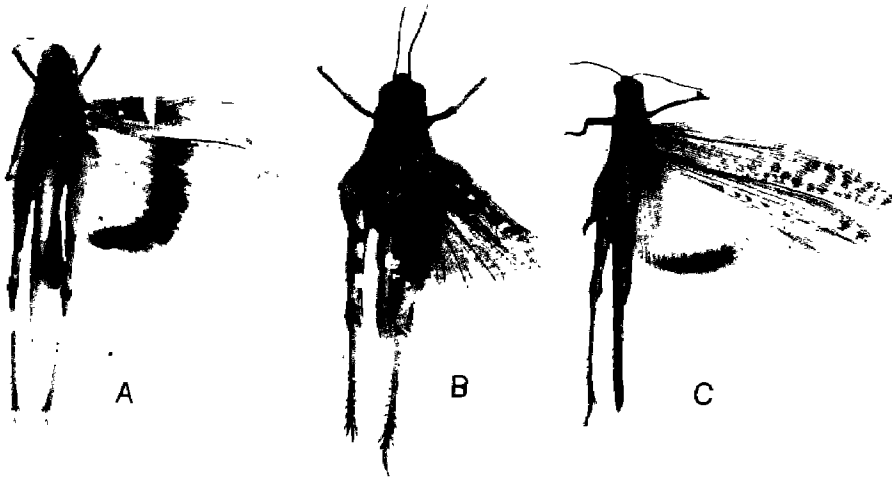
VI. **কিছু সাধারণ ঘাসফড়িং**— A : *গ্যাসট্রিমার্গাস মামোরাটাস;* B : *অর্থাক্যানথাক্রিস ইজিপ্সিয়া;* C : *ক্রিওবোরা ক্রাসা*
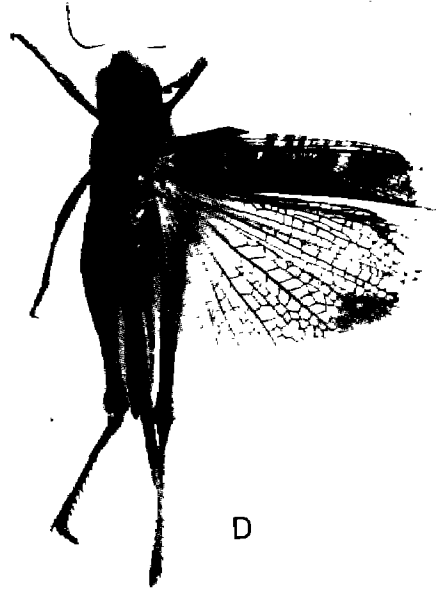
VII. কিছু সাধারণ ঘাসফড়িং— A : *অ্যানাক্রিডিয়াম ফ্ল্যাবেসিয়াম;* B : *এওলোপাস ট্যামুলাস;* C : *ডিটোপটারনিস জেব্রাটা;* D : *জেনোক্যাটনটপস হিউমিলিস*
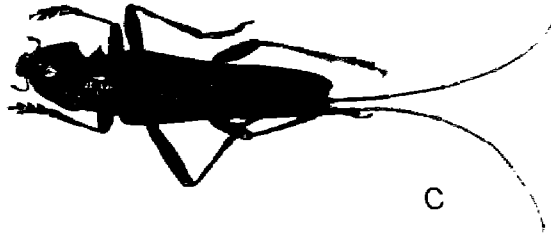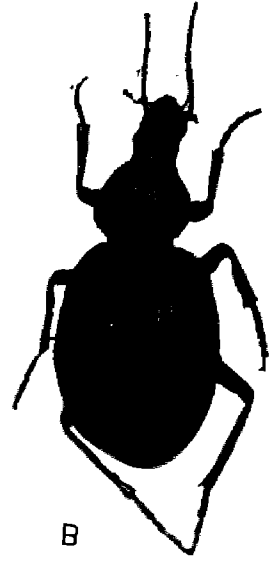
VIII. কিছু সাধারণ বীটল বা গুবরে পোকা। বাঁদিক থেকে: A : *বেমবিডিওন,* একটি ক্যারাবিড; B : আর একটি সাধারণ ক্যারাবিড; C : দুটি লঙ্গিকর্ন সেরামবিসিড বীটল; D : একটি ধাতব সবুজ ক্লিক বীটল *(এলাটোবিড়া)*

IX. সাধারণ [illegible]
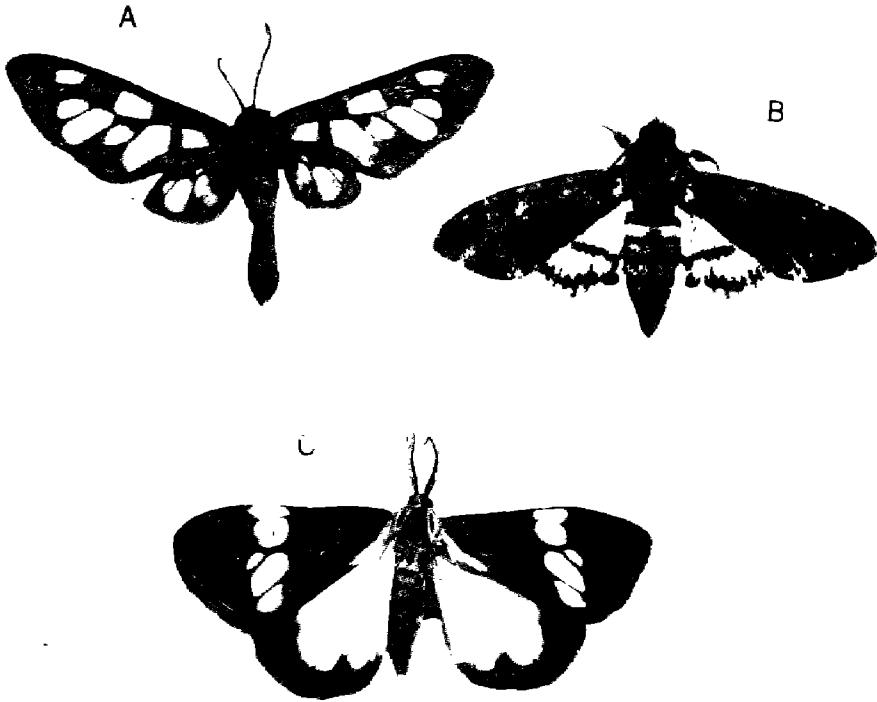
X. **কয়েকটি সাধারণ মথ**— A : সিনটোমিড মথ; B : *একারনমিয়া স্টাইকস*—সাধারণ স্ফিংগিড বা হক মথ। জনপ্রিয় নাম ডেথস্‌হেড মথ; C : *এগীয়েরা ভেন্যলা।* যদিও মথ আপাতদৃষ্টিতে প্রজাপতির মতোই দেখতে, এদের আলাদা করে চেনা যায় বাঁকানো শাখার মতো শুঁড় দেখে।
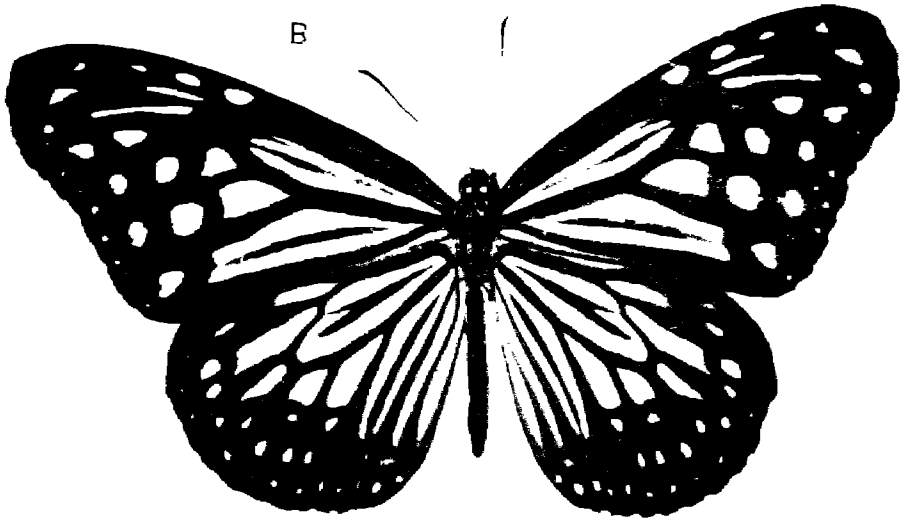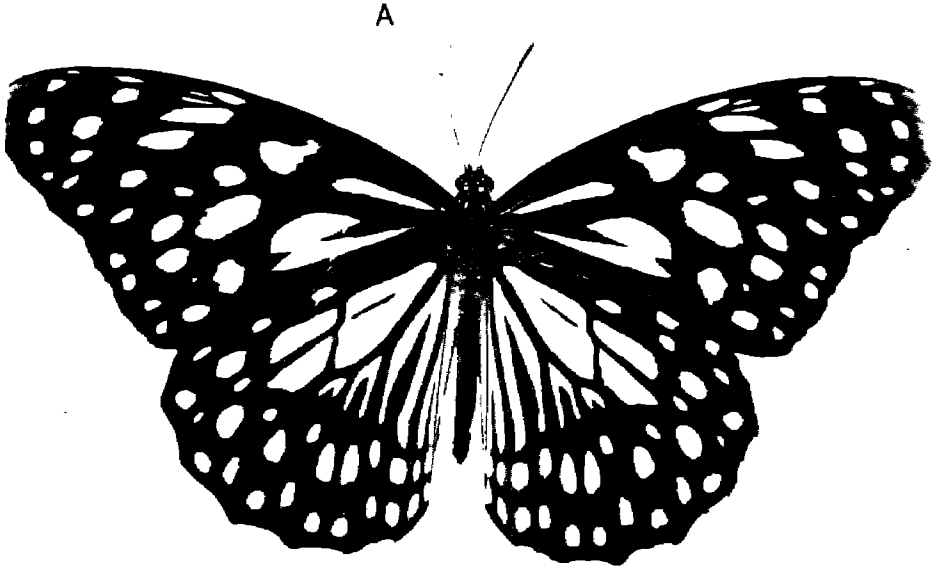
XI. A : *ড্যানায়ুস লিমনিয়েস*; B : *ড্যানায়ুস নীলগিরিয়েনসিস*
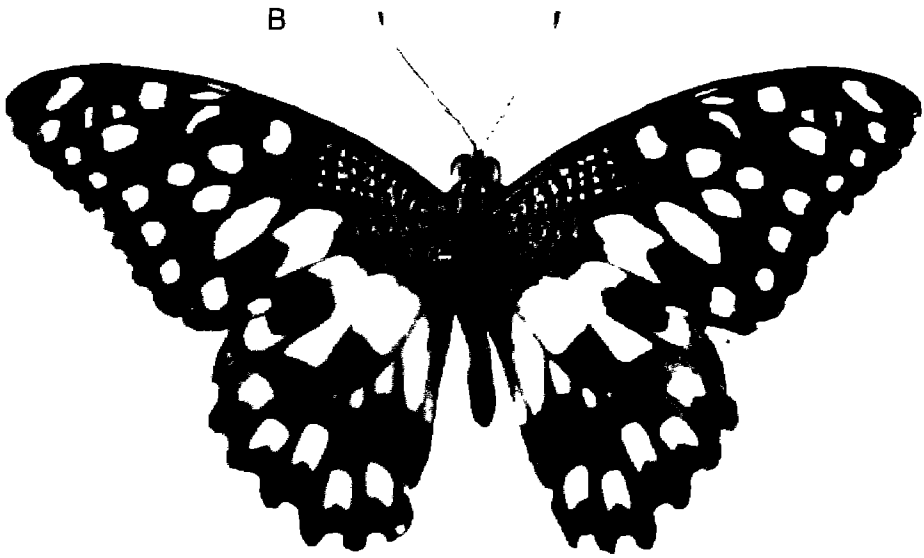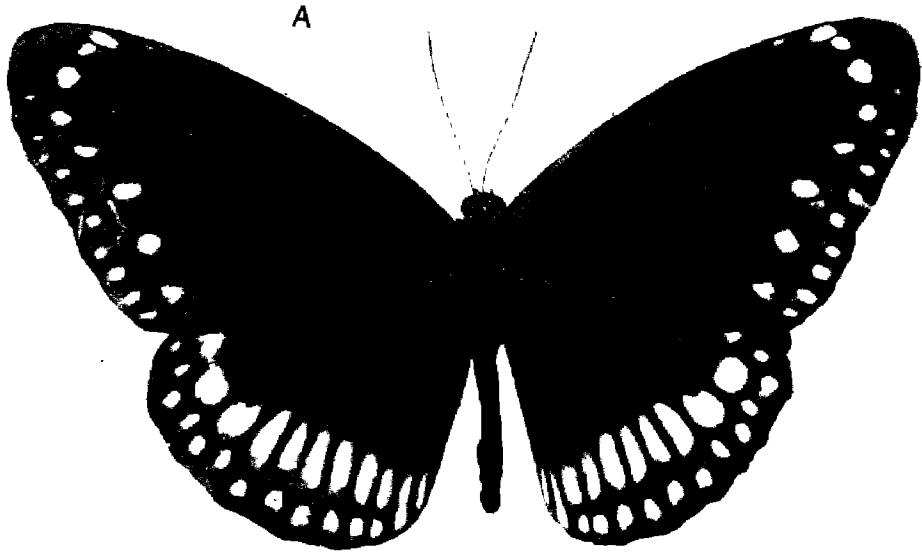
XII. A : *ইউপ্লিয়া কোর কোর;* B : *প্যাপিলিও ডিমোলিয়াস ডিমোলিয়াস*
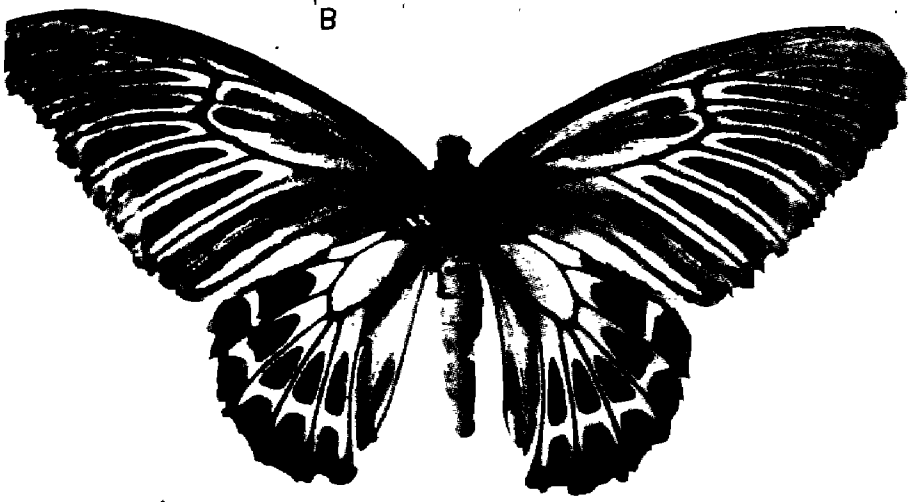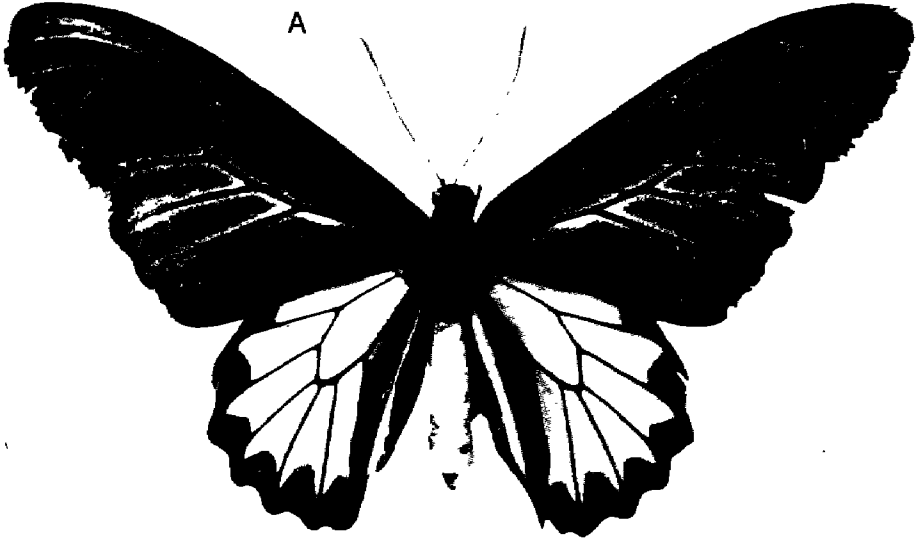
XIII. A : *ট্রয়েডস হেলেনা মেনোস* (পুরুষ); B : স্ত্রী
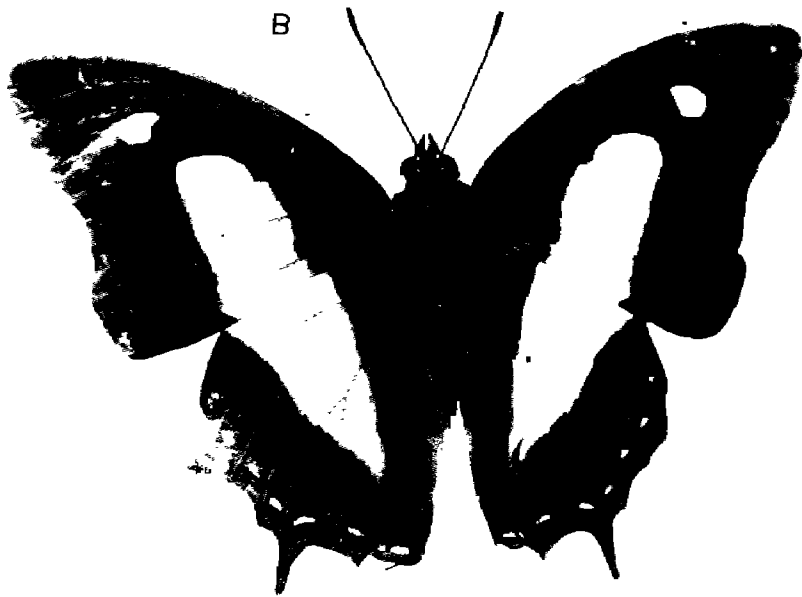
XIV. A : *গ্রাফিয়াম সারপেডন;* B : *এরিবিয়া অ্যাথামাস*
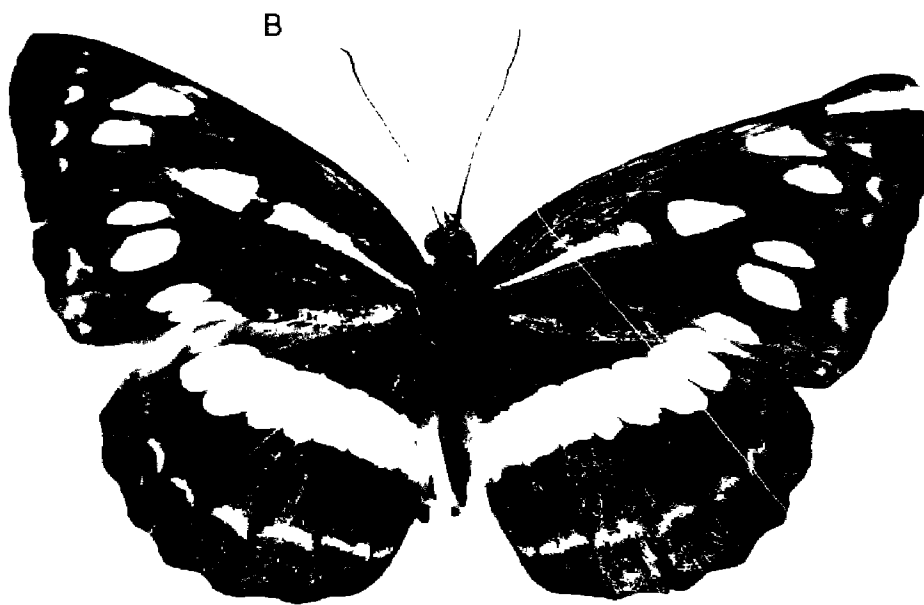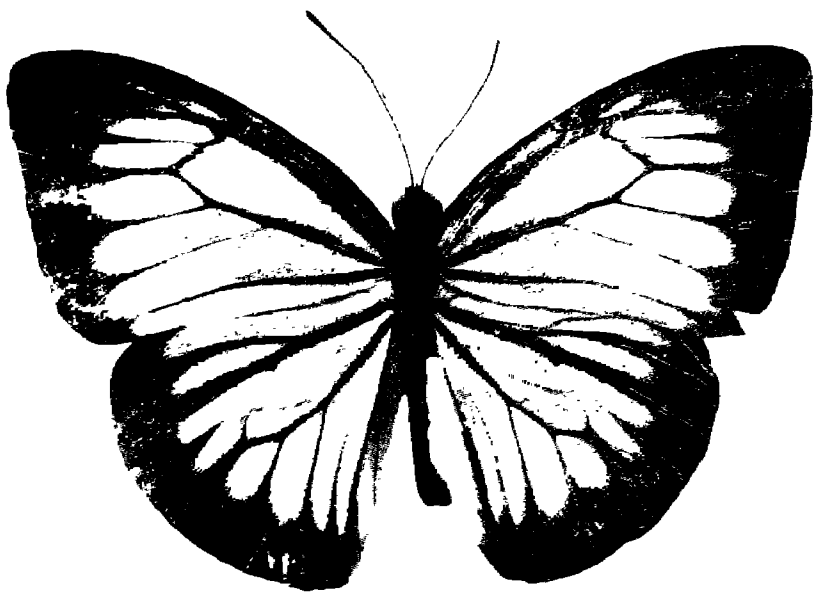
XV. A : ভ্যালেরিয়া ভ্যালেরিয়া: B · নেপটিস হাইলাস
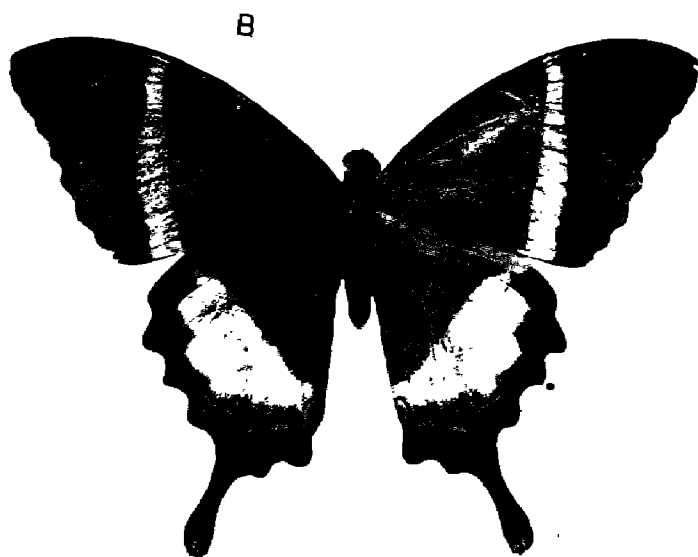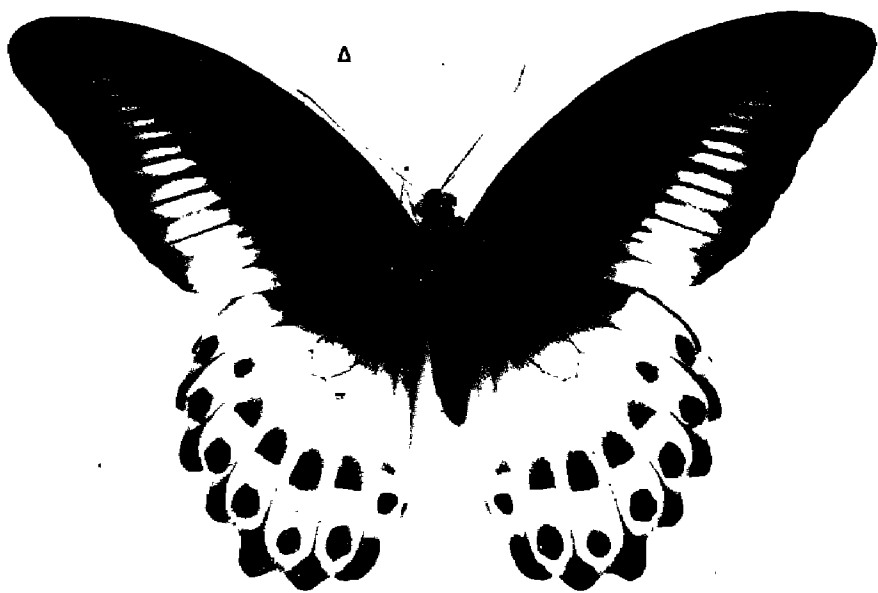
XVI. A : *প্যাপিলিও পলিমেনস্টর পলিমেনস্টর* (পুরুষ); B : *প্যাপিলিও ক্রাইনো*
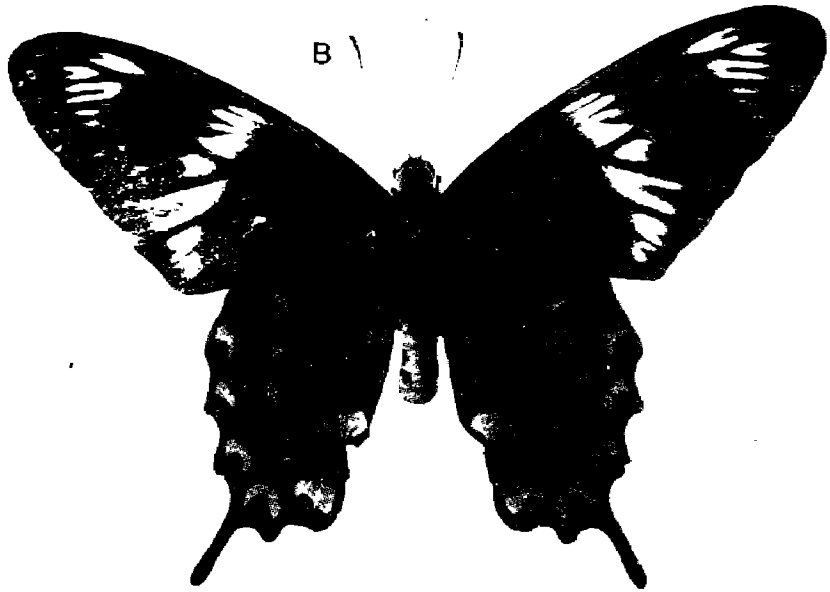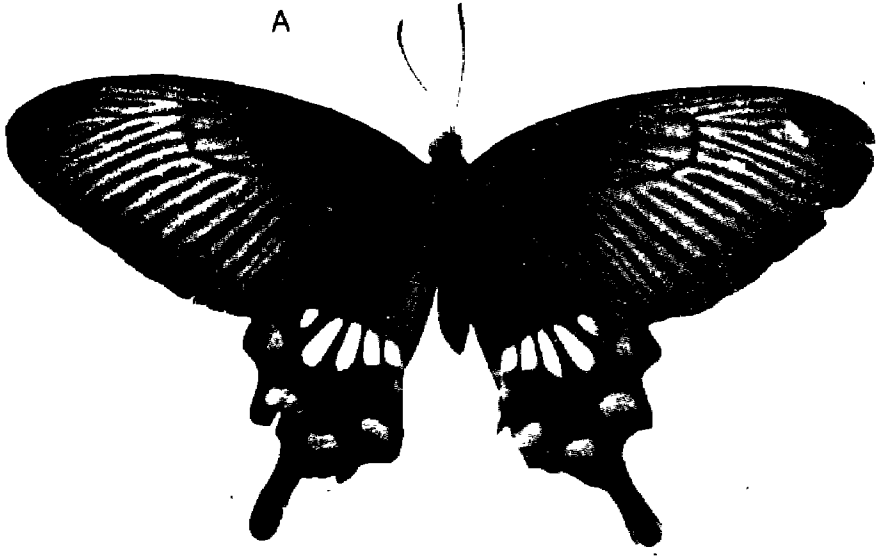
XVII. A : *পলিডোরাস অ্যারিস্টলোশিয়া;* B : *পলিডোরাস হেক্টর*
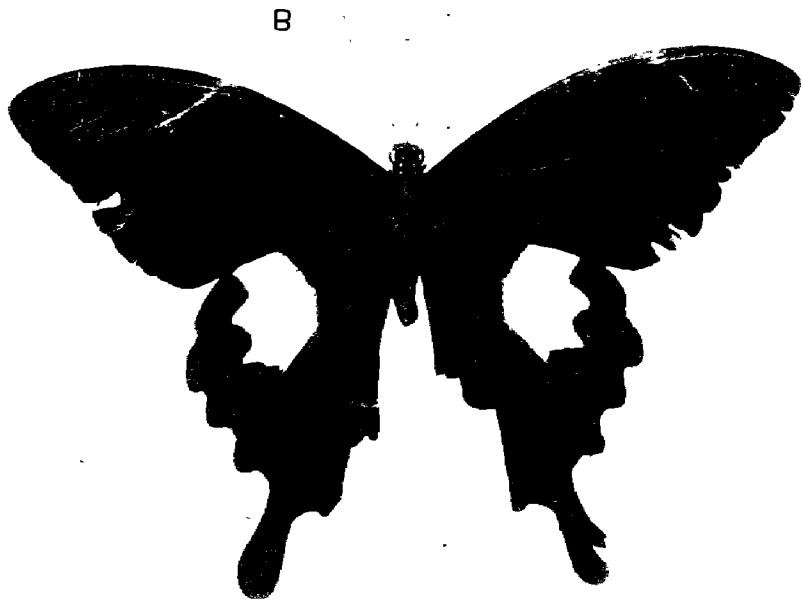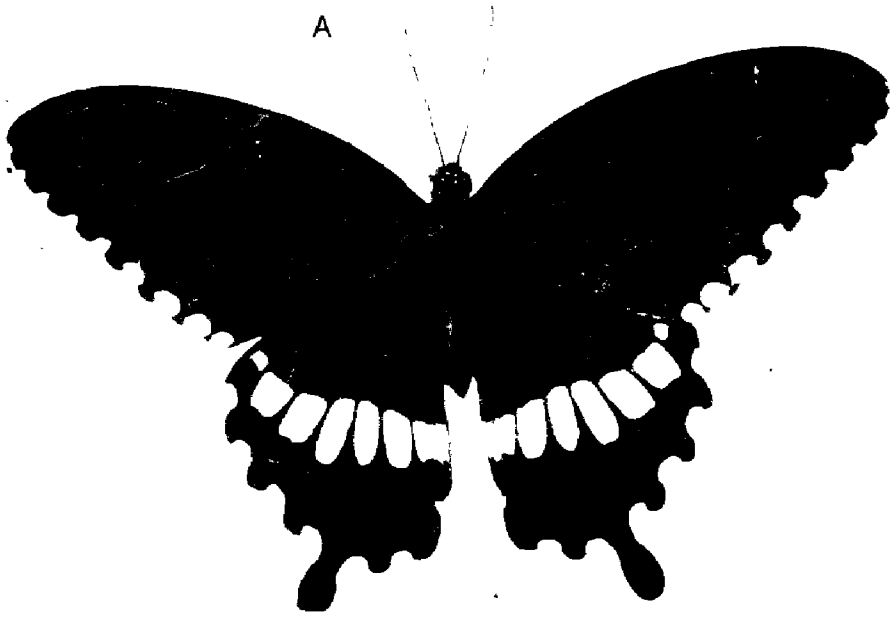
XVIII. A : *প্যাপিলিও পলিটেস রমুলাস;* B : *প্যাপিলিও হেলেনা হেলেনা*

না যায় জিনিসটা কি। ইউমেনেস *(Eumenes)* প্রজাতির রাজমিস্ত্রি বোলতা সম্ভবত ডিমের বাসা বানাবার জন্য ভারতে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। স্ত্রী পতঙ্গ একাধিক প্রকোষ্ঠ বানায়, তাদের আকার মাটির ছোট ছোট কলসীর মতো। ছোট ছোট কাদামাটির ডেলা জড়ো করে বৃত্তাকারে বা বক্ররেখায় সাজায়। বাসা বানাবার স্থান এভাবেই ঠিক হয়। ডেলার পর ডেলা দিয়ে বাঁকানো দেওয়াল গড়া হয়। ধীরে ধীরে তৈরি হয় সুন্দর একটা মাটির ছোট্ট কলসী। কলসীর মুখ গোল। মা বোলতা এবার কলসীর ছাদ থেকে সরু সুতোর মতো জিনিস দিয়ে একটি ডিম ঝুলিয়ে দেয়। তখন শুরু হয় ভাবি শূককীটের খাবারের জন্য সবুজ শুঁয়োপোকা খোঁজা। কলসী খাবার দিয়ে ভর্তি করে মুখটা কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করে দেয়। এবার দ্বিতীয় কলসী গড়ার পালা। কুমোর বোলতা রিনকিয়াম *(Rhynchium)* এইরকম গোটা কুড়ি ডিম্বাকৃতি কলসী গড়ে পাশাপাশি সাজায়। প্রতি কলসীর মুখ একই দিকে থাকে। বাসার গায়ে এবার আঠালো রস মাখানো হয়। মাকড়সা শিকারী স্কেলিফ্রন পাশাপাশি প্রায় এক ডজন কুঠুরি তৈরি করে কাদামাটি দিয়ে। রিনকিয়াম প্রজাতির স্ত্রী প্রতঙ্গ কলসী বানাতে মাত্র ঘণ্টা তিনেক সময় নিলেও তিনদিন ধরে কলসীর গায়ে চটচটে আঠার গুলি লাগায়। প্রত্যেক দিন সকালে সে গাছের গা থেকে চটচটে ঘন আঠা সংগ্রহ করে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই আঠা বাসার গায়ে লাগায়। আঠা জমা করা ও বাসায় লাগানো অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ ও বিরক্তিকর কাজ। কিন্তু স্ত্রীপতঙ্গ বিরক্ত তো হয়ই না, বিশ্রামও নেয় না। সমানভাবে আঠা লাগানো ছাড়াও ছাড়া ছাড়া ভাবে বড় বড় আঠার গুলি বাসার গায়ে লাগানো থাকে যাতে শত্রুপক্ষ সতর্ক হবার আগেই ফাঁদে পা দেয়। একবার আঠার ওপর বসলেই বন্দীদশা! এক বিন্দু আঠাও কিন্তু কলসীর ভেতরে
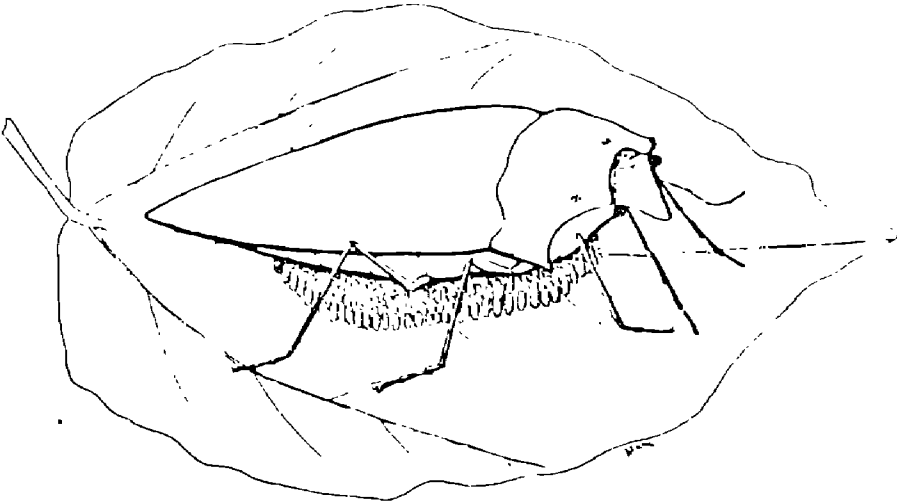
73. স্ত্রী পেন্টাটমিড বাগ *ক্যান্টাও অসিলেটা*। পাতার উপর রাখা ডিমের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে।
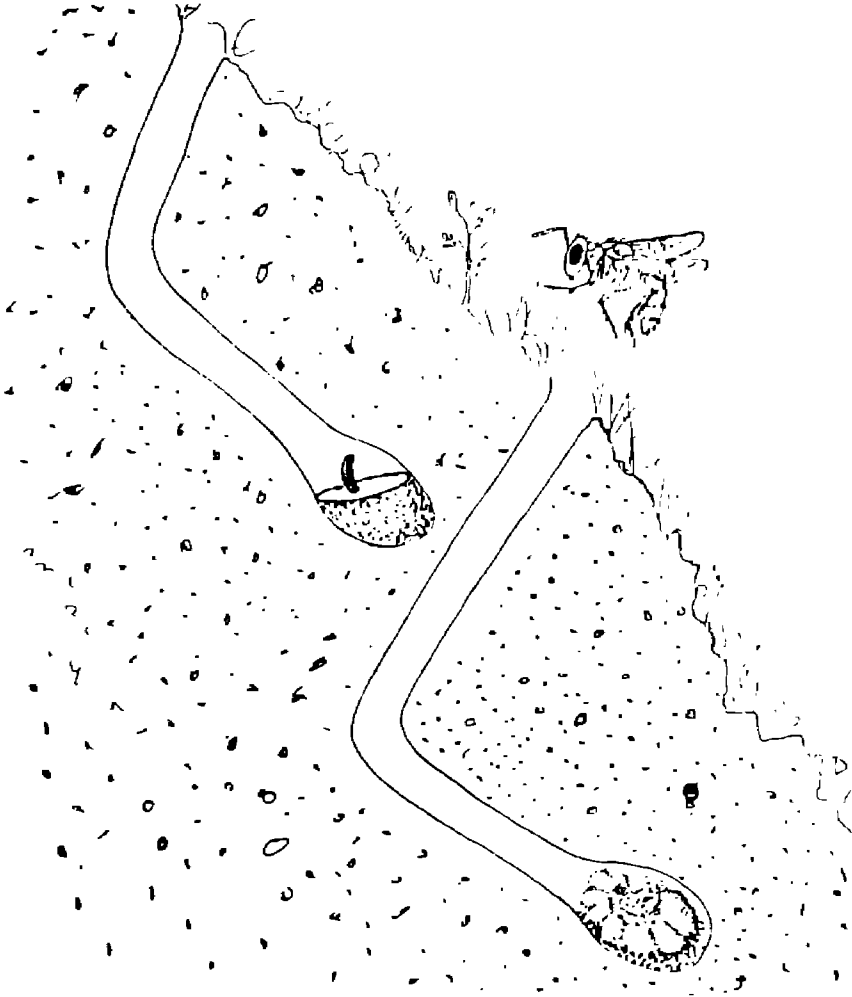
74. মাটিতে বসবাসকারী সলিটারী বী-র দুটি ডিম্ব প্রকোষ্ঠ, যা মাটির নীচে কাদামাটির চূড়ার ওপর তৈরী। প্রবেশ পথের নীচের দিকে আছে অনেকটা বেঁকে যাওয়া সুড়ঙ্গ। সেটা মিশে গেছে বিরাট ডিম্বাকৃতি প্রকোষ্ঠে। এই প্রকোষ্ঠ ভরা আছে মধু ও শূককীটে।

যায় না—শুধু ওপরের স্তরে (বাইরে) লাগানো থাকে। আঠা শুকিয়ে শক্ত হতে সময় লাগে অনেক দিন—কয়েক সপ্তাহ এমন কি কয়েক মাসও। ফলে যেসব পরজীবী কলসীর ভেতর ঢোকার চেষ্টা করে তাদের মরণ ফাঁদ হিসেবে এই আঠা অত্যন্ত উপযোগী।

কিন্তু কি করে এত সুন্দর ও সুষম নকশায় বাসা তৈরি হয়? কি করেই বা স্ত্রী পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে এত বড় শিল্পী? প্রকৃতিবিদ্‌দের মতে বাসা বানাবার এই ক্ষমতা জন্মগত। স্ত্রীরা যে নিজেদের দৈর্ঘ্য দিয়ে বাসা বানাবার সময় প্রয়োজনীয় উচ্চতা ও শুঁড় দিয়ে বাসার ব্যাস মাপে, সে বিষয়ে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাসা বানাবার শুরু থেকেই সমস্ত বিষয়ে এদের ধারণা স্বচ্ছ। কাদামাটির কুঠুরি বানানোর আগে নিচের ভিত তৈরি করে। শরীর কুঠুরির মধ্যে সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে এরা দেখে নেয়

বাসা মাপসই হল কিনা। যখন শুঁড়ের আগা বাসার মেঝে ও পেটের শেষভাগ বাসার ছাদ স্পর্শ করে, তখন এরা বোঝে যে সঠিক মাপের বাসা বানানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই তারা বন্ধ করে দেয় বাসার আকার বাড়ানো। অদ্ভুত আকর্ষণীয়ভাবে সমান তালে ও ছন্দে বাসা বানানোর কাজ চলে। শরীর ডাইনে বাঁয়ে দুলিয়ে স্ত্রী প্রথমে একদিকে ও পরে অন্যদিকে পর্যায়ক্রমে কাদামাটির প্রলেপ লাগায়। বাইরের দেওয়ালের গঠনকার্য চলে প্রথম। যখন দেওয়াল বেঁকে শামুকের আকার নেয় তখন সে বাসার ভেতরে ঢুকে ভেতরের দেওয়ালের কাজ চালায়। স্ত্রীরা নিজেদের শরীরের মাপে বাসা বানায় কারণ স্বাভাবিকভাবেই তাদের জানা থাকে বাচ্চারা সব সময়ই মায়ের চেয়ে আকারে ছোট।

শিশুর জন্য খাদ্য সঞ্চয়

কীটপতঙ্গরা ডিম ও ভবিষ্যৎ শূককীটের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ছাড়াও সদ্যোজাত শূককীটের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যও সঞ্চয় করে। এই শূককীট অত্যন্ত অসহায়, খাদ্যসংগ্রহে বেরোতে অক্ষম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু যেখান থেকেই হোক বা যেভাবেই হোক সন্তানের জন্য মা সঞ্চয় করছে। অনেক কীটপতঙ্গ আবার বুদ্ধি খাটিয়ে ও পরিশ্রম বাঁচিয়ে কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। হিউম্যান বটফ্লাইয়ের শূককীট মানুষ ও অন্যান্য উষ্ণরক্তের প্রাণীদের আক্রমণ করে, কিন্তু এদের স্ত্রীরা কখনই তাদের শরীরে ডিম পাড়ে না। এরা স্ত্রী মশাকে আটকে রাখে, তার শরীরে ত্রিশ-চল্লিশটি ডিম পেড়ে ছেড়ে দেয়। যখন স্ত্রী মশা মানুষ বা অন্য প্রাণীর শরীরে বসে, তখন তাদের শরীরের বর্দ্ধিত তাপমাত্রায় ডিমগুলি ফুটে শূককীট বেরিয়ে আসে এবং স্ত্রীমশা সৃষ্ট ক্ষত দিয়েই ভক্ষ্য প্রাণীর শরীরে আশ্রয় নেয়। মিলটোগ্রামা *(Miltogramma)* প্রজাতির মাছির শূককীটের খাদ্য হল পূর্ণাঙ্গ মাছি। স্ত্রী মিলটোগ্রামা নিজে এই খাদ্য সংগ্রহ করে না, সংগ্রহ করে বেমবেক্স *(Bembex)* জাতীয় বোলতা যারা মটিতে গর্ত করে বাসা বানায়। প্রখর বুদ্ধি স্ত্রী মিলটোগ্রামা দূর থেকে দেখে তার সবচেয়ে বড় শত্রু স্ত্রী বেমবেক্স কষ্ট করে বাসা বানিয়েছে, খাদ্য হিসেবে সংগ্রহ করছে প্রথম মাছি। যে মুহূর্তে স্ত্রী বেমবেক্স পেছনের পায়ে অবশ মাছিকে আঁকড়ে ধরে মাথা সুড়ঙ্গে ঢুকিয়ে দেয়, অমনি স্ত্রী মিলটোগ্রামা বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে নিজের ডিম বা সদ্যোজাত শূককীট ওই মাছির দেহের ওপর রেখে ছুটে পালিয়ে যায়। স্ত্রী বেমবেক্স বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে ওই ডিম বা শূককীট সমেত মাছিকে নিজের ডেরায় নিয়ে যায়। স্ত্রী মিলটোগ্রামা এইভাবে ভয়ঙ্কর শত্রুকে কাজে লাগিয়ে নিজের শিশুদের বাঁচিয়ে রাখে। কি দুঃসাহস!

সন্তানের জন্য খাবার খোঁজা, পছন্দসই খাবার জোগাড় করা, তা নিয়ে আসা, জমা করা সবই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সঞ্চিত খাদ্য হরেক রকমের। যেমন টাটকা সবজি, ছত্রাক, পচা সবজি, বহু তৃণভোজী প্রাণীর বিষ্ঠা, পরাগরেণু, মধু, প্রাণীর গলিত মাংস, সদ্য মৃত বা অর্ধমৃত অসাড় কীটপতঙ্গ, মাকড়সা ইত্যাদি ছোটখাটো প্রাণী,

75. খননকারী বোলতা বা ডিগার ওয়াস্পের ডিম্বপ্রকোষ্ঠ—এগুলি রয়েছে ঝুলে থাকা কাদামাটির তালে। প্রবেশপথ নীচের দিকে বাঁকানো। চিমনির মতো কাদামাটি দিয়ে তৈরী নল। এমনভাবে তৈরী বর্ষা ও শত্রুরা তাদের নাগালই পাবে না। এই নল বাইরের দিকে বেরিয়ে রয়েছে স্থায়ীভাবে। নীচে দেখানো হয়েছে বাসার অংশচিত্র, যাতে আছে একাধিক ডিম্ব প্রকোষ্ঠ; তাতে খাদ্য ও ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা শূককীট। প্রতিটি কোষ আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করা আর প্রতিটির সঙ্গে মূল প্রবেশ পথের রয়েছে যোগ।

সঙ্গীহীন ও দলবদ্ধ বোলতাদের খাদ্য নানা ধরনের মাকড়সা, ফড়িং, ঝিঁঝি পোকা, আরশোলা, গুবরেপোকার শূককীট ও গুটি, শুঁয়োপোকা, মাছি, ছারপোকা, ক্যাডিসফ্লাইয়ের শূককীট, মধুপায়ী মৌমাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ। স্কেলিফ্রন *(Sceliphron)* প্রজাতির বিশেষ প্রিয় খাদ্য বড় বড় মাটিতে বাস করা মাকড়সা; নটোজেনিয়া

(Notogenia) প্রজাতির প্রিয় খাদ্য ফড়িং; এবং অ্যামপুলেক্স *(Ampulex)* প্রজাতির পছন্দ আরশোলা।

প্রসব ও পরিচর্যা

শুধুমাত্র গোষ্ঠীবদ্ধ প্রজাতিতেই নয়, সঙ্গীহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত বহু কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে মা ডিম পেড়ে সেখানেই থাকে, ডিমে তা দেয়, ফুটে বেরোনো শূককীটের পরিচর্যা করে, পরিষ্কার রাখে। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে এবং নিজে খাবার খাওয়ায়। পারিবারিক টান সন্তান পূর্ণাকৃতি পাওয়া পর্যন্ত থাকে; অনেক ক্ষেত্রে অনেক প্রসূতি কীট বা পতঙ্গ ডিম পেড়ে অবসর নেয় না, তাদের পাশে বসে থাকে এবং যেখানে যেখানে যায় তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যায়। সাধারণ পেন্টাটমিড *(Pentatomid)* প্রজাতির ছারপোকা গাছের পাতায় ও ডালে প্রচুর ডিম পাড়ে এবং শত্রুপক্ষের ওপর নজর রাখার জন্য পাশে থেকে কড়া পাহারা দেয়। ক্যান্টাও ওসেল্যাটাস *(Cantao ocellatus)* ও টেক্টাকরিস *(Tectacoris)* প্রজাতির ছারপোকা ডিমের ওপর বসে থেকে তাকে শত্রুর চোখের আড়ালে রাখে। ডিম ফুটে শূককীট বেরোনোর পর যখন তারা খাদ্যের সন্ধানে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে তখনই মায়েরা নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে যায়। মায়েরা অনেক সময় শূককীটের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ক্রাইসোমেলিড বীটল ফাইটোডেক্টা *(Phytodecta)* প্রজাতিরা পাতার ওপর একসঙ্গে প্রায় পঞ্চাশটি ডিম পেড়ে পাহারা দেয়। ডিম ফুটে শূককীট হলে মায়ের পরিচর্যায় তারা একসঙ্গে বড় হয়, একসঙ্গে খাবার খায়। মা নিজের খাবার জোগাড় করবার জন্য বাচ্চাদের ছেড়ে বেশিদূর যায় না। অনেক সময় এমনও হয়, অন্য স্ত্রীপতঙ্গের বাচ্চাদেরও সে লালন করছে, সকলকেই সে সমান যত্ন করছে, আত্মপর ভেদ নেই।

অনেক ক্ষেত্রে মা নিজে যেখানে যায় সেখানে ডিম বহন করে নিয়ে যায়। আরশোলার মধ্যে এই মাতৃস্নেহ লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতে এক ধরনের আরশোলা আছে যারা জরায়ুজ। অর্থাৎ মা ডিম না পেড়ে একেবারে ছোট ছোট শিশুর জন্ম দেয়। জন্মানো মাত্রই এরা মায়ের পিঠে চড়ে ডানার নিচে লুকিয়ে থাকে। এক-দুবার খোলস ছাড়ার পর এরা সাবালক হয়, খাদ্য সংগ্রহ করায় আর আত্মরক্ষায় পটুতা আসে। তখনই এরা মায়ের আওতা থেকে বেরিয়ে আসে। সাধারণ ঝিঁঝিঁপোকা (*Gryllotalpa)* মাটির নিচে বিশেষ ধরণের বাচ্চাদের ঘর তৈরি করে সেখানেই ডিম পাড়ে। প্রাণ দিয়ে ডিম আগলে রাখে, একটা একটা করে ডিম তুলে পরম মমতায় তাদের চেটে পরিষ্কার করে, শুঁড় দিয়ে আদর করে নাড়াচড়া করে ও আবার ঠিকঠাক জায়গায় রেখে দেয় যতদিন না সমস্ত ডিম ফুটে শূককীট বের হয়। সদ্যোজাত শূককীট একসঙ্গে জড়াজড়ি করে মায়ের পেটের নিচে থাকে, মুরগীর বাচ্চা যেমন মুরগীর ডানার তলায় থাকে। খিদে পেলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে গিয়ে সঞ্চিত খাদ্য খায়, ফিরে এসে আবার মায়ের পেটের তলায় ঢুকে যায়। কেওড়া জাতীয় কীট নতুন করে গর্ত খোঁড়ে বা নিজের বাসাকেই আরও বড় করে নেয় ডিম রাখার জন্য। ডিমের জায়গা বানানো শুরু হবার সময় থেকেই স্ত্রীকীট
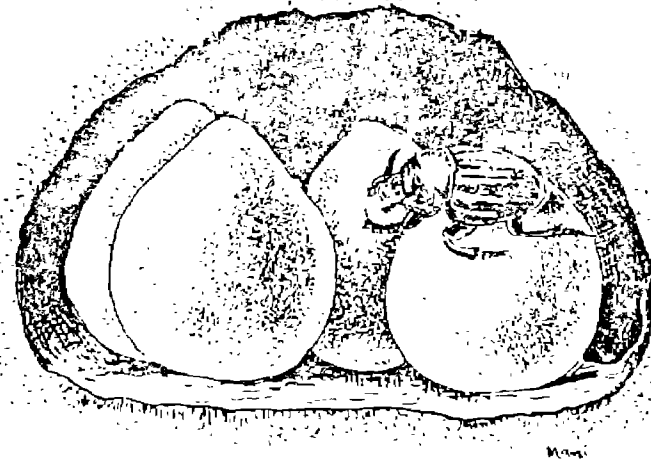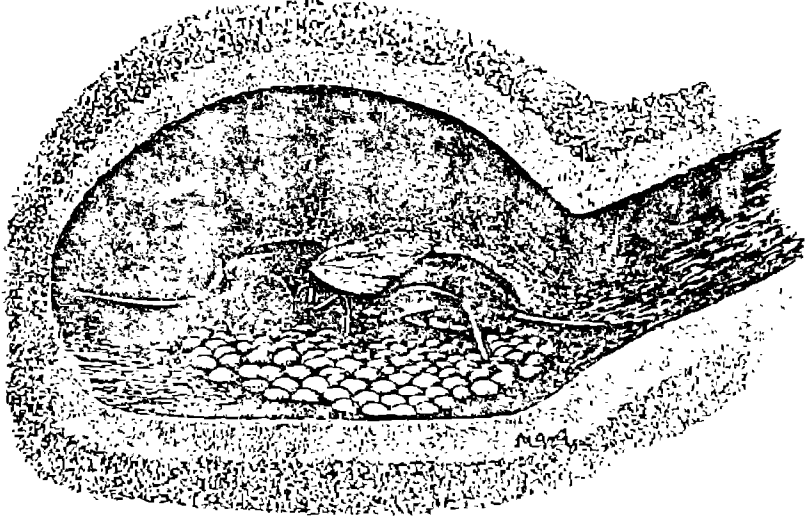
76. দুটি মা পতঙ্গ তাদের অমূল্য ধন ডিম নিয়ে। ওপরের ছবিটি আমাদের অতি পরিচিত ঝিঁঝিপোকার, *গ্রাইলোটালপার*। ডিম্ব প্রকোষ্ঠে সে ডিম নিয়ে পরিচর্যারত। নীচের ছবিটি ডাং রোলার বীটলের, ডাং বল বা মলের গুলির ওপরে সে সযত্নে ডিম পেড়ে রেখেছে। যতদিন না ডিম ফুটে শূককীট বেরোবে, ততদিন সে বাসা ছেড়ে নড়বে না।

অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়ে ওঠে ও ডিম পাড়ামাত্র পুরুষসঙ্গীকে বাড়ির চৌহাদ্দি মাড়াতে দেয় না। পুরুষ এই বিচ্ছেদ সহ্য করতে বাধ্য হয়। স্ত্রী জানে পুরুষসঙ্গী সুযোগ পাওয়া মাত্র ডিম বা শূককীট উদরস্থ করবে। সুতরাং আন্তরিক বিদায়-সম্ভাষণ তো দূরের কথা বলতে গেলে প্রায় গলাধাক্কা খেয়ে পুরুষসঙ্গীকে বেরিয়ে আসতে হয়। মা এইবার ডিমের সামনে বসে সতর্ক পাহারা দেয়, তা দেয়, মাঝে মাঝে তাদের চেটে জীবাণু মুক্ত করে। ঠিকমতো চেটে পরিষ্কার না করলে ডিম ফুটে শূককীট বেরোয় না। সামান্যতম বিপদের

আশঙ্কা দেখা গেলে মা তাড়াতাড়ি ডিম অন্যত্র নিরাপদস্থানে নিয়ে যায়। সদ্যোজাত শূককীট দলবদ্ধ অবস্থায় মায়ের কাছাকাছি থাকে, কোনো শূককীট এদিক ওদিক চলে গেলে মা সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুখে করে নিয়ে আসে এবং অন্যদের কাছাকাছি রাখে। প্রথম কিছুদিন শিশু শূককীট মায়ের পিছুপিছু খাবারের সন্ধানে যায়। তারা যখন যথেষ্ট সাবালক হয় এবং নিজেদের রক্ষা করতে পারে, তখন দেখা যায় অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে দুর্বল হয়ে মা মারা গেছে। মায়ের জীবন সন্তানের জন্যই উৎসর্গীকৃত।

এও দেখা যায়, মা নিজে বাচ্চাদের খাইয়ে দিচ্ছে। প্রকৃষ্ট উদাহরণ সেক্সটন জাতীয় গুবরেপোকা, নেক্রোফোরাস *(Necrophorus)* প্রজাতির। স্ত্রী পোকা পাখি, ইঁদুর ইত্যাদি জীবের মৃতদেহ পুতে রাখে। প্রথমে এরা মৃতদেহ খুঁজে বের করে, পরে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে মৃতদেহ কবর দেয়। প্রথমে সামনের পা দিয়ে মাটি খোড়া শুরু হয়। সামনের পা সেই মাটি মাঝের পায়ে ঠেলে দেয়. এবং শেষে পেছনের পায়ের কাছে আসে, পেছনের পা দিয়ে ধীরে ধীরে মাটি সরিয়ে গর্ত বড় করা হলে মৃতদেহ নামিয়ে দেওয়া হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা এক মুহূর্ত বিশ্রাম না নিয়ে কাদামাটি, ধূলোবালি ও মৃতদেহ থেকে লোম ও পালক পরিষ্কার করে দেহ কবরস্থ করে। মূল কবরের আশেপাশে ছোটছোট গর্ত খুঁড়ে ডিম পেড়ে রাখে। ডিম ফুটে শূককীট বেরোবার ও শূককীট পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগে পর্যন্ত মা একবারও গর্ত ছেড়ে বেরোয় না। ডিম পাড়বার পর মা গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। ডিম ফুটে শূককীট বেরোনো মাত্র মা চলে যায় পচনধরা মাংসের কাছে ও খাওয়া শুরু করে। তবে পেট ভরে খায় না, বাচ্চাদের জন্য কিছু রাখে। বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন নিজে ততটুকুই খায়। এবার শিশু শূককীট নিজেদের আস্তানা ছেড়ে খাবার জায়গায় চলে আসে এবং মায়ের চারধারে জমা হয়। আশ্চর্য এক ব্যাপার ঘটে এরপর। একটা একটা করে শূককীট মায়ের মুখের নিচে চলে আসে ও অপেক্ষা করে—তাদের নিজেদের মুখ থাকে মায়ের দুই চোয়ালের মধ্যে। মায়ের চোয়ালজোড়া পুরোপুরি খোলা থাকে। অর্ধপাচা মাংসের রস চকচকে বাদামী ফোঁটার মত ক্ষুধার্ত শূককীটের মুখের ভেতরে গিয়ে পড়ে। নিজে প্রথমে খাদ্য গ্রহণ করে মা তাই উগরে দেয় বাচ্চাদের মুখে। এমনকি খাবার সময় হলে পায়ে পা ঘটে খসখস শব্দ করে মা বাচ্চাদের জানান দেয়।

পিতার ভূমিকা

সন্তান পালনে মায়ের ভূমিকা সবসময় বড় নয়। পিতারও ভূমিকা আছে। সেও বাচ্চাদের দেখাশোনা করে, ডিম পাহারা দেয়। অন্যান্য কাজেও মাকে সাহায্য করে। কখনোও দেখা যায় বাবা একাই কাজ করছে। বিনিময়ে স্ত্রীর কাছ থেকে সাহায্য তো দূরের কথা উৎসাহও পায় না। আবার কখনও সে অনিচ্ছাভরে যেটুকু সাহায্য না করলে নয় সেটুকু করে এবং স্ত্রীও কাজ শেষ হলে মানে মানে সঙ্গীকে বিদায় করে দেয়। অনিচ্ছায় কাজ করে পুরুষ। ঘ্যান ঘ্যান করে সর্বদা। কার্যত 'পতিদেবতা'কে
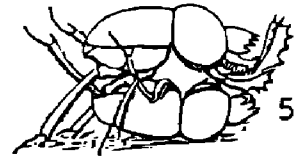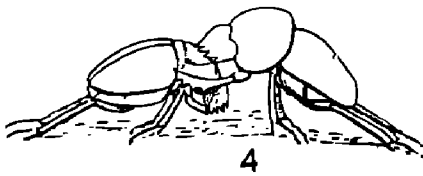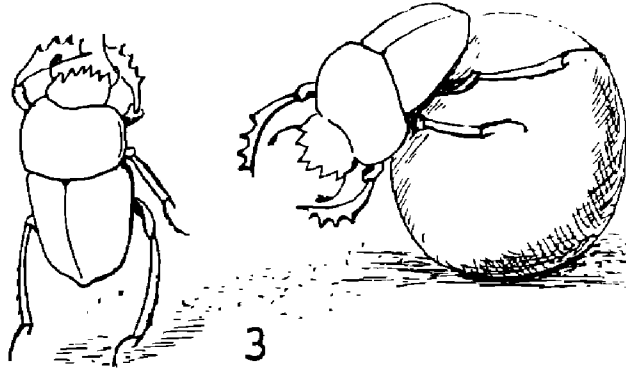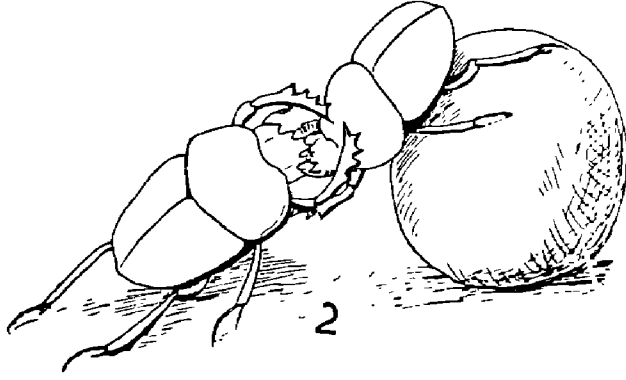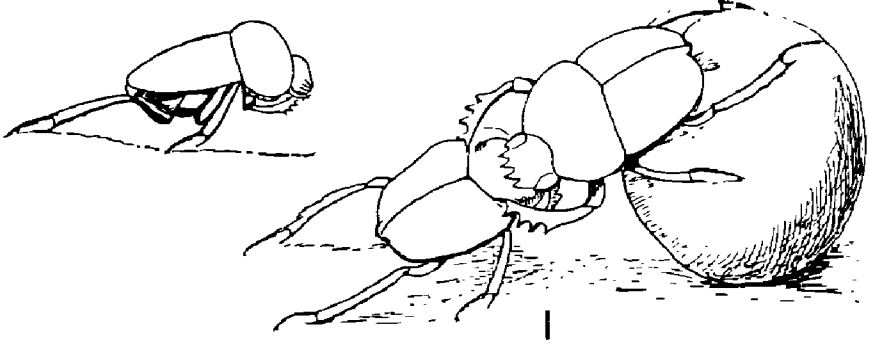
77. পুরুষ ডাং রোলার বীটল মলের বলকে ডিম্ব প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাবে, এবং কে গর্ত খুঁড়বে তা ঠিক করতে নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে।

দিয়ে ঘরের কাজ ও বাচ্চাদের দেখভাল করিয়ে নেয় যাতে মা নিজে বাইরে পরপুরুষের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে পারে। খুব কমই পুরুষ স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। দৈত্যাকার জলমাঝি বেলোসটোমা *(Belostoma)* জাতীয় কীট বহুল পরিমাণে ধানক্ষেতে, পুকুরে ও হ্রদে থাকে। বর্ষা শুরু হলে এদের উৎপাত বাড়ে। এরাই অনিচ্ছুক ও গজগজ করা বাবাদের চমৎকার উদাহরণ। পুরুষকে যাবতীয় ডিমের বোঝা পিঠে বয়ে বেড়াতে হয়। স্ত্রী জুলুম করে পুরুষকে কবজা করে। পায়ের ফাঁকে জোর করে চেপে পিঠে চেপে বসে। পুরুষ প্রাণপণ চেষ্টা করে স্ত্রীসঙ্গীদের কবলমুক্ত হতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গায়ের জোরে হেরে যায়। হার মেনে পুরুষ হাত পা ছেড়ে নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দেয়। স্ত্রী এবার নিশ্চিন্তে বসে পুরুষের পিঠের ওপর সার সার প্রায় গোটা পঞ্চাশ ডিম পাড়ে এবং প্রত্যেক ডিম যাতে তাড়াতাড়ি শক্ত হয় ও জলে ভিজে নষ্ট না হয় সেজন্যে এক ধরনের সিমেন্ট দিয়ে সেগুলোকে আটকে দেয়। পুরুষের মুক্তি এতক্ষণে। কিন্তু এই মুক্তি সুখকর নয়। গোলামি অসহ্য আবার। পুরুষ তাই প্রাণপণ চেষ্টা করে অবাঞ্ছিত বোঝা ঝেড়ে ফেলতে। মাঝে মাঝেই পিঠের ওপর পা তুলে চেষ্টা করে ডিম ফেলে দিতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সে দু-চারটে ডিম ফেলে দিতে পারে শুধু। সেগুলোর রস শুষে খেয়ে স্বৈরীনী স্ত্রীর ওপর আক্রোশ মেটায়। সে জানে যার হাত থেকে রেহাই নেই, তাকে সহ্য করাই শ্রেয়। তাই ডিম বয়ে নিয়েই বেড়াও! দিন পনেরো বাদে ডিম ফুটে শূককীট বের হলেই তার মুক্তি। পিঠের ওপর নিজের অজান্তে পুরুষ বংশবৃদ্ধির এক গুরুদায়িত্ব পালন করে। ডিম ও শূককীটের পরিমিত পরিমাণে জল ও বাতাস দুইয়েরই প্রয়োজন। পুরুষ শ্বাস নিতে জলের ওপর ভেসে ওঠে বলে দুটো প্রয়োজনই মেটে। পুরুষ ডিম বহন না করলে শূককীটের জন্ম হয় না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ডিম সংগ্রহ করে যদি জলপূর্ণ পাত্রে রেখে দেওয়া যায়, অত্যন্ত দ্রুত সেই ডিম উপযুক্ত বাতাসের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ ডিমকে জলে থাকতে হবে আবার বাতাসের স্পর্শও পেতে হবে, তাই মায়ের আর কিই বা করার আছে অপদার্থ স্বামীকে দিয়ে জবরদস্তি সুবিধা আদায় করা ছাড়া? পুরুষ কিন্তু দায়িত্ব পালন করে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে।

বেলোসটোমা *(Belostoma)* প্রজাতির ঘ্যানঘেনে বাবারা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ কীটপতঙ্গেরা পিতৃস্নেহ দিয়ে লালনপালনে আনন্দ পায়। যদিও অনেক সময় ভূমিকা গৌণ, তবুও সঙ্গিনীর অনেক কাজেই এরা সাহায্য করে। স্বেচ্ছায় তারা, সাহায্য করে জোর জবরদস্তি করতে হয় না। ছুটোছুটি করে টুকিটাকি কাজ করে, বাসার জন্য মাটি খোঁড়ে, স্ত্রী মাটি খুঁড়লে সেই আবর্জনা সাফ করে, শূককীটের খাবারের জোগাড় করে, ভাঁড়ার ঘরে তা মজুত করে, বাসার দরজায় পাহারা দেয়, এমন কি বাচ্চাদের খাইয়েও দেয়। পুরুষসঙ্গী যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে সাহায্য করে বলে মায়ের শক্তি ও সময় দুই-ই বাঁচে। স্ত্রী ডাংরোলার বীটল অন্‌থোফ্যাগাস *(Onthophagus)* একা যখন বাসা বানায় তখন প্রায় পাঁচ-ছয় ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্তু পুরুষসঙ্গীর সাহায্য পেলে বাসা বানানো শেষ হয় তিন ঘণ্টার মধ্যে। নিশ্চিন্ত হয়ে সে তখন অনেক
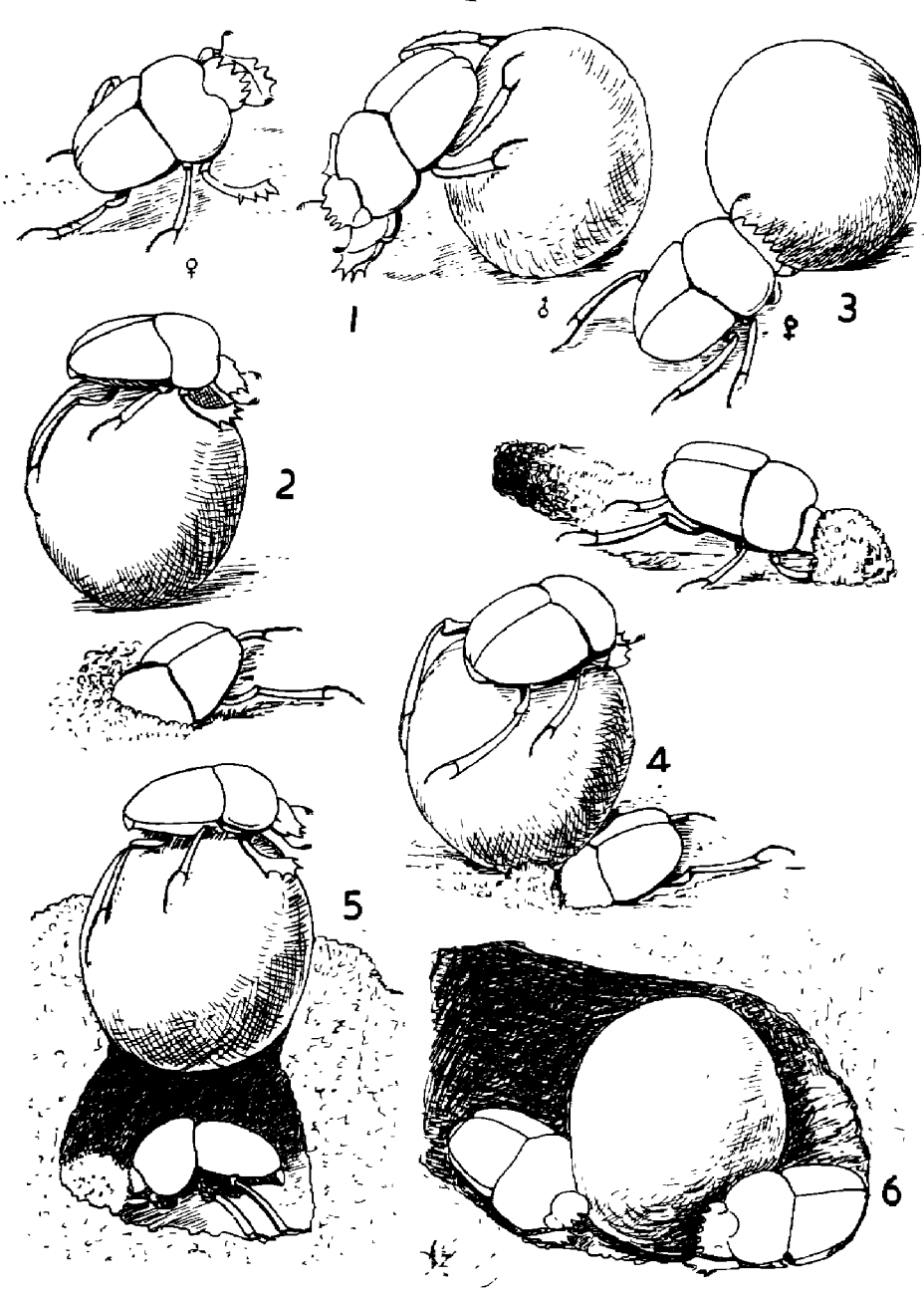
78. ডাং রোলার সেক্রেড স্কারাব বীটল মলের বল গড়িয়ে নিয়ে যেতে ব্যস্ত; 1. বাবা গুলিটি গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর মা তার পিছু পিছু চলেছে; 2-3. বাসার পাশে এসে বাবা মাথা দিয়ে গর্ত করছে আর মা পাহারা দিচ্ছে গুলিটিকে; 4. যতই গর্ত করার কাজ এগোচ্ছে, মা গুলিটিকে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গর্তের দিকে; 5. বাবা প্রাণপণে গর্ত খুঁড়ে চলেছে আর মা গভীর গভীরতর গর্তে ক্রমশ গুলিটিকে ঠেলে দিচ্ছে; 6. ডিম্ব প্রকোষ্ঠ এখন তৈরী। বাবা ও মা সফলভাবে গুলিটি ভেতরে নিয়ে এসেছে। ডিম পাড়বার আগে ঠিকঠাক জায়গা মতো এটিকে রাখতে এখন তারা উল্লসিত ও ব্যস্ত।

বেশি ডিম পাড়তে পারে। যদিও সমস্ত রকম কাজ করতে স্ত্রীরা সক্ষম, তবুও পুরুষ তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় আগ্রহ নিয়ে। বহু সময় তো বাচ্চাদের কে খাওয়াবে তাই নিয়েও মারামারি লেগে যায়। অবশ্য অধিকাংশ সময়েই কাজের ভাগ থাকে—বাইরের কাজ ও খাবার সংগ্রহের দায়িত্ব বাবার। মায়ের কাজ বাসার ভেতরে, শিশুদের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং শূককীটের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা। স্ত্রী যখন বাসা বানানোর জন্য গর্ত খোঁড়ে পুরুষ তখন সতর্ক হয়ে পাহারা দেয়। একনিষ্ঠ পারস্পরিক এই সমঝোতা বিরল দৃষ্টান্ত।

পালক পিতামাতা

কীটপতঙ্গদের ও তাদের নিজেদের সন্তান-সন্ততির প্রতি উৎকণ্ঠার কথা আমরা আলোচনা করেছি। অনেক কীটপতঙ্গ নিজেদের ডিম বা শূককীটের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে মাথাই ঘামায় না। বংশ রক্ষার জন্য এরা বাসা বানায় না, শূককীটের জন্য খাদ্য সঞ্চয়ও করে না। উল্টে অন্যান্য প্রজাতির উৎকণ্ঠার সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর এরা নিজেদের সন্তানপালনের দায় চাপিয়ে দেয়। কূটবুদ্ধি স্ত্রীরা চোরের মতো চুপি চুপি অন্য কীট বা পতঙ্গের খাদ্যে ভরা সুরক্ষিত বাসায় ডিম রেখে আসে। ডিম ফুটে বেরোনোর পরে আশ্রয়দাতার শূককীটের জন্য সংগ্রহ করা খাদ্যবস্তুতে তাদের শুককীটেরা ভাগ বসায়।

বহুক্ষেত্রে আশ্রয়দাতৃ কীটপতঙ্গ পালিকা মাতার ভূমিকা পালন করে। নিজের ও অন্য প্রজাপতির শূককীটকে একই যত্নে পালন করে। রবার বী কিলিয়ক্সিস *(Coelioxys)* নিজের ডিম নিয়ে যায় পাতা কাটা মৌমাছি মেগাকাইল *(Megachile)* -এর বাসায়। অন্য এক ধরনের মৌমাছি স্টেলিস *(Stelis)* নিজের শূককীটের জন্য ব্যবস্থা রাখে অ্যানথিডিয়াম *(Anthidium)* নামের প্রজাতির বাসায়। ক্রাইসিডাইডি *(Chrysididae)* গোত্রের গোল্ডেন কুক বোলতা অন্য কোনো কীট বা পতঙ্গের বাসার কাছাকাছি ঝোপেঝাড়ে বা পাথরের আড়ালে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। নড়াচড়া করে না। অন্য কীট বা পতঙ্গ যে মুহূর্তে কোনো দরকারে বাসা ছেড়ে বাইরে যায়, সেই মুহূর্তে এই বোলতা দ্রুতবেগে গিয়ে সেই নিরাপদ ও খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ বাসায় ডিম রেখে আসে।

চালিকা শক্তি

আমরা ভাবতে অভ্যস্ত যে সন্তানের প্রতি স্নেহ ভালবাসা মানুষেরই এক্তিয়ার। কিন্তু আমরা ভাবি না কীটপতঙ্গেরও উৎকণ্ঠা আছে, এবং সব কাজে সেটিই চালিকা শক্তি। আমরা দেখেছি কিভাবে কীটপতঙ্গ নিজের সন্তানের যত্ন নেয়। ডিম ফুটে শূককীট বেরোবার জন্য যা যা প্রয়োজন শুধু তারই ব্যবস্থা করে না, শত্রুপক্ষ ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কবল থেকেও সন্তানদের রক্ষা করে। কত রকম ধোঁকা দিয়েই না এরা ডিম ও শূককীটকে বাঁচিয়ে রাখে! বাসা বানানোর দক্ষতা, কলা কৌশলই বা কত রকমের! শূককীটের জন্য খাবারও সংগ্রহ করে রাখে কতরকম ভাবে। স্ত্রী বোলতা

বিরামহীন ভাবে পরিশ্রম করে বাসা বানায় এবং পরিশ্রম করতে করতেই সে নিঃশেষ হয়ে যায়। যে সন্তানের সুখের জন্য এত পরিশ্রম, তার জন্মও সে দেখতে পায় না! অনেক কীটপতঙ্গ আছে যারা সরাসরি ডিম ও শূককীটের পরিচর্যা করে, নিদারুণ তাপ ও প্রচণ্ড বৃষ্টিতে আশ্রয় দেয়, নিজেদের শরীর দিয়ে আগলে রাখে এবং শত্রুর মোকাবিলা করে। মায় দায়িত্বহীন পিতাও মাঝে মধ্যে নজর দেয়। সমাজবদ্ধ কীটপতঙ্গের মধ্যে বড় বোনেরা ছোটদের আদর যত্ন করে। অবাক লাগে না? কীটপতঙ্গ যে মুহূর্তে সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হয়, সেই মুহূর্ত থেকে ভাবি সন্তানের শুভ চিন্তা ছাড়া আর কোনো কিছুই তার মনে স্থান পায় না। কীটপতঙ্গের ব্যবহার তাই মাতৃসুলভ। স্ত্রী পতঙ্গ প্রথমে মা, পরে স্ত্রী। নারী রহস্য! মানুষের ক্ষেত্রে যা সত্য, অন্যত্রও তাই। আশ্চর্যের নয়, অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সাহিত্যে মাতৃত্বের অপার মহিমার জয়গান করা হয়েছে।

মাতৃস্নেহ কীটপতঙ্গের স্বভাব, সমাজজীবন ও বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। গোঁড়া প্রাণীতত্ত্ববিদ অবশ্য বলবেন, মানুষের মতো এদের 'মন' নেই। এমনকি পিঁপড়েও অবুঝ, মূলত জটিল সহজাত প্রবৃত্তির দাস, যাকে 'বুদ্ধি' চলা চলে না। ইউরোপের এক বিশিষ্ট কীটপতঙ্গ বিশারদ (ইনি ভারতবর্ষের কীটপতঙ্গের ওপরও বিস্তর গবেষণা করেছেন) সংক্ষেপে মন্তব্য করেছেন, "সবচেয়ে উচ্চমানের কীটপতঙ্গের থেকে একটা কুকুরের বিচারবুদ্ধি বেশি, মনস্কতাও উন্নতমানের। পিঁপড়ে আবার এমনিতে যথেষ্ট মূর্খ হতে পারে কিন্তু এদের অদ্ভুত এক সহজাত প্রবৃত্তি আছে যা বৈপরীত্যে ভরা, যা কৌতূহল জাগায়।"

তবে কীটপতঙ্গ কি শুধুমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির দাস? তাদের ব্যবহারে কি বুদ্ধির আঁচও নেই? তাদের সন্তানস্নেহে কি কোন মনের টান নেই? তবে কি সে যন্ত্রবিশেষ, শুধু রুটিন কাজ করে? তার নেই কোন অনুভূতি? ফরাসী প্রকৃতিবিদ ফেবর-এর তাই তো মত। এই ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি ও মতবিরোধ আছে। ফেবর সারাজীবন ধরে কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে গেছেন ও নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মায় রাজমিস্ত্রী মৌমাছি চ্যালকোডোমা *(Chalcodoma)*-এর বাসা থেকে সমস্ত মধুও তিনি টেনে বের করে নিয়েছেন। তবু দেখেছেন, মৌমাছি কিন্তু ভ্রুক্ষেপ না করে ডিম পেড়ে যাচ্ছে। খেয়ালই নেই শূককীটের খাবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা থেকে ফেবর এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, মৌমাছির সহজাত প্রবৃত্তি তাকে এত বেশি নিয়ন্ত্রিত করে যে, কতটা খাদ্য সে সঞ্চয় করেছে বা সঞ্চিত খাদ্য কোথায় যাচ্ছে, তাই নিয়ে তার কোনো মাথ্যাবাথা নেই। সে সঞ্চয় করে, তার সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি যতক্ষণ থাকে। ফেবর-এর মত কি ঠিক? দেখা যাক। কয়েক বছর আগে ইউমেনেস *(Eumenes)* জাতীয় একটা বোলতাকে আমাদের ঘরে বাসা বাঁধতে দেখেছিলাম। হুল ফুটিয়ে অবশ করা শুঁয়োপোকাগুলোকে বাসায় নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেই সেগুলোকে বাসা থেকে সরিয়ে দিলাম। প্রথমদিকে স্ত্রীবোলতা অতটা খেয়াল করেনি। ক্রমাগত সে শুঁয়োপোকা এনে এনে জড়ো করছিল আর

খালি বাসায় রাখাছিল। রাত পর্যন্ত এইভাবে আমরা পাঁচটা শুঁয়োপোকা সরিয়ে দিই, যা কিনা দুটো বাসার খাদ্য হিসেবে যথেষ্ট। পরের দিন সকালে বোলতা আরও শুঁয়োপোকা এনে হাজির করে, আমরাও সব সরিয়ে দিই। স্ত্রীবোলতাকে এবার বিচলিত হতে দেখা যায়। মাঝে মাঝেই সে বাসার ভেতর ঢুকছে, বাইরে আসছে, শুঁয়োপোকা আনার ব্যস্ততা নেই। আমরা আর তাকে বিরক্ত করলাম না। খানিকক্ষণ বাদে নিশ্চিন্ত হয়ে বোলতা দুটো শুঁয়োপোকা বাসায় এনে বাসার মুখ বন্ধ করে দিল। যদি সহজাত প্রবৃত্তিই মূল কথা হত, তাহলে একটা দুটো শুঁয়োপোকা এনেই বোলতা বাসার দরজা বন্ধ করে দিত, ভেতরে ঢুকে দেখত না বাসা খালি কি না। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল যে খাবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং বাসা খালি হয়ে যাচ্ছে। তাই তদন্ত ও ব্যস্ততা।

অন্য একটা পরীক্ষা। ফেবর একটা তরুণ রাজমিস্ত্রী মৌমাছির বাসার বাইরে বেরোবার পথে দুটো বাধা রাখেন, ভেতরেরটা কাদামাটির ও বাইরেরটা কাগজের। মৌমাছি কাদামাটির বাধা ভেদ করে, কিন্তু কাগজ ভেদ করে না। ফেবর বলে, মৌমাছির স্বভাব হল পথে বাধা থাকলে তা একবারই ভেদ করে অতিক্রম করা। তাই প্রথম বাধা কাটিয়ে ফেললেও দ্বিতীয় অর্থাৎ কাগজের বাধা কাটায় না। রুটিন কাজ করেছে, এখন সে অসহায়। আমরা কিন্তু দেখেছি ত্রুটি মৌমাছির নয়, পরীক্ষকের। আমরা একটা রাজমিস্ত্রী বোলতার সব শূককীটকে একটা কাঁচের নলে বন্ধ করে নলের মুখে তিনটে বাধার সৃষ্টি করি, সব কটাই কাদামাটির এবং প্রত্যেকটার গভীরতা বোলতাটার চাকের থেকে দু-গুণ বেশি। ফেবর-এর মতবাদ ঠিক হলে দেখা যেত যে তরুণ বোলতাটা শুধুমাত্র প্রথম বাধা ভেদ করতে পেরেছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাধা সে দূর করার কথা 'চিন্তা'ও করল না, কারণ তার প্রবৃত্তি সন্তুষ্ট এবং কদিন বাদেই তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, তিনটে বাধাই অবলীলায় সে অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ তাদের ভেদ করে বোলতা বাইরে বেরিয়ে গেছে। মৌমাছি বা বোলতার পরিচয় শুধু মাত্র কাদামাটির বাধার সঙ্গেই। 'কাগজ' বস্তুটির সঙ্গে তাদের পরিচয়ই নেই। নতুন জিনিস দেখে তারা যদি না বুঝতে পারে, তবে তাদের দোষ কি? আমরাই কি পারব, ভিন্ গ্রহের বাসিন্দারা অচেনা এক গোলকের মধ্যে আমাদের যদি বন্দী করে রাখে আর সেই গোলকের প্রকৃতি না জেনে সেই বাধা অতিক্রম করে মুক্তি পেতে? অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতিবিদরা এমন সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন যার পরিবেশ কীটপতঙ্গের অজানা। ভুললে চলবে না, যাবতীয় প্রাণীর, এমন কি মানুষেরও জীবনের গতিপ্রকৃতির বাইরের চাহিদা মেটানোর মত বুদ্ধি ঘটে নাও থাকতে পারে। সহজ কথা মনে না রাখলে নানা সংশয় দেখা দেবে।

মাটি খুঁড়ে বাসা বানায় যে জাতের বোলতা তারা যদি অবশ শিকারকে নিজেদের বাসায় টেনে আনত তবে সেটা স্বাভাবিকই হত। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি শিকারকে তার বাসা থেকে বা গর্ত থেকে টেনে বের করে তাকে হুল ফুটিয়ে অবশ করে আবার সেই বাসাতেই রেখে আসে এরা। ভালো করে ভেবে দেখলে এরও একটা সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের শিকার হল ঝিঁঝিপোকা, যাদের

শরীর বোলতার তুলনায় দৈত্যের মতন। অত ভারি শিকারকে তাই নিজেদের বাসায় টেনে নিয়ে যাওয়াও কষ্টসাধ্য। আর বোলতা যদিও দক্ষ কারিগর তবু নিজের মাপের চেয়ে বড় মাপের বাসা তৈরি করতে পারে না। তাই শিকারকে তার নিজের আস্তানায় রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করে। একবার আমরা একটা শিকারী স্ত্রীবোলতার সামনে ছেড়ে দিই কয়েকটি ঝিঁঝিপোকা। বোলতা শিকার দেখে অত্যন্ত পুলকিত। কিন্তু কাউকে আহত করার চেষ্টাই করে না। সে নিজেই শিকার খুঁজে নেবে, যাতে শিকারের আস্তানার হদিশও একই সঙ্গে পাওয়া যায়। যদি আমাদের দেওয়া ঝিঁঝিঁপোকাগুলোকে সে আক্রমণ করত তবে আখেরে লাভ হত না কিছুই, কারণ হুলের অবশ প্রভাব বিফলে যেত, কারণ অবশ শিকার রাখার উপযুক্ত স্থান নেই। আবার এর মধ্যে শিকারের অবশভাব কেটে যেত। শিকারের গত খুঁজে বের করা ঢের সহজ, আহত শিকারকে সেখানে ঢুকিয়ে রাখা যায়। অবাক হইনি খাবার দেখিয়েও স্ত্রীবোলতাকে প্রলুব্ধ করতে পারিনি বলে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, বোলতা কি বোকা যে ঝিঁঝিপোকার গর্ত খুঁজে পেলে তাকে সেখানেই হুল না ফুটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য উত্তেজিত করে। এতে শিকার হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা থাকে। ঝিঁঝিপোকার সরু গর্তে ঢুকে তার শক্ত চোয়ালের কবলে পড়তে চায় না। তাতে তার রক্ষা নেই। স্ত্রী বোলতা তাই চেষ্টা করে যে করেই হোক সামনাসামনি লড়াই এড়িয়ে গিয়ে পেছন থেকে আক্রমণ করার। গর্তের ভেতরে সেটা সম্ভব নয় বলেই সে শিকারকে ক্রমাগত উত্তেজিত করে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য। আশ্চর্যের বিষয়, ঝিঁঝিপোকাও জানে ব্যাপারটা কি। নিতান্ত নিরুপায় না হলে নিজের গর্ত থেকে কখনই বের হয় না।

কিছু কিছু মাকড়সা-শিকারী পমপিলাস *(Pompilus)* জাতীয় বোলতা অত্যন্ত বুদ্ধির সঙ্গে জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। এক ধরনের মাকড়সা আছে যারা ইংরেজি 'Y' অক্ষরের মতো বাসা বানিয়ে মাটির নিচে বাস করে। এই বাসার দুটো প্রবেশ পথ। পথের মুখ রেশমজাতীয় তন্তুর জাল দিয়ে ঢাকা থাকে। প্রবেশ পথ দুটোর শেষ প্রান্তে গভীর গর্তে মাকড়সা বাস করে। বোলতার হয় মুশকিল। সে যদি একটা দরজা দিয়ে ঢোকে তবে অন্য দরজা দিয়ে শিকার দ্রুত পালিয়ে যেতে পারে। বোলতার সামনে তাই তিনটে উপায়। প্রথম হল, একটা দরজা ভেঙে দিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করা। মাকড়সা যেই না দরজা মেরামত করতে বেরিয়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। দ্বিতীয় উপায়, একটা দরজার ভেতর দিয়ে শরীরটাকে পেট পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেওয়া এবং হঠাৎ তা বের করে নেওয়া যাতে মাকড়সা ভয় পায়। একই সঙ্গে দ্বিতীয় দরজার ওপর নজর রাখা যাতে সে পালাতে গেলেই ধরা পড়ে। তৃতীয়, দুটো দরজাতেই পর্যায়ক্রমে টোকা মেরে আঘাত করা যাতে বুঝতে না পেরে হতচকিত মাকড়সা বেরিয়ে আসে গর্ত ছেড়ে। আমরা লক্ষ্য করেছি তিনটে উপায়ই বোলতা গ্রহণ করে পরিবেশ বিবেচনা করে।

যথেষ্ট নজির আছে যে, কীটপতঙ্গ যদিও সহজাত প্রবৃত্তি মেনে চলে, তবুও তারা প্রবৃত্তির দাস নয়। নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এদের আছে।

সহজাত হলেও সন্তানস্নেহের ব্যাপারে পরিবর্তিত অবস্থাকে বুঝে চলার মত ক্ষমতা তাদের আছে। অন্তত, সেসব ক্ষেত্রে বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের সঙ্গে থাকে। তাদের প্রকৃতই অপত্যস্নেহ রয়েছে। তবে এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই। উন্নতমানের প্রাণীদের ক্ষেত্রে, এমন কি মানুষের ক্ষেত্রেও, সন্তানের প্রতি মায়ের এই যে মায়া, এই যে স্নেহ, পরোক্ষভাবে তা তো সহজাত প্রবৃত্তিরই প্রকাশ। সাধারণভাবে আমরা দেখেছি স্ত্রীজাতি অনেকটা সহজাত প্রবৃত্তি নির্ভর। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা সঠিক।

চতুর্থ অধ্যায়

কীটপতঙ্গ ও উদ্যান

কীটপতঙ্গদের যদিও আমাদের ঘরের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, সাধারণভাবে, তবু এরা প্রকৃতপক্ষে খোলা হাওয়ায় থাকতে পছন্দ করে, পছন্দ করে উজ্জ্বল সূর্যালোক, সবুজ তৃণক্ষেত্র। বাগানে, সবুজ মাঠে, জঙ্গলে এদের চিরাচরিত বাসা। মানুষের আওতা থেকে দূরে। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে খুব কম প্রজাতির কীটপতঙ্গই আমাদের আরামপ্রদ বাসস্থানের আনাচে কানাচে ঘর বাঁধে, বেশির ভাগই খোঁজে প্রকৃতির কোলে নিরাপদ আশ্রয়। মানুষ বারবার এদের বাস্তুচ্যুত করার চেষ্টা করছে। সফল হয়নি। ভারতে কীটপতঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে রয়েছে। প্রকৃতির মাঝে এদের জীবন সম্ভ্রান্ত, বহুমুখী, রঙীন, আবার আধুনিক। ফড়িং, ঝিঁঝিঁপোকা, কেটিটিড্‌রা নানা মাপের। সুন্দর, কখনও বা অদ্ভুতদর্শন। ঘন সবুজ ঘাসে ও নিচু গুল্মে এরা লাফিয়ে বেড়ায়। ছারপোকা জাতীয় ছোট ছোট সব পোকা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করে ঝোপে ঝাড়ে। সিকাডারা গান গায় গাছে; চকচকে গুবরেপোকারা সদাই ব্যস্ত; রঙচঙে সুন্দর প্রজাপতি উড়ে যায় এক ফুল থেকে অন্যফুলে গুণ গুণ গুঞ্জনে মত্ত মধুপায়ী মৌমাছি। কখনও বা কোথা থেকে যেন বোলতা উড়ে আসে অসতর্ক শিকারের ওপর। মাছি ও ডাঁশ দলে দলে বেরিয়ে নাচানাচি করে অপরাহ্নের গরম বাতাসে, মথেরা উড়ে যায় সুগন্ধি সাদা ফুলে খুদে খুদে পরীর মতো, চুপি সাড়ে, ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি দপদপ করে জ্বলে ঝোপে ঝাড়ে, অমাবস্যার রাতে মাঠে ঘাটে বিছিয়ে দেয় তারার গালিচা—চলো, আমরাও ঘর ছেড়ে বাইরে যাই, আশ্চর্য এইসব প্রকৃতির সন্তানদের প্রত্যক্ষ করি।

গঙ্গাফড়িং

গঙ্গা ফড়িং যথার্থ নাম। যেন সব সময়ই লাফাচ্ছে। এরা জানে না হাঁটতে। হামাগুড়ি দেওয়া বা দৌড়াদৌড়ি করা এদের না-পসন্দ। দীর্ঘ ও উঁচু লাফই এদের মনে ধরে, তবে তেমন জরুরি প্রয়োজন হলে এরা উড়তে পারে। এদের বাসস্থান মূলত সবুজ ঘাসে ও সবুজ শস্যক্ষেত্রে।

গঙ্গাফড়িং ও ঝিঁঝিপোকা অর্থপ্টেরা *(Orthoptera)* প্রজাতির অন্তর্গত। এদের সামনের ডানা সরু ও পাতলা চামড়ার মতো, পেছনের ডানা ঝিল্লীময়, বড়, আর

পাখার মতো ভাঁজ করা, যখন ব্যবহার হয় না। চোয়াল যথেষ্ট শক্ত, দাঁত খুবই ধারালো, এতে কাটতে সুবিধা, গুঁড়ো করতে সুবিধা গাছের পাতা, ঘাসের শীষ। পেছনের পা অন্যান্য পায়ের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা, আর মোটা। হঠাৎ লাফানোয় সুবিধা। প্রায় সব গঙ্গাফড়িংয়ের রং উজ্জ্বল সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল, বাদামি বা ধূসর। অধিকাংশ সময়েই এরা গাছের পাতায় এমনভাবে থাকে এবং এদের শরীরের রং ওই পাতার রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে পাতা ও পতঙ্গকে আলাদা করা যায় না। অবশ্য, যতক্ষণ না তারা লাফাচ্ছে। রাক্ষুসে খিদে এদের, অল্পকালের মধ্যেই ঝোপঝাড় খেয়ে শেষ করে। বর্ষাকালে এদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। শত্রু এদের অনেক। বিশেষ করে ময়না পাখি, যার বৈজ্ঞানিক গালভরা নাম হল অ্যাক্রিডোথেরেস ট্রিসটিস *(Acridotheres`tristis)*। এই পাখিরা ভাবে, ঈশ্বর ফড়িংদের সৃষ্টিই করেছেন খাবার টেবিলের ভোজ্য হিসেবে। ঝোপঝাড় থেকে, আমাদের চোখে পড়ে না। এই পাখি ছোঁ মেরে ডজন ডজন গঙ্গাফড়িং ধরে খায়।

আমাদের দেশের গঙ্গাফড়িংরা দুইজাতের:

(১) ছোট শুঁড়ের বা অ্যাক্রিডিডস *(Acridids)*, এবং

(২) বড় শুঁড়ের বা টেটিগোনিডস *(Tettigonids)*, কেটিটিডসও বলা হয়।

ছোট শুঁড়ের ফড়িংদের পেটের গোড়ায় ডিম রাখার জন্য আছে ছোট ডিম্বাশয়। শ্রবণেন্দ্রিয় হিসেবে আছে অদ্ভুত ধরনের কানের পর্দা বা টিমপেনাম যা ডানার ঠিক নিচে পেটের ওপর থাকে। খসখসে ডানা পায়ে ঘষে এরা এক ধরনের আওয়াজ করে, বেহালায় ছড় টানা আওয়াজের মতো। মাটির নিচে ছোট ছোট গর্তে একগাদা ডিম পাড়ে। টেটিগোনিডসদের আছে লম্বা সুতোর মতো শুঁড়, নিজেদের দেহের চেয়েও যা অধিকাংশ সময়ে বড়। আর আছে লম্বা তলোয়ারের মতো ডিম্বাশয়। টিমপেনামের অবস্থান সামনের জঙ্ঘায়। সাধারণত টেটিগোনিডস তাদের ডিম পেড়ে ঢুকিয়ে রাখে গাছের বাকলের খাঁজে।

ছোট শুঁড়ের গঙ্গাফড়িং

পরিচিত ছোট শুঁড়ের ফড়িং এক ঝাঁক ডিম পাড়ে মাটিতে। ডিমগুলি পরস্পর লাগানো থাকে আঠা জাতীয় পদার্থ দিয়ে। আঠা তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে যায়। এক একটা ঝাঁকে প্রায় পঞ্চাশ থেকে একশোটা ডিম থাকে। মাটির নিচে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতে যথেষ্ট সময় লাগে, প্রায় পুরো শীতকাল বা গ্রীষ্মকাল লেগে যায়। অনেক প্রজাতির ক্ষেত্রেই ডিম্বাবস্থা থাকে অক্টোবর থেকে জুন মাস পর্যন্ত; অবশিষ্ট প্রজাতির ক্ষেত্রে জুন থেকে জুলাই। শীতকালে ডিম ফুটতে দেরি হওয়ার কারণ 'শীতঘুম'; এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মে দেরি হওয়ার কারণ 'গ্রীষ্মকালীন অবসর যাপন'।

ডিম ফুটে খুদে খুদে বাচ্চা যখন বেরোয়, দেখতে তাদের এমনিতে পূর্ণবয়স্কদেরই মতো, শুধু ডানা থাকে না। বড়দের মতো রং নয়—হলুদ বা সবুজ। এরা রাক্ষসের মতো খায়, অত্যন্ত দ্রুত বাড়ে, পাঁচ থেকে সাতবার খোলস বদলায়। তৃতীয়বার খোলস বদলাবার সময় ডানা গজানো শুরু হয়, কখনও ঘটে চতুর্থবার বদলানোর সময়।

পূর্ণবয়স্ক ফড়িং লাল বা বাদামি রঙের। অনেকের বছরে একটা করে প্রজন্ম থাকে; কয়েকটা ক্ষেত্রে বিভিন্ন আয়ুষ্কালের দুটো প্রজন্মও দেখা যায়। তবে একই বছরে একাধিক প্রজন্মের সৃষ্টি হয়েছে এরকম প্রজাতির বিরল।

ছোট শুঁড়বিশিষ্ট ফড়িং-এ প্রায় হাজারেরও বেশি প্রজাতি লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটা সাধারণ, অদ্ভুত খেয়ালি প্রজাতির কথা এখানে আলোচনা করা যাক। অ্যাক্রিডা টুরিটা *(Acrida turrita)* পাতলা গড়নের, বহু রঙের (উজ্জ্বল সবুজ থেকে শুকনো ঘাসের মতো সবুজ) ও চ্যাপ্টা শুঁড়বিশিষ্ট। এপাক্রোমিয়া ডরস্যালিস *(Epacromia dorsalis)* প্রজাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, বর্ষাকালে বৈদ্যুতিক আলোতে আকৃষ্ট হয়। এড্যালিয়াস মারমোর‍্যালিস *(Aedaleus marmoralis)* উজ্জ্বল কমলা ও কালো রঙের—আমাদের দেশে প্রচুর আছে। অলারচেস মিলিয়ারিস *(Aularches miliaris)* নিচু পাহাড়ী অঞ্চলে দেখা যায়। এদের রং গাঢ় সবুজ বা কালো, তার ওপরে লাল বা হলুদ ফুটকি থাকে। চিত্রবিচিত্র গঙ্গাফড়িং *(Poecilocerus pictus)* সম্ভবত সবচেয়ে সুন্দর। প্রায় সারা ভারতেই দেখতে পাওয়া যায় আকন্দ গাছে। তরুণ ফড়িংরা হলুদ রংয়ের। তাতে উজ্জ্বল লাল কালো ফুটকি। খোলস ছাড়বার সময় এদের রং পালটে হয় নীল ও হলুদ। অ্যাট্রাক্টোমরফা ক্রেনুলাটা *(Atractomorpha crenulata)* ভারতের বহুস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রজাতির স্ত্রীপতঙ্গ সবুজ কিন্তু স্ত্রীর তুলনায় পুরুষ আকারে ছোট, রং বাদামি। যদিও সাধারণত জংলী জাতের গাছের পাতা খায় তবু বিশেষ প্রিয় হল তামাক পাতা। বিশেষ এক ধরনের ফড়িং আছে যাকে বোম্বাই পঙ্গপাল বলা হয়। সিরটাক্যানথাক্রিস সাক্সিংকটা *(Cyrtacanthacris succincta)* নাম। লাল মেঘের মত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় দাক্ষিণাত্যের তৃণভূমি ও শস্যক্ষেত্রের ওপর। মাঠে ঘাটে আরও যে দুটো সাধারণ প্রজাতি চোখে পড়ে তারা হল সবুজ রঙের ছোট ফড়িং হায়ারোগ্লিফাস ব্যানিয়ান *(Hieroglyphus banian)* আর অক্সিয়া ভেলক্স *(Oxya velox)*। এরা খাদ্যশস্যের ক্ষতি করে, বিশেষত ধানের। আর একটা রাক্ষুসে ফড়িং হল টেরাটোডাস মন্টিকোলিস *(Teratodus monticollis)*। দেখা যায় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে। রং সবুজ বা শুকনো ঘাসের মতো। এইসব দৈত্যের মাথা থেকে বিরাট একটা ছাদের মতো ঢাকনা পেছন পর্যন্ত বেরিয়ে থাকে, পুরো শরীরটা ঢেকে রাখে।

লম্বা শুঁড়ের ফড়িং

লম্বা শুঁড়ের ফড়িংরা সাধারণভাবে আকারে বড় ও সবুজ রঙের, অনেকটা গাছের পাতার মতো দেখতে। কখনও বাদামি, কখনও গাছের বাকলের মতো। এরা ঘোরাঘুরি করে রাত্রে, ছোট শুঁড়বিশিষ্ট ফড়িংদের মতো দিনের বেলায় নয়। এদের মধ্যে কিছু নিরামিষাশী, আবার কিছু অন্য পোকামাকড় ধরে খায়। ভারতে এদের বেশি দেখা যায় বর্ষায়। যখন রাত্রে এরা আলোতে আকৃষ্ট হয় তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দ করে। দুটো পরিচিত প্রজাতি হল মেকোপোডা *(Mecopoda)* ও হলোক্লোরা *(Holochlora)*। প্রথমটার রং অদ্ভুত রকম শুকনো পাতার মতো গাঢ় বাদামি। থাকে গাছে। সারথ্রোফাইলিয়া *(Sarthrophyllia)* চ্যাপ্টা ধাঁচের গাছের বাকলের মতো দেখতে। দিনের বেলায় এরা

চুপ করে গাছের গুঁড়িতে বসে থাকে। কনোসেফ্যালাস *(Conocephalus)* সবুজ রংয়ের লম্বা ধাঁচের ঘাসফড়িং, দেখা যায় ঘাসে। এদের পুরুষরা তীক্ষ্ণ ও তীব্র শব্দ করে, কানে তালা লেগে যায়।

ঝিঁঝিঁপোকা

ঝিঁঝিঁপোকা বা গ্রিলিড সব সময়ই ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করছে আর দক্ষতার সঙ্গে মাটি খুঁড়ছে। অবশ্য অনেকে মাটির ওপরেই থাকে। একান্তভাবে মাটির নিচে বাস এমন ঝিঁঝিপোকার অধিকাংশই নিরামিষাশী, গাছের শিকড়বাকড় খায়। তবে কেউ কেউ রাতে বাইরে এসে গাছের পাতা, কুঁড়ি সব খায়।

ঝিঁঝিঁপোকার শব্দের উৎস তাদের ডানা। এরা ডানদিকের ডানার অমসৃণ অংশ বাঁদিকের ডানায় ঘষে অদ্ভুত জোরালো এক শব্দ করে। মাঝে মধ্যে শব্দ এত তীক্ষ্ণ হয় যে মানুষের শ্রবণসীমার বাইরে চলে যায়। শব্দের প্রকৃতি থেকেই এদের এই নামকরণ।

উত্তর ভারতে ব্র্যাকিট্রেপিস অ্যাকাটিনাস *(Brachytrepes achatinus)* নামের একরকম বড় মাপের বাদামি রঙের ঝিঁঝিঁপোকা দেখা যায়। বর্ষার রাতে বৃষ্টির জলে মাটির নিচের বসতি যখন ভেসে যায়, দল বেঁধে এরা ওপড়ে উঠে আসে। সাধারণত পুরুষ পতঙ্গ সূর্যাস্তের পর বেরিয়ে আসে, কান ঝালাপালা করা গান জোড়ে। মাঠে ময়দানে সাধারণত যে ঝিঁঝিপোকা আমাদের চোখে পড়ে সেগুলো গ্রিলোট্যালপা *(Gryllotalpa)* জাতের। ছুঁচো ঝিঁঝিঁপোকা—এদের সামনের পা মোটা, অনেকটা মাটি খুঁড়ে সাফ করবার বেলচা ও নিড়ানির মতো। এরা আকারে বড়, রং বাদামি; মাটির নিচের কুঠুরিতে থাকে; সেখানেই শিশুপালন করে। অনেক সময় আমাদের ঘরের আলোতে আকৃষ্ট হয়ে ভেতরে চলে আসে। দক্ষিণ ভারতে এদের নাম পিল্লাই পুচি—প্রচলিত সংস্কার হল তালমিছরির সঙ্গে একটা ঝিঁঝিপোকা খেলে নারী গর্ভবতী হয়।

ছারপোকা ইত্যাদি

ফড়িং ও ঝিঁঝিপোকার মতো ছারপোকা বা ঐ ধরনের সব পোকা শক্ত খাবার খেতে পারে না, খায় তরল খাবার। শক্ত খাবার কামড়ে খাওয়ার বা চিবোবার উপযুক্ত দাঁত এদের নেই। দাঁতের বদলে আছে জোড়া দেওয়া ঠোঁট, ভেতরে চারটে সূচের মতো তীক্ষ্ণাগ্র লম্বা শলাকা। এই ধরনের পোকারা গাছের ছাল বা প্রাণীদেহের চামড়া ফুটো করে রস বা রক্ত পান করে। কয়েকটা প্রজাতি খাদ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ গাছের ওপরই নির্ভরশীল। আবার কয়েকটা পরাশ্রয়ী জীব হিসেবে বিভিন্ন প্রাণীর দেহে আশ্রয় নেয়। তাছাড়া বেশির ভাগ প্রজাতির বাস ঝোপেঝাড়ে। দরকার মতো উঁচু গাছেও এরা চড়তে পারে। অনেকের গায়ের রং উজ্জ্বল লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, কালো, ধাতব নীল, তামাটে লাল। গায়ে সুন্দর সুন্দর ফুটকি বা ডোরা কাটা থাকে।

বিরক্ত হলে এদের গা থেকে বিশ্রী এক রকম গন্ধ বেরোয়, যে গন্ধ আমরা ছারপোকা মারলে পাই। গন্ধের উৎস বিশেষ ধরনের গ্রন্থি, যেগুলো থেকে উদ্বায়ী দুর্গন্ধযুক্ত তৈলাক্ত এক পদার্থ নিঃসৃত হয়। অনেকের শরীরে মোমের মতো চটচটে একরকম আবরণ থাকে, যাতে শরীর থেকে শুকনো আবহাওয়ায় অতিরিক্ত জল বেরিয়ে না যায়। অনেক কীট যেমন লাক্ষা পোকা ইত্যাদির শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে রজন জাতীয় পদার্থ বেরোয়। ফড়িং-এর মতো এইসব কীটও ভারতে প্রচুর পরিমাণে চোখে পড়ে—বিশেষত বর্ষাকালে ও বর্ষার পরের কিছু সময়। এদের প্রধান দুটো ভাগ: (ক) হেটেরোপ্‌টেরা *(Heteroptera)*, (খ) সিকাডা, এফিড্, মিলিবাগ *(Cicadas, aphids, mealybugs)*, বা হোমোপ্‌টেরা *(Homoptera)*।

হেটেরোপ্‌টেরা

এই প্রজাতির সামনের ডানা চামড়ার মতো, তবে আগার দিক সব সময়ই সরু ও পাতলা, অত্যন্ত স্পর্শকাতর, এবং পেছনের ডানার মতোই ঝিল্লীময়। ডানা গজায় ধীরে ধীরে। শক্ত মোটা হয় যখন পোকাটা পূর্ণবয়স্ক হবার আগে শেষ দুইতিন বার খোলস বদলায়। কিছু স্বাধীন ও পরজীবী হেটেরোপ্‌টেরার ডানা সম্পূর্ণ বিলোপ পায়। বেশিরভাগ সময়ই এরা ধীরে চলে। তবু দরকার বুঝে জোরে ছুটে পালাতেও পারে, বা ফড়িং-এর মতো লাফাতেও পারে। অনেকে পুরোপুরি জলচর, অনেকে কিছুটা। পায়ের সাহায্যে এরা জলে ডুব দিতে যেমন পারে, সাঁতার কাটতে বা জলের ওপর তেমনি হেঁটে বেড়াতেও পারে। একটা বা দুটো প্রজাতি আবার সমুদ্রে চলে গেছে। সমস্ত প্রজাতি পছন্দ করে উষ্ণতা আদ্রতা।

সবচেয়ে পরিচিতি এবং হয়ত সবচেয়ে বিস্ময়কর হল ক্রাইসোকোরিস *(Chrysocoris)*, ক্যান্টাও *(Cantao)*, স্কুটেলেরা *(Scutellera)* আর কপ্‌টোসোমা *(Coptosoma)* প্রজাতি। এদের দেহ শক্ত, দেখতে ঠিক গুবরেপোকার মতো। রং হল উজ্জ্বল কমলা, সবুজ, কালো বা খয়েরী, কখনও বা ধাতব সবুজ, নীল, তামাটে লাল। দেহে আবার ফুট্‌কি ও ডোরাও থাকে। বড় শক্ত একটা খোলা পুরো পিঠের ওপর বর্মের মতো লেগে থাকে, ডানা লুকানো থাকে এরই আড়ালে। উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে ডানা ক্ষয়েও যেতে পারে। অধিকাংশই দৈর্ঘ্যে এক সেন্টিমিটারের মতো। এদের স্বভাব ও জীবনযাপনের ইতিহাস কম বেশি একই ছকে বাঁধা। ছোট ছোট ঝাঁকে ডিম পাড়ে, গাছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ডিম ফুটে ছানা বেরোয়। তাদের দেখতে পূর্ণাঙ্গ পোকার মতো, কাজে পটু, তবে আকার ছোট, রং আলাদা, ডানা নেই। গাছের রস খায়। বার পাঁচেক খোলস বদলায়। ধীরে ধীরে ডানা গজাতে থাকে। অবশেষে পূর্ণতা প্রাপ্তি। ছানা বা 'নিম্ফ' অবস্থা বেশিদিনের নয়। বরং প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় আয়ু বেশিদিনের। বয়স্ক পোকা বাইরে স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি করলেও ছানা অবস্থায় এরা মাটিতে বা গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে।

ক্রাইসোকোরিস স্টোলি *(Chrysocoris stolli)* হল সবচেয়ে সুন্দর প্রজাতি। আকারে বড়, চকচকে সবুজ রঙের। পাওয়া যায় সাধারণত দক্ষিণ ভারতের জাট্রোপা জাতীয়

গাছে। ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেই এরা টুপ্ করে গাছ থেকে খসে পড়ে, এবং শুকনো পাতা বা কাঠকুটোর আড়ালে আত্মগোপন করে। নেজারা ভিরিডুলা *(Nezara veridula)* আকারে সামান্য ছোট, সবুজ বা হলুদ রঙের। নানা ধরনের গাছে ও শস্যক্ষেত্রে বাসা বানায়। টেসারাটোমা জ্যাভানিকা *(Tessaratoma javanica)* অদ্ভুত বাদামি রঙের। তিন সেন্টিমিটার লম্বা। এদের বিরক্ত করলে তীক্ষ্ণ শব্দ করে। করিড *(Coreid)* জাতীয় প্রজাতির আছে বিচিত্র আকৃতির উপাঙ্গ। আছে পায়ের সঙ্গে চ্যাপ্টা পাতার মতো কিছু। লেপ্টোকরিজা *(Leptocoriza)* ধানক্ষেতে হয়। কিছু এলাকায় শস্যের যথেষ্ট ক্ষতি করে। অবশ্য এরা বুনো ঘাসপাতাও খায়। তবে ধানগাছই এদের পছন্দ। লিগিড *(Lygaid)* প্রজাতি সাধারণত ছোট। রং বেরঙের। দ্রুত গতিতে ছোটবার জন্য এদের পা লম্বা। স্পিলোসটেথাস *(Spilostethus)* আকন্দ জাতীয় গাছে সাধারণত দেখা যায়, কার্পাস গাছেও হয়। লাল রং, কালো কালো দাগ আছে। অনেকটা এদেরই মতো দেখতে একই ধরনের প্রজাতি পাইরোকরিড *(Pyrocorid)* পোকা—ডিসডারকাস সিঙ্গুল্যাটাস *(Dysdercus cingulatus)*। এরা লাল রঙের ছারপোকা, যা থেকে কাপড়ে দাগ লেগে যায়।

হোমোপ্টেরা

হোমোপ্টেরা প্রজাতির সঙ্গে হেটেরোপ্টেরাদের তফাত হল, হোমোপ্টেরার দুই জোড়া ডানাই মাপে সমান। গাছ ও গাছের রস খায়। কয়েকটা আবার বিভিন্ন গাছে পরজীবি হয়ে আছে। তাদের ডানা নেই, চলাফেরা করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ লুপ্ত। একমাত্র ডিম ফুটে সদ্যোজাত শিশুরা বেরিয়ে সামান্য সময়ের জন্য এদিক ওদিক চলাফেরা করতে পারে। পরে তারা পছন্দসই গাছ খুঁজে বের করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। বাকি জীবনটা লম্বা সুচের মতো ঠোঁট গাছের বাকলে গুঁজে দিয়ে গাছের রস খেয়ে নিশ্চল হয়ে কাটিয়ে দেয়। এরা প্রচুর পরিমাণে রস পান করে। সেই রস জলীয় এক ধরনের তরল মধু শরীর থেকে ক্ষরিত করে ঘন করে নেয়। শোষিত হতে হতে গাছ ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। হোমোপ্টেরা শাখার অন্তর্ভুক্ত হল লাক্ষাকীট, এফিড কাউ বাগ, সিকাডা, মিলিবাগ, চাম ইত্যাদি।

হেটেরোপ্টেরা শাখার পোকারা উষ্ণ আবহাওয়ায় থাকতে পছন্দ করে, হোমোপ্টেরাদের কিন্তু শীতই পছন্দ। অনেকেই খাদ্যশস্য, তরিতরকারি ও ফলমূলের ক্ষতি করে। আর তা শুধু গাছের রস খেয়েই নয়। এদের লালা থেকে ভাইরাস ও নানা রোগজীবাণু ঢুকিয়ে দিয়ে গাছকে নির্জীব করে। সবচেয়ে বেশিই চোখে পড়ে এফিডদের। ছোট জীব, ডানাযুক্ত বা ডানাবিহীন। নরম ঘাসে, সবুজ তরকারিতে যেমন সিম, বরবটিতে, সর্ষে, মূলো, কার্পাস, গোলাপ, আকন্দজাতীয় গাছে গাদাগাদা থাকে। এদের কাছে সাধারণত আনাগোনা করে পিঁপড়ের দল, মধুর মতো মিষ্টি রসের জন্য, এফিডদের শরীরের গ্রন্থি থেকে যা ক্ষরিত হয়। পিঁপড়েরাই নিজেদের স্বার্থে এদের দেখভাল করে, শত্রুর আওতা থেকে বাঁচায়, প্রয়োজনীয় খাদ্য-গাছের সন্ধান দেয়। বদলে ওই রস পান করে। শুঁড় দিয়ে এফিডদের সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের শরীর থেকে ওই রস

বের করে। এফিডরা মিলন ছাড়াই সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। বহু প্রজন্ম ধরে দেখা যাবে তাদের মধ্যে কোনো পুরুষই নেই। মা এফিড এক্ষেত্রে ডিম পাড়ে না, কিন্তু জন্ম দেয় জরায়ুজ সন্তান। বেশ কয়েকটা প্রজন্ম পরে হয়তো দেখা যায় পুরুষ ও স্ত্রী উভয় এফিডই জন্ম নিয়েছে। পুরুষ ও নারী এফিডের ডানা আছে। এইরকম কিছু পুরুষ ও নারী এফিড বিভিন্ন গাছে উড়ে যায়। সেখানে তারা মিলিত হয়। স্ত্রী এফিড হয়ত একটা মাত্র ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম থেকে ডানাহীন স্ত্রী এফিড বেরোয়। সেই স্ত্রী এফিড বড় হয়ে জরায়ুজ সন্তানের জন্ম দেয় পুরুষের সঙ্গে মিলন ছাড়াই। অনেক সময় স্ত্রী এফিড তার জন্মের তিন চারদিন বাদেই সন্তান প্রসবে সক্ষম। সমতলের এফিডরা জরায়ুজ উপশাখা। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ ও হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই দেখা মেলে। এদের অনেক শত্রু—পাখি, গয়ালপোকা, মাছি, হাইমেনোপ্টেরাস পরজীবি ইত্যাদি।

সিকাডারা আকারে বড়। এরা থাকে বনে-জঙ্গলে। বৈশিষ্ট্য হল, দীর্ঘকাল ধরে এদের শৈশবাবস্থা চলে। শিশু সিকাডা 'নিম্ফ' মাটি খুঁড়ে গাছের শিকড়ের রস চুষে খায়। ধীরে ধীরে পূর্ণতা পায়। সময় লাগে তেরো থেকে সতেরো বছর। কি আরও বেশি। কিন্তু পূর্ণতা প্রাপ্তির পর বেঁচে থাকে মাত্র কয়েক সপ্তাহ। খাবারের জন্য এরা গাছের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। বয়স্করা গাছের রস চুষে খায়। নানা বর্ণের হয়, তবে শরীরে গাছের বাকলের মতো দাগ। কীটপতঙ্গের জগতে এদের খ্যাতি গাইয়ে বাজিয়ে হিসেবে। বিখ্যাত এদের দীর্ঘ তীব্র শিস। শুধু পুরুষ সিকাডা শিস দিতে পারে। স্ত্রী সিকাডা তা শুনতে পায়, কিন্তু সাড়া দিতে পারে না, কারণ তারা শব্দ করতে পারে না। বোধ হয় কবি তাই বলেছেন, 'পুরুষ সিকাডা সবচেয়ে সুখী প্রাণী কারণ তাদের স্ত্রীরা মূক।' তীব্র শব্দেব উৎস হল টিমপেনাম পর্দার দ্রুত কম্পন। টিমপেনাম শরীরের মধ্যে একটা ফাঁপা গর্তের মাথায় টানটান বসানো থাকে। উদ্ভূত শব্দ অনুরণিত হয়ে তীব্রতায় বাড়ে। ফাঁপা গর্তের ভেতরে যে বাতাস থাকে তাই আসলে বিশেষ কম্পাঙ্কে কম্পিত হয়। বিভিন্ন প্রজাতির সিকাডা বিভিন্ন রকম শব্দ করে। কর্কশ খরখর শব্দ করা থেকে তীক্ষ্ম মিষ্টি শিস পর্যন্ত। জঙ্গলের নানা গাছে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে সিকাডা যখন ঐকতান শুরু করে তখন বোঝাই যায় না কোন্ গাছ থেকে শব্দ আসছে। ঐকতানে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। সমতলে এদের দেখা পাওয়া যায় কম। অধিকাংশ থাকে পার্বত্য অঞ্চলে, হিমালয়ে। সবচেয়ে পরিচিত সিকাডা হল প্ল্যাটিপ্লুরা *(Platypleura)*। হয়তো দীর্ঘকাল যে জায়গায় এদের অস্তিত্বই ছিল না, সেখানে হঠাৎই দেখা গেল সিকাডা-র ভিড়, আবার হঠাৎই তারা হারিয়ে যায়। আসলে তখন তারা মাটির নিচে আত্মগোপন করে।

গুবরেপোকা

গুবরেপোকাদের শরীর শক্ত। সামনের ডানা কঠিন খোলার মতো। বলা হয় এলিট্রা। এলিট্রা ডানার কাজ করে না, পেছনের নরম স্পর্শকাতর ঝিল্লীময় ডানা রক্ষা করে। যখন কাজে লাগে না, তখন পেছনের ডানা গুটিয়ে থাকে এলিট্রার নিচে। গুবরেপোকা যখন ওড়ে, তখন এলিট্রাও খুলে যায়, কিন্তু ওড়ার কাজে বা এগোনোর কাজে তা সাহায্য করে না। সামান্য কিছু প্রজাতি ছাড়া অধিকাংশই শক্ত খাবার কামড়ে চিবিয়ে খায়। প্রধান খাদ্য হল পাতা, কুঁড়ি, ফুল, ফল, বাদাম, বীজ, গাছের কাণ্ড, কাঠ, পচনশীল ও মৃত জৈব পদার্থ, এমনকি জীবন্ত প্রাণীও।

এদের দেহের দৈর্ঘ্য 0.25 মিলিমিটার থেকে 15 সেন্টিমিটার কি তারও বেশি হয়। রং সাধারণত বাদামি, কালো, লাল, হলুদ, চকচকে ধাতব সবুজ, নীল, তামাটে লাল। অনেক সময়েই থাকে গায়ে সুন্দর ফুটকি বা ডোরা। বেশির ভাগই মাটির ওপর দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত দৌড়তে পারে। অনেকে আবার মাটি খুঁড়ে গর্ত করে তার মধ্যে বাস করে। অন্যদের বাস ঝোপে ঝাড়ে গাছপালায়। কেউ কেউ আবার জলে ডুব দিতে পারে, সাঁতার কাটতে পারে। এদের শূককীট নানা ধরনের ও নানা প্রকৃতির হয়। এবং আদল একেবারেই পালটায় পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটলে।

গুবরেপোকা জাতীয় কীটপতঙ্গকে কোলিঅপ্টেরা *(Coleoptera)* বলা হয়। পৃথিবীতে বর্তমানে এরাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। শাখার মধ্যে উপশাখা বহু। সবরকম জলবায়ুতেই এরা দিব্যি টিকে থাকতে পারে—উষ্ণ অঞ্চলে, মেরু অঞ্চলে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে, সমুদ্রতীরে, এমনকি হিমালয়ের শিখর-ছায়ায়, খোলামাঠে, গুহায়, পুকুরে, নদীতে, উষ্ণ ও শীতল ঝর্ণায়, সর্বত্র।

বেশ কিছু পোকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে। কিছু শস্যক্ষেত্রের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত করে, সংরক্ষিত ফসল ধ্বংস করে, কাঁচামাল ও তৈরিমাল নষ্ট করে। মূল্যবান ওষুধপত্র যেমন ক্যান্থারাইডিন বানাতে কিছু পোকা কাজে লাগে। কিছু ব্যবহৃত হয় শিল্পকর্মে ও গয়না তৈরির কাজে। কিছু কাজে লাগে আমাদের দেশে ও অন্যত্র ফলমূলের গাছ ধ্বংসকারী কীটদের বিনষ্ট করতে।

কলিওপটেরা প্রজাতির আছে জটিল শাখা উপশাখা। আছে পরিবার উপ-পরিবার। পরিচিতি অথচ অদ্ভুত পোকার তালিকায় রয়েছে সিসিনডেলিড্ বা টাইগার বীটল, ক্যারাবিড বা সাধারণ গুবরেপোকা, স্ক্যারাবিড্, গয়াল, ফোসকাপোকা, জোনাকি, টিকটিক শব্দকরা পোকা, ধাতব কাঠ-খোদাই পোকা, স্ট্যাগহর্ন বীটল, পাতাপোকা, তালপোকা, উইভিল।

বাঘপোকা বা সিসিনডেলিড প্রজাতি মাটির ওপর শিকার ধরতে খুবই দক্ষ। এরা কোলিঅপ্টেরা শ্রেণীর সবচেয়ে পরিচিতি সদস্য। রং উজ্জ্বল সবুজ, বাদামি বা কালো, তার ওপর সাদা ডোরা বা ফুটকি। দৈর্ঘ্য এক থেকে দুই সেন্টিমিটার, বড় বড় ড্যাবডেবে চোখ। সরু লম্বা আঁকাবাঁকা পা, যাতে সহজে বালি বা মাটির ওপর দিয়ে দৌড়ে পালানো যায়। যদিও এরা উড়তে পারে তবুও মাটির ওপর দ্রুত চলাফেরা করে

শিকার ধরতেই এদের উৎসাহ বেশি। ভিজে সোঁদা মাটিতে, নদীর ধারে, ধানক্ষেতে ও সমুদ্রতীরে এদের দেখা যায়। সিসিনডেলিড—এর শূককীট মাটির ভেতর লম্বা গর্ত খুঁড়ে বাস করে। সম্পূর্ণ পূর্ণতা পেতে এদের সময় লাগে এক বছর কি তার বেশি। পূর্ণাঙ্গ অবস্থার মতো শূককীট অবস্থাতেও এরা সুড়ঙ্গর মুখে হঠাৎ এসে যাওয়া ভক্ষ্য কীটপতঙ্গকে আচমকা আক্রমণ করে। সিসিনডেলা সেক্সম্যাকুলাটা *(Cicindela sexmaculata)* বা ছয়দাগবিশিষ্ট বাঘপোকা থাকে ধানক্ষেতে। ধানের পোকা লেপ্টোকরিক্সা ভ্যারাইকরনিস *(Leptocorixa variicornis)* এদের প্রধান খাদ্য। পরোক্ষভাবে এরা তাই কৃষকদের বন্ধু। পশ্চিম ভারতের সমুদ্রতীরে চারদাগবিশিষ্ট বাঘপোকা গোষ্ঠীর সিসিনডেলা কোয়াড্রিলিনিয়েটা *(Cicindela quadrilineata)* দেখা যায়। এরা সামুদ্রিক কীট মেরিন বাগ *(Holobates)* খেয়ে জীবন ধারণ করে। হোলোবেটিস তীরে ভেসে আসে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে।

ক্যারাবিড থাকে মাটিতে। পারতপক্ষে, দায়ে না পড়লে, ওড়ে না। অবশ্য বেশির ভাগের ডানাই অব্যবহারে জুড়ে থাকে পিঠের সঙ্গে, এমনভাবে যে খোলা যায় না। সামনের ডানাজোড়া অচল, পেছনের ডানাজোড়া নেই। কাজেই মাটির ওপর দৌড়ে শিকার ধরা ছাড়া উপায় কি? এদের প্রধান খাদ্য হল শুঁয়োপোকা, ফড়িং আর শামুক। অ্যানথিয়া সেক্সগাটাটা *(Anthia sexguttata)* বা বৃহৎ ছয়দাগা বাঘপোকা কালো। ভারতের সমতলভূমিতে দেখা যায়। একেবারেই ডানাবিহীন এরা। এদের ধরে রেখে দেখা গেছে, দিনে এরা একশো থেকে দুশো ফড়িং খায়। ক্যালোসোমা *(Calosoma)* আর এক ক্যারাবিডের উপশাখা। বেশ বড়সড়, ডানাহীন। রং সুন্দর ইস্পাত নীল বা চকচকে তামাটে লাল। এরা শামুক ও পঙ্গপাল খায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপশাখা হল সৈনিক বম্বার্ডিয়ার বীটল, বিশেষত ফেরপসোফাস *(Pheropsophus)*। এদের ভয় দেখালে বা বিরক্ত করলে এরা মলদ্বার দিয়ে জোর শব্দ করে এক রকম দুর্গন্ধযুক্ত উদ্বায়ী তরল নির্গত করে শত্রুপক্ষকে হতভম্ব করে পালিয়ে যায়।

ছোট নিচু ঝোপে চোখে পড়ে সুন্দর দেখতে গয়ালপোকা। এদেশে এরা বেশ কয়েক রকমের হয়। তবে সকলেরই আকৃতি প্রায় গোল বা ডিমের মতো, গায়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম রোম; হলুদ, লাল, বাদামি ও কালো রংয়ের ফুটকি সারা শরীরে। সাতদাগবিশিষ্ট গয়াল অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। বৈজ্ঞানিক নাম কক্সিনেলা সেপটেমপাঙ্কটাটা *(Coccinella septempunctata)*। নিবাস সমতলভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল এমন কি হিমালয়ের উঁচু দুর্গম স্থানেও। রং লাল, গায়ে সাতটা ছোট বড় নানা আকারের কালো ফুটকি। পূর্ণাঙ্গ ও শূককীট উভয় অবস্থাতেই এই পোকা বিভিন্ন ধরনের এফিড খেয়ে জীবন ধারণ করে। এদের অনেককে দলবদ্ধভাবে হিমালয়ে তুষারঢাকা অঞ্চলে অনেক সময় পাওয়া যায়। ঝাঁকে থাকে প্রায় কুড়ি লক্ষেরও বেশি। সমতলের আর এক ধরনের পরিচিত গয়াল হল ছয় ডোরাবিশিষ্ট কাইলোমেনেস *(Chilomenes)*। ছোট হলুদ বা লালচে রংয়ের পোকা, দেহের ওপরে ঢেউয়ের মতো বাঁকা বাঁকা কালো ডোরা। এরাও এফিড খায়। দিনে একটা পোকা প্রায় দুশো এফিড় খায়। বেগুন গাছের পাতায় থাকে এপিল্যাচনা *(Epilachna)*, অন্যতম বড় আকারের গয়াল। ম্যাড়মেড়ে

লালচে বাদামি রং। এপিল্যাচনা ডুওডেকাস্টিগমাতে *(Epilachna duodecastigma)* রয়েছে বারোটা ফুটকি আর এপিল্যাচনা ভিজিনটক্টোপাঙ্কটাটায় *(Epilachna vigintocto-punctata)* আটাশ। গাছের পাতায় একসঙ্গে একাধিক হলুদরঙা ডিম পাড়ে। শূককীট ডিম থেকে বেরিয়ে ওই পাতারই তন্তু খায়।

পরিচিত গ্লোওয়র্ম আর ফায়ারফ্লাই দুটো বিভিন্ন জাতের জোনাকি। গ্লোওয়র্ম শূককীট বা পূর্ণাঙ্গ কীটের মতো দেখতে ডানাহীন স্ত্রীজাতি আর ফায়ারফ্লাই *(Firefly)* হল আকারে ছোট কিন্তু ডানাযুক্ত পুরুষ। ভারতের সর্বত্রই দেখা যায় এদের, তবু বিশেষভাবে নজরে পরে আর্দ্র অঞ্চলে, পাহাড়ের পাদদেশে, বর্ষাকালে সমতলভূমিতে। গ্লোওয়র্ম তিন সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা, চ্যাপ্টা, গায়ে খাঁজকাটা পাতলা বর্মের মতো আবরণ, অষ্টম খাঁজে পেটের কাছে সাদা ডিমালো ছাপ। ছাপটা উজ্জ্বল, পোকাটার ইচ্ছেমতো উজ্জ্বল আলো বেরোয়। আলো ফ্যাকাশে সাদাটে-সবুজ আর ঠান্ডা। চট্ করে জ্বলে ওঠে কিন্তু নিভে যায় আস্তে আস্তে। বুঝতেই পারা যাচ্ছে, এরা নিশাচর। ছোট নরম শামুক, গুগলি এদের খাদ্য, দিনে প্রায় ছটা করে খায়। পা দিয়ে ছোট শামুক ধরে, তাদের পিঠের ওপর চেপে বসে, মাংস কুরে কুরে খায়। তবে মাংস খাবার সময় আলো জ্বালায় না।

জঙ্গলের বড় বড় গাছে দেখা যায় অপূর্ব সুন্দর মণিপোকা পণ-ভাণ্ডু *(Pon-vandu)*। এরা আকারে বড়, চকচকে সবুজ রঙের পোকা। গায়ে লালচে আলোর প্রতিফলন। অনেক সময় দুর্লভ পণ্য হিসেবে পথেঘাটে বিক্রী হয়। এদের উজ্জ্বল দ্যুতিময় ডানা রত্ন ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে পরিচিত হল ক্রাইসোক্রোয়া *(Chrysochroa)*। এদের আবার প্রায় কুড়িটা উপশাখা। শূককীট গাছের গুঁড়ি ফুটো করে ভেতরে ঢুকে যায়। পূর্ণাঙ্গ হতে প্রায় এক বছর লাগে।

আর একটা সুন্দর রংচঙে বীটল হল অ্যাগ্রিপনাস *(Agrypnus)*। থাকে জঙ্গলে। বর্ষাকালে বাইরে বেরোয়। নাম টিকটিক শব্দকরা পোকা। বেশির ভাগেরই দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটার; অবশ্য কিছু কিছু প্রজাতি তিনগুণ লম্বা। সবাই চ্যাপ্টা ধরনের। পায়ের ফাঁকে পেটের নিচে মোটা শিরদাঁড়ার মতো বাঁকানো অংশ আছে। সেটা জোড়া থাকে পেছনে ছোট্টি ঢালু মতো জায়গায়। যদি কখনও হঠাৎ এরা উল্টে যায় তাহলে এই দেহাংশ চালু করে এরা শূন্য লাফিয়ে উঠে। অদ্ভুত শব্দ করে আবার সোজা হয়ে যায়। এদের শূক্কীট লম্বা তারের মতো দেখতে। ওয়ার-ওয়র্ম বলে। গাছের শিকড় খেয়ে এরা প্রাণ ধারণ করে।

বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ফোসকাপোকা বা ক্যান্থারাইড *(Cantharides)*। সাধারণত এরা বড় মাপের, পছন্দ করে প্রখর সূর্যালোক। হঠাৎ হঠাৎ দল বেঁধে প্রথম বর্ষার পর উদয় হয়। আবার পরের বর্ষাকাল পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যায়। আমাদের দেশে ফোসকাপোকার অনেকগুলি প্রজাতি দেখা যায়। মাইলাব্রিস পাসটুলাটা *(Mylabris pustulata)* হল বড় লাল-কালো ডোরাকাটা প্রায় আড়াই সেন্টিমিটার লম্বা বীটল। এরা খায় পরাগরেণু আর হলুদ রঙের ফুলের পাপড়ি। কখনও বা কমলা আবার কখনও হালকা নীল ফুলের পাপড়ি ও পরাগরেণু খায়। কুমড়ো, লাউ, ক্যাকটাস প্রিয় খাদ্য।

মাইলাব্রিস ফ্যালেরাটা *(Mylabris phalerata)* আকারে আগের বীটলের অর্ধেক, কিন্তু স্বভাবে একই রকম। এছাড়া আছে নীল এপিক্যটা অ্যাকটিওন *(Epicauta actaeon)*, ধাতব সবুজ এপিক্যটা টেন্যুইকলিস *(Epicauta tenuicollis)*, বড় বাদামি ন্যাথোস প্যাথোয়েডস রুক্সি *(Gnathos-pathoides rouxi)*। পরাগরেণু, ফুলের পাপড়ি, ধানের কচি আগা, দুর্বাজাতীয় নরম ঘাস খায় এরা। বিরক্ত করলে পায়ের জোড় থেকে এক রকম তৈলাক্ত তরল বিন্দু নির্গত করে, যার রং হলুদ বা কমলা। মানুষের দেহের সংস্পর্শে এলে এই তরল পদার্থ চামড়ায় ফোস্কার সৃষ্টি করে। এদের শুকনো মৃতদেহের গুঁড়ো ক্যান্থারাইডিন নির্যাসে ব্যবহার করা হয়। নির্যাস ওষুধে ও চুলের তেল তৈরীতে কাজে লাগে। শীত পড়ার আগে এরা মাটিতে ডিম পাড়ে। শূককীট পূর্ণতা পায় ধীরে ধীরে, এদের খাদ্য ফড়িং ও হাইমেনপ্টেরা জাতীয় মৌমাছির ডিম। ফড়িং ও মৌমাছির পিঠে চেপে তাদেরই আস্তানায় হানা দেয়।

উইভিল বা তুণ্ড পোকাদের সব মিলিয়ে প্রায় একশোর বেশি উপশাখা। মাথা সামনের দিকে ঠোঁটের মতো। অধিকাংশই আকারে ছোট, শুধু কোকোনাট উইভিল আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। এই জাতের স্ত্রীপতঙ্গ নারকেল গাছের পাতার শীষের গোড়ায় ডিম পাড়ে। বিশেষত কাটা জায়গায়। ডিম ফুটে শূককীট বেরিয়ে পাতার নরম তন্তুর ভেতরে সুড়ঙ্গ করে ঢুকে নিজের চারপাশে ওই তন্তু থেকেই গুটি তৈরি করে। এতে গাছের ক্ষতি হয়, গাছ শেষ পর্যন্ত মারাও যায়। দক্ষিণ ভারতে ক্ষতিটা বেশি। সবচেয়ে বড় উইভিল হল সিরটোট্র্যাকিলাস লংগিমেনাস *(Cyrtotrachelus longimanus)*। এর পুরুষ পতঙ্গের সামনের পা অত্যন্ত লম্বা, এমনকি দেহের দৈর্ঘ্যের থেকেও বেশি। বাঁশের অঙ্কুর খায়। শূককীট বাঁশঝাড় ফুটো করে ভেতরে ঢুকে যায়।

সবচেয়ে অদ্ভুত কোলিওপটেরা হল ডাংরোলার বা স্কারাব জাতীয় গুবরেপোকা। এদের কথা আগেই আমরা আলোচনা করেছি। স্কারাব বড় আকারের মাটিতে বসবাসকারী গুবরেপোকা, রং সাধারণত চকচকে কালো বা বাদামি, মাথাটা বেলচার মতো। অনেক সময় মাথার ওপর সামনের দিকে অদ্ভুত দেখতে শিং থাকে। এরা যদিও উড়তে পারে তবু মাটিতে চলাফেরা করতেই পছন্দ করে। দ্রুতগামীও। অন্যান্য কীটপতঙ্গের মতো শয়ে শয়ে বা হাজারে হাজারে ডিম পাড়ে না, ডিম পাড়ে সংখ্যায় একটা বা দুটো। তবে এদের বাৎসল্য এতই প্রবল যে শত্রুপক্ষের কবল থেকে প্রাণপণে শিশুকে রক্ষা করে। এদের ডাং-রোলার বলা হয় এইজন্য যে এরা গরুভেড়ার গোবরবিষ্ঠা দলা পাকিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ গুবরেপোকা দূর থেকে তৃণভোজী প্রাণীর বিষ্ঠা বা গোবর দেখলেই আকৃষ্ট হয়। এর ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। হঠাৎ দেখা যায় হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে বেলচার মতো মাথা দিয়ে কিছু গোবর বা বিষ্ঠা তুলে নিয়ে গুলি পাকিয়ে পা দিয়ে ঠেলছে। গুলিটা পেছনের দিকে ঠেলতে থাকে, পেছনের পা দিয়ে, এবং নিজেও পিছু হটতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় দুটো গুবরেপোকা একই সঙ্গে কাজ করছে; একজন বিষ্ঠার গুলিটা পেছনে ঠেলে দিচ্ছে আর অন্যজন তা টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে অনেক দূর এমনকি আধ কিলোমিটার পর্যন্ত পথ এরা অতিক্রম

করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় একাধিক গুবরেপোকা বিষ্ঠার গুলির অধিকার নিয়ে রেষারেষি করছে। গুলি সবাই পাকায় ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি দখলের চেষ্টায় ক্ষান্তি নেই। সবচেয়ে বলশালী বা সবচেয়ে চালাক ও ভাগ্যবান গুবরেপোকাই অবশ্য এটা হাতাতে সমর্থ হয়। বহু সময় আবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধও চলে সাংঘাতিক। যে মুহূর্তে মালিক গুবরেপোকা অসতর্ক হয়ে নজরছাড়া করল, সেই ফাঁকে গুলিটা গেল চুরি হয়ে। গুলির আয়তন পোকার আয়তনের তুলনায় অনেকটাই বড়, প্রায় তিনগুণ। পছন্দসই জমি খুঁজে বার হলে অত্যন্ত দ্রুত মাটি খুঁড়ে গুবরেপোকা গুলিটা তার মধ্যে রাখে ও মাটি চাপা দেয়। সামনের পা দিয়ে এরা মাটি খোঁড়ে, পেছনের পা দিয়ে খোঁড়া মাটি সরিয়ে দেয়। গুলিটা পুঁতে রাখে দেড় মিটার নিচে। গুবরেপোকার মতো ছোট্ট প্রাণীর পক্ষে এটা সত্যিই অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ও শক্ত কাজ। কবরস্থ বিষ্ঠার গুলির ওপর গুবরেপোকা ডিম পাড়ে। শূককীট ওই বিষ্ঠা খেয়েই বড় হয়। গুটি বাঁধবার আগে শূককীট প্রায় এক বছর কি আরও কিছু বেশি সময় এইভাবে বাড়ে। ভারতে অনেক রকম ডাং রোলার দেখা যায়; এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হল হেলিওক্‌পরিস ব্যুকেফ্যালাস *(Heliocopris bucephalus)* ও হেলিওক্‌পরিস গাইগাস *(Heliocopris gigas)*—এক বা দুই শিং বিশিষ্ট অতিকায় গুবরেপোকা। আর আছে স্কারাবিয়াস গ্যাঞ্জেটিকাস *(Scarabaeus gangeticus)* ও সিসিফাস *(Sisyphys)*—এদের পা অত্যন্ত লম্বা। গণ্ডারপোকা খুব অদ্ভুতরকম স্কারাবিড *(Scarabaied)* বা বড়সড় পোকা। এদের রং বাদামি বা কালো। পুরুষ পোকার মাথায় ঠিক গণ্ডারের মতো শিং। সমতলভূমিতে থাকে, যেখানে যেখানে নারকেল গাছ আছে সেখানে। পূর্ণাঙ্গ পোকারা রাতে ওড়ে। নারকেল গাছের কচি পাতার ডগা খায়। গাছের পাতা তাই ফুটো ফুটো হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, গাছ এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে গাছের বৃদ্ধি একেবারে নষ্ট। গাছ মরেও যায়। এদের শূককীট সারের গর্তে থাকে, পচনশীল আনাজ গাছপালা খায়। একটা সুন্দর উপশাখা হল সেটনিড্‌স বা শেফার জাতীয় গুবরেপোকা। আকার মাঝারি, চকচকে ধাতব রংয়ের। দিনের বেলায় গাছের ফুলে ফুলে নরম পাপড়ি আর পরাগরেণুর সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। পচনশীল শাকসবজি গাছপালায় এদের ডিম ফুটে শূককীট বেরোয়। গাছের শিকড়েও বাড়ে। পিঁপড়ের গর্তে এদের বাস। নারিসিয়াস *(Naricius)* ও রম্ববইনা *(Rhomborhina)* হল দুটো পরিচিত ধাতব-সবুজ রংয়ের সেটনিডস্‌, বনে জঙ্গলের কাছেপিঠে যাদের প্রায়শই চোখে পড়ে।

বোলতা আর ভীমরুল

বোলতা আর ভীমরুলের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে আসে হুল ফোটানোর জ্বালা আর নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার জন্য বোঁ বোঁ শব্দ। কিন্তু নিজেরা আক্রান্ত না হলে পারতপক্ষে এরা কখনই শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করে না। এদের হিংস্রতা শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য। নইলে একেবারেই নিরীহ। আপনমনে থাকে।

ডিম ও শূককীটের জন্য নিরাপদ বাসা বানায়, খাবার সংগ্রহ করে, শিশুপালন করে। মানুষকে জ্বালাতন করে না। কিন্তু একবার ওদের বিরক্ত করেছ কি শয়ে শয়ে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হুল ফুটিয়ে দেবে। এমন জ্বালা যা জীবনে ভুলবে না। অনেক ব্যাপারেই অন্যান্য কীটপতঙ্গের থেকে এরা আলাদা। বেশির ভাগ কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিশু অবস্থায় তারা খাবার খেয়ে বড় হয়, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কীটপতঙ্গ সন্তানের জন্ম দিয়েই বা ডিম পেড়েই মারা যায়, বাঁচার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। কিন্তু বোলতা বা ভীমরুল জাতীয় পতঙ্গের ক্ষেত্রে জীবনযাপনের সম্পূর্ণ দায় বহন করে বড়রা। শূককীট একে বারেই অসহায়, বড়দের ওপরই নির্ভরশীল। শূককীট শিকার করে না, খাদ্য সংগ্রহ করে না, গুটিপোকা বানায় না—কিছুই করে না। এমন কি বাইরেও বেরোয় না। সব রকম কাজের দায়িত্ব পূর্ণবয়স্কের।

বোলতা ও ভীমরুল হাইমেনেপটেরা প্রজাতির। আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের বোলতা বা ভীমরুল রয়েছে। সঙ্গীহীন অবস্থায় অনেকে জীবনযাপন করে, অন্যেরা আবার সমাজবদ্ধ জীব। বোলতাদের সমাজে থাকে রাণী, শ্রমিক ও পুরুষ। অনেক বোলতা খোঁড়াখুঁড়িতে দক্ষ; কেউ কেউ পাথর কেটে সুড়ঙ্গ বানায়; আবার কেউ কাদা, কাঠ, কাগজ দিয়ে তৈরি করে বাসা।

ভারতে যেসব সমাজবদ্ধ বোলতা দেখা যায় তাদের মধ্যে ভেসপা ওরিয়েন্টালিস *(Vespa orientalis)* এবং পলিস্টেস হেব্রেউস *(Polistes hebraeus)* উল্লেখযোগ্য। প্রথম প্রজাতি আকারে অপেক্ষাকৃত বড়, হলুদ বা লালচে রঙের; আর দ্বিতীয়টার রং মধু-হলুদ, আকারেও ছোট। উভয়েই বহু সন্তান ধারণে সক্ষম। তাদের সমাজে দেখা যায় বহু অসম্পূর্ণ স্ত্রী বা শ্রমিক, অনেক স্বাভাবিক স্ত্রী বা রাণী, এবং পুরুষ। আপাত হিংস্রতা আর হুল বেঁধানোর তীব্রতার ভয়েই সম্ভবত ভারতে এদের নিয়ে বিশদ গবেষণা হয়নি। কাগজ দিয়ে এরা চিরুণীর মতো বাসা তৈরি করে গাছের ডালে, পাথরে, পরিত্যক্ত বাড়িতে। সারাদিন ধরে অক্লান্তভাবে কাজ করে গাছের শুকনো কাণ্ডে, কাঠের থামে। লালা দিয়ে ভিজিয়ে কাঠের পাতলা টুকরো ও ছোট ছোট আঁশ বের করে। ভালো করে তা চিবিয়ে মণ্ডের মতো তৈরি করে, তার থেকে ছয় কোণা সব জ্যামিতিক কোষ্ঠ বা কুঠুরি বানায়। এগুলো নিচের দিকে খোলা, আর ঝুলে থাকে। মোটা দন্তের ওপর অনুভূমিক কোষের সমষ্টি দেখতে ঠিক চিরুণীর মতো। চিরুণীগুলো একটার নিচে আর একটা ঝোলে। ভেসপারা পুরো বাসা একটা পাতলা কাগজের খামে ঢাকা দিয়ে রাখে। অবশ্য চারধারে এমনভাবে ফাঁক রাখে যাতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে এবং শ্রমিকরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে। অনেক সময় বাসার ব্যাস 75 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। বাসার ওজনে মোটামোটা গাছের ডালও ঝুলে পড়ে। বোলতাদের প্রধান খাদ্য হল শুঁয়োপোকা, প্রেইং ম্যানটিড, ছারপোকা, গঙ্গা ফড়িং, গুবরেপোকা, মরা সাপ ও অন্যান্য প্রাণীর মাংস। ফলের রস, ঘন মিষ্টি রস, নানারকম মিষ্টি চিনি ইত্যাদিও খুব পছন্দ করে। দেখা যাবে ঝাঁকে ঝাঁকে এরা আমাদের বাজারের মিষ্টির দোকানে চড়াও হয়েছে। শ্রমিকরা মাংস সংগ্রহ করে আনলে এরা তা বাচ্চাদের গুঁড়ো নরম করে খেতে দেয়।

মৌমাছি

মৌমাছিরা ভারতে অত্যন্ত পরিচিত। স্মরণাতীত কাল থেকে। মধুপায়ী মৌমাছি সমাজবদ্ধ জীব, কিন্তু সব মৌমাছি তা নয়। এমন অনেক মৌমাছি আছে যারা একা থাকতেই ভালবাসে। সব জাতের মৌমাছি কিন্তু ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে না। মধুর চাকও করে না। কিন্তু সব জাতের মৌমাছিই পরাগরেণু সংগ্রহ করে। ভারতে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হল মধুপায়ী মৌমাছি, মিস্ত্রি মৌমাছি, আর ভোমরা।

যে তিন রকম মধুপায়ী মৌমাছি এদেশে আছে তাদের মধ্যে অ্যাপিস ডরসাটা *(Apis dorsata)* আকারে সবচেয়ে বড়। এদের বাসার মাপও সবচেয়ে বড়। গাছে, ঝোলা পাথরের খাঁজে, উঁচু বাড়িতে এরা চিরুনী-বাসা বানায়। বন থেকে এই জাতীয় মৌমাছির বাসা থেকেই মধু সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করা হয়। অ্যাপিস ইণ্ডিকা *(Apis indica)* আকারে মাঝারি, আংশিকভাবে গৃহপালিত। কাঠের কাঠামোয় ছোট ছোট খুপরি বানিয়ে এদের পালন করা হয়। সবচেয়ে ছোট আকারের মৌমাছি হল অ্যাপিস ফ্লোরিয়া *(Apis florea)*। ঝোপে ঝাড়ে এরা ছোট ছোট চিরুণীর মতো বাসা বানায়। মধুপায়ী মৌমাছি ফুল থেকে পরাগরেণু ও মধু সংগ্রহ করে। অংশত এই মধু বিশেষ রকম সংরক্ষক জৈব-যৌগের সাহায্যে মৌমাছি হজম ও ঘন করে। সমস্ত রকম শর্করা এই প্রক্রিয়াতে গ্লুকোজে পরিণত হয়। শ্রমিক মৌমাছিরা এবার পাকস্থলী থেকে মধু উগরে দেয় মোমের কোষের মধ্যে। কোষগুলো মোমের টুপি পরানো। সিল করে বন্ধ করা। মৌমাছি ও তার শূককীট মধু ও পরাগরেণু খেয়েই জীবনধারণ করে।

পরিচিত মিস্ত্রি-মৌমাছিরা অতিকায় ও অসামাজিক। এরা জাইলোকোপা *(Xylocopa)* প্রজাতির। এরা বাস করে শুকনো শক্ত কাঠে সুড়ঙ্গ কেটে। গায়ের রং চকচকে কালো। পুরুষ পতঙ্গের গা আবার নরম হলুদ রোঁয়ায় ঢাকা। কাঠের খুঁটি আর কড়িবরগায় বাসা বাঁধে। এদের জিব বড়। শুধু পরাগরেণুই সংগ্রহ করে, মধু নয়। ফুলের পরাগমিলনে এরা যথেষ্ট সাহায্য করে। সারাদিন, এমন কি পূর্ণিমার রাতে ফুলে ফুলে পেছনে সামনে উড়ে বেড়ায়। প্রতি মিনিটে যায় ত্রিশ থেকে চল্লিশটা ফুলের কাছে।

ভোমরাদের দেখা যায় শুধুমাত্র হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে। এরা মাটির নিচে বাসা বাঁধে, পরাগরেণু সংগ্রহ করে। দেখতে মোটাসোটা, রোমশ। উজ্জ্বল লাল বা হলুদ রংয়ের।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রজাপতি ও মথ

ভারত হল রংবেরঙের প্রজাপতির দেশ, সূর্যস্নাত প্রকৃতির শোভা শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে প্রজাপতি। আর আছে সুন্দর সুন্দর মথ। শান্ত সন্ধ্যায় পরীর মত ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। প্রজাপতি ও মথ আমাদের সম্পদ। বর্ণবৈচিত্রে এরা মহান; স্বভাবে অধিকাংশই শান্ত, ক্ষতিকারক নয়। তবে প্রকৃতির রাজ্যে অপরিহার্য সদস্য। ফুলের পরাগমিলন এরাই ঘটিয়ে থাকে। সোজা কথায়, প্রজাপতি ও মথের বিনোদনের জন্যই ফুল ফোটে।

প্রজাপতি ও মথ অন্যান্য কীটপতঙ্গের থেকে আলাদা। কি গঠনবৈচিত্র্যে, কি বর্ণময়তায়। এদের ডানা বড় ও রঙিন; শুঁড় লম্বা, পাকানো। গায়ে আর ডানায় রং আসে ছোট ছোট চ্যাপ্টা, পাতলা স্পর্শকাতর এক ধরনের আঁশ সুষম সমন্বয়ে সাজানো থাকে বলে। বৈজ্ঞানিকদের মতে এরা হল লেপিডপ্টেরা প্রজাতি। ফড়িং, পঙ্গপাল বা আরশোলার মতো এরা প্রাচীন নয়।

লেপিডপ্টেরা একেবারেই বদলে যায় বাড়ার সময়। এদের ডিমগুলো ছোট—সুন্দর ভাস্কর্য। খাদ্য জমা করে গাছের পাতায় রাখে। ডিম ফুটে বের হয় শুঁয়োপোকা। শুঁয়োপোকা ডানাহীন, নরম শরীরের কীট। এদের গা কখনও রোমশ, কখনও বা মসৃন। রং সবুজ, বাদামি বা কালো। এদের রাক্ষুসে খিদে—গাছের পাতা, কুঁড়ি যা পায় তাই খায়। মোটা হয় খুব তাড়াতাড়ি। এর সঙ্গে তাল রেখে কয়েকবার খোলস বদলায়। পুরোপুরি বড় হবার পর এরা মন্থর ও অলস হয়ে যায়; খাওয়া বন্ধ করে, নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে সেখানে রেশমজাতীয় সুতোর গুটি তৈরি করে। শুঁয়োপোকার জমাট লালাই হল রেশম। গুটি তৈরি হলে এরা খোলাস বদলায়, তার ভেতরই আর একবার। এদের দেহ হয়ে যায় নরম। মোটেই নড়াচড়া করে না। মমির মত অবস্থাকে বলা হয় পিউপা। খায় না। পিউপার ওপরেই ভাবি প্রজাপতির পা, ডানার লক্ষ্মণ দেখা দেয়। বোঝা যায় না যদিও, আপাতদৃষ্টিতে চলৎশক্তিহীন গুটির ভেতরে ক্রমাগতই দ্রুত গঠনমূলক পরিবর্তন চলতে থাকে। নিরীহ শুঁয়োপোকা গুটির আড়ালেই রূপান্তরিত হয় অপূর্ব সুন্দর প্রজাপতিতে। হঠাৎই একদিন, আগাম জানান না দিয়েই, গুটি কেটে প্রজাপতি জাঁকালো ডানা মেলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে, এবং কাছের কোন ফুলে উড়ে যায়।

প্রজাপতি ও মথকে প্রায়ই গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে এরা আলাদা। অধিকাংশ প্রজাপতি দিনের বেলায় ওড়ে, মথ নিশাচর। প্রজাপতির শুঁড় দীর্ঘ, আগার দিকটা পাকানো; মথের শুঁড়ে আছে পালক, নানা শাখা প্রশাখা, কখনই পাকানো নয়। প্রজাপতিরা সাধারণত ডানা সম্পূর্ণ তুলে বা সম্পূর্ণ বিছিয়ে বসে, মথেরা ডানা হেলিয়ে বা ধড়ের উপর হাতের মত ভাজ করে বসে। বেশির ভাগ প্রজাপতির পেছনের ডানা ওড়বার সময় সামনের ডানার সঙ্গে বড় হয়ে খাপে খাপে জুড়ে যায়, মথের বেলায় সামনের ও পেছনের ডানা ওড়বার সময় সরু সরু শক্ত রোম দিয়ে সংযুক্ত থাকে।

প্রজাপতি ও মথ দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে নিয়মিত বহুদূর পর্যন্ত উড়ে যায়। ভারতে এরা হয় দলে দলে পাহাড় থেকে সমতলভূমিতে নেমে আসে, নয় সমতলভূমি থেকে পাহাড়ে উঠে যায়। প্যাপিলিও ডিমোলিয়াস *(Papilio demoleus)*, ডানায়ুস প্লেক্সিপাস *(Danaus plexippus)*, ড্যানায়ুস লিমনিয়েস *(Danaus limniace)*, ইউপ্লিয়া কোর *(Euploea core)* আর ক্যাটোপসিলা *(Catopsila)* কয়েকটা ভবঘুরে প্রজাতি। এদের রং, আকার, দাগ নানা রকমের। অবশ্য সেটা নির্ভর করে লিঙ্গভেদের ওপর, শুঁয়োপোকার খাদ্য-গাছের প্রকার ভেদের ওপর, আবহাওয়া ও ভৌগলিক পরিবেশের ওপর। তাই বর্ষাকালের প্রজাপতি আর শুষ্ক আবহাওয়ার প্রজাপতির রকমফের হয়। তাই আগেকার দিনে তাদের বিভিন্ন প্রজাতির বলে মনে হত।

প্রজাপতি

ভারতে পরিচিত প্রজাপতিরা হল: 1. ডানাইড *(Danaids)*, 2. স্যাটিরিড *(Satyrids)*, 3. অ্যামাথুসিড *(Amathusids)*, 4. নিমফ্যালিড *(Nymphalids)*, 5. লাইকেনিড *(Lycaenids)*, 6. প্যাপিলিও বা সোয়ালো-টেল *(Papilios or Swallow-tail)*, 7. পাইরিড *(Pierids)*, 8. স্কিপার *(Skipper)*। সবই হেস-পেরাইডস জাতীয়।

ড্যানাইড

ড্যানাইডরা ধীরে ওড়ে। এদের শুঁয়োপোকার গা মসৃণ, রঙিন ডোরা কাটা; আছে দুটো কি চারটে মাংসল শিং। এরা ডুমুর, করবী, আকন্দ, ভিনকা ও অন্যান্য রসক্ষরণকারী গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। গুটির রং উজ্জ্বল সবুজ, সোনালী বা রূপালী ফুটকিতে ভরা। উলঙ্গ গুটি রেশম গদির সাহায্যে গাছের পাতা থেকে উল্টোমুখে ঝোলে।

ড্যানোস ক্রাইসিপাস ও ড্যানোস প্লেক্সিপাস

তামাটে রঙের ওপর কালো ছিটছিট দেওয়া প্রজাপতি। ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বর্মার সর্বত্র এদের দেখা যায়। সারাদিন ধরে এরা ফুলে ফুলে ঝোপেঝাড়ে উড়ে বেড়ায়। রাত হলে ঘাসের বোঁটায় বসে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। ড্যানোস ক্রাইসিপাস *(Danaus*

chrysippus) ভারত ছাড়া সুদূর উত্তর আফ্রিকা, গ্রীস, চীন ও মৌলবৈসেও দেখা যায়। ইউপ্লিয়া *(Euploea)* কালো রঙের, নীল ও সাদা রঙের নকশাকাটা। অত্যন্ত অলস। ইউপ্লিয়া কোর *(Euploea core)*, ইউপ্লিয়া ক্রাসা *(Euploea crassa)* ও ইউপ্লিয়া মালসিবার *(Euploea mulciber)* তিনটে বহুল পরিচিত প্রজাতি।

স্যাটিরিড

সাধারণত ফ্যাকাশে বাদামি রঙের। ডানার ওপর ঠিক চোখের মতো দাগ। শুঁয়োপোকারা সবুজ, বাদামি, গোলাপী বা হলুদ। খাদ্য প্রধানত ঘাস। মাটি ঘেঁষে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ওড়ে। ফুলের নজর কাড়া নয়। সাধারণত মদ, পচনশীল ফল, গেঁজিয়ে ওঠা দ্রব্যাদি পছন্দ। মাইকেলেসিস *(Mycalesis)*, লেথি *(Lethe)*, ম্যানিওলা *(Maniola)*, ইরিবিয়া *(Erebia)* ও মেলানিটিস *(Melanitis)* এই প্রজাতির।

অ্যামাথুসিড

সাধারণত বড় আকারের, মলিন রঙের—খুব কমই উজ্জ্বল রঙের, চোখের মতো চিহ্নে ভরা। শুঁয়োপোকার রং বাদামি বা কালো, লাল হলুদ নকশা করা, এবং রোমশ। বৃহত্তম ও সুন্দরতম ধাতব রঙিন প্রজাপতি মর্ফো *(Morpho)* দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দা। অ্যামাথুসিড প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। ডানা গহনা তৈরির কাজে লাগে। ভারতের অ্যামাথুসিড প্রজাপতিরা নারকেল গাছের ও বাঁশগাছের পাতায় থাকে, বাড়ে। পছন্দ মদ, গেঁজে ওঠা আখের রস, ঘোড়ার বিষ্ঠা। ফুলের ধারে কাছে দেখা যায় না। শ্রীলঙ্কা ও ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলে দেখা যায় ডিসকোফোরা লেপিডা *(Discophora lepida)* জাতীয় প্রজাপতিদের। এরা দুর্লভ জাতের, বড় মাপের ও গাঢ় বাদামি রঙের; গায়ে নীলচে সাদা বুটি।

নিমফ্যালিড

এরা বড় মাপের, উজ্জ্বল রঙের, তামাটে ও কালো দাগের অথবা ডোরাকাটা প্রজাপতি। এদের পেছনের ডানায় লেজের মতো অংশ। প্রখর সূর্যালোক এদের পছন্দ। জবরদস্ত উড়তে পারে। ফুলেই এদের উৎসাহ। সময় সময় বিষ্ঠায়, মদে, পচনধরা ফলেও এদের আসক্তি। সব রকম নিমফ্যালিড গাছের পাতায় আর ঝোপে ঝাড়ে বসে রোদ পোহায়। এদের শুঁয়োপোকা নানারকম গাছের পাতা খায়।

ক্যারাক্সেস *(Charaxes)*, যাদের জনপ্রিয় নাম রাজা, এবং ইরিবিয়া *(Eriboea)* বা 'নবাব', আমাদের প্রজাপতিদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। 'রাজা' সাধারণত তামাটে বা কাঠবাদামরঙা। গা নকশাকাটা। নবাবেরা কালো, নীচে চওড়া হালকা হলুদ বা হলদেটে সবুজ ফিতে কাটা। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে এদের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আর গভীর আর্দ্র ও উষ্ণ জঙ্গলে। ফুলের প্রতি আকৃষ্ট নয়। পছন্দ বেশি পাকা ফল, পচে যাওয়া ফল, সারের গাদা। ইরিবিয়া ডোলোন *(Eriboea dolon)* বা রাজকীয় আভিজাত্যপূর্ণ নবাব বাহাদুর আসাম-বর্মা থেকে কুলু পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের জঙ্গলে

পাওয়া যায়। ইরিবিয়া স্ক্রিবেরী *(Eriboea schreiberi)* বা নীল নবাব চোখে পড়ে পশ্চিমঘাট পর্বতাঞ্চলে, আসামে আর বর্মায়। ক্যারাক্সেস পলিক্সেনা *(Charaxes polyxena)* বা তাম্রবর্ণ রাজার বসতি শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ ভারত, আসাম থেকে বর্মায় কুমায়ুন হিমালয়ে। মোটাসোটা, মাঝারি বা ছোট আকারের সম্রাট প্রজাপতি অ্যাপাটুরা *(Apatura)* গোষ্ঠীর। এদের অনেকের রং গাঢ় বাদামি, তার ওপর সাদা বা তামাটে নকশাকাটা। প্রেসিস *(Precis)* হল ছোট অথচ সুন্দর প্রজাপতি, নীল, হলুদ, তামাটে বা বাদামিরঙা এবং পরিষ্কার চোখের মতো নকশা কাটা। প্রেসিস হিরটা *(Precis hirta)* হলুদরঙের, আর প্রেসিস ওরিথিয়া *(Precis urithyia)* নীলরঙের। খুব বেশি চোখে পড়ে ভারতে, শ্রীলঙ্কা ও বর্মায়।

ভ্যানেসা প্রজাপতি কালো, গাঢ় বাদামি, টুকটুকে লাল, লালচে গোলাপী; ছড়ানো লালচে বাদামি ও কালো ফুটকি। প্রচলিত নাম 'চিত্রিত রমণী'। ভালবাসে খোলামেলা গ্রাম, উজ্জ্বল সূর্যালোক। পছন্দ রঙবেরঙা ফুল। ভ্যানেসা কার্ডুই *(Vanessa cardui)* সবচেয়ে পরিচিত প্রজাতি। এদের বিস্তৃতি এশিয়া, ইউরোপ, মেরু অঞ্চলে এবং উত্তর আফ্রিকায়, ভারতের সমতলভূমিতে আর হিমালয়ের পাহাড়ে। সমুদ্রতল থেকে 4500 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত উঁচুতে এদের বসতি। গোলাপী আভাযুক্ত লাল এই প্রজাতির কালো নকশা। আকারে 5—7 সেন্টিমিটার। শুঁয়োপোকা ও কাঁটাগাছের পাতা খায়। অন্যান্য কম্পোজিটি *(compositae)* গাছের পাতাও খায়। খায় না বড় একটা লতানো গাছের পাতা। গাছের পাতার ভাঁজে আর রেশম জাতীয় তন্তু দিয়ে বাসা বানিয়ে লুকিয়ে থাকে। এরা দূর দূরান্তরে উড়ে উড়ে বেড়ায়। খোলা মাঠ পছন্দ। পছন্দ ফুল, সেখানে নিয়মিত হাজিরা দেয়। ভারতীয় রেড-এডমিরাল প্রজাপতি ভ্যানেসা ইণ্ডিকা *(Vanessa indica)* দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ে, হিমালয়ে আর উত্তর বর্মায় দেখা যায়। আকারে ছোট হলেও দেখতে এরা সুন্দর। রং গাঢ় বাদামি, তাতে লাল ফিতে। আর কালো চোখের মতো নকশা। যদিও জঙ্গলে থাকতেই ভালোবাসে, তবুও খোলা মাঠেঘাটে থাকে। পাহাড় পর্বতে, বিশেষত হিমালয়ে, চোখে পড়ে আরগিনিস *(argynnis)*। ঘাসেই এদের ঘর। সাধারণভাবে উজ্জ্বল বাদামি, গায়ে আড়াআড়ি ভাবে উপরে কালো ও নিচে রূপোলী ফুটকির সারি। আরগিনিস হাইপারবিয়াস *(Argynnis hyperbius)* ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলে, হিমালয়ে ও উত্তর বর্মায় দেখা যায়। স্বভাবে পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা, তবু শীতকালে এরা সমতলভূমিতে নেমে আসে।

লাইকেনিড

সাধারণত ছোট মাপের প্রজাপতি। রং প্রধানত নীল। ডানায় ফুটকি। ডানা জোড়া সূক্ষ্ম লেজের মতো। পিঁপড়েদের আস্তানার ভাগীদার বলে এরা সবিশেষ পরিচিত। শুঁয়োপোকারা থাকে পিঁপড়েদের বাসায়। পিঁপড়েরাই এদের দেখাশুনো করে, বিনিময়ে শুঁয়োপোকাদের শরীর থেকে নিঃসৃত মিষ্টি রস গ্রহণ করে। প্রজাপতিরা ডিম পাড়ার আগে পিঁপড়েদের বাসা খুঁজে বেড়ায়। আবার পিঁপড়েরাও শুঁয়োপোকাদের নিয়ে এসে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে। ঠিক যেমন আমরা গোয়ালঘরে গরু পুষি। সবচেয়ে

পরিচিত লাইকেনিড প্রজাপতি হল ইউক্রাইসপস নেজাস *(Euchrysops nejus)*। ভারতের সর্বত্র, বর্মায় ও শ্রীলঙ্কায় এদের বাস। নানান বাগানের নানান ফুলে এরা উড়ে বেড়ায়। আর ভিজে জায়গা থেকে জল খেতে ভালবাসে। শুঁয়োপোকা থাকে শিমজাতীয় গাছে। ভিরাকোলা আইসোক্রেটস *(Virachola isocrates)* হল ফ্যাকাশে নীলচে বেগুনি রঙের লাইকেনিড; এদের শুঁয়োপোকা থাকে ডালিম, পেয়ারা আর তেঁতুলে।

প্যাপিলিও

চেরা-লেজ প্রজাপতি হল সবচেয়ে বড় ও সুন্দর। বেশির ভাগই কালো বা বাদামি। সুন্দর লাল হলুদে নকশা কাটা। পেছনের ডানায় অনেকের লম্বা লেজ আছে। বনে জঙ্গলে, সমতল ভূমিতে, পাহাড় পর্বতে সর্বত্র এদের দেখা যায়।

ট্রয়েডস হেলেনা *(Troides helena)* এক ধরনের সুন্দর চকচকে কালো প্রজাপতি। ওপরে সোনালী হলুদ রং। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমঘাট পর্বতেই বাস। তবে এরা ওড়িশায়, আসামে ও বর্মাতেও হাজির হয়। ল্যান্টেনা জাতীয় ফুল এরা বেশি ভালোবাসে। পলিডোরাস অ্যারিস্টোলোকি *(Polydorus aristolochiae)* দেখা যায় বর্ষাকালে, ভারতের সর্বত্র। চেরা-লেজ প্রজাপতিদের মধ্যে এরাই আকারে সবচেয়ে বড়। এদের কালোর ওপর সাদা বা লাল ফুটকি কাটা। শুঁয়োপোকা অ্যারিস্টোলোকিমার পাতা খায়। বয়স্করা সব রকম ফুলে উড়ে বেড়ায়। অন্যান্য এই প্রজাতির প্রজাপতি হল প্যাপিলিও পলিনেস্টার *(Papilio polymnestor)*, প্যাপিলিও বুটস্ *(Papilio bootes)* এবং প্যাপিলিও ডিমোলিয়াস *(Papilio demoleus)*। বহুল পরিচিত 'কাইজার-ই-হিন্দ' প্রজাপতি 'টাইনোপ্যালপাস ইম্পিরিয়ালিস' *(Teinopalpus imperialis)* প্রজাতির। দেখা যায় পূর্ব হিমালয়ে, আসামে ও বর্মায়। মাপ এদের প্রায় 10 সেন্টিমিটার, উজ্জ্বল সবুজ রং, তাতে কালো আর গাঢ়-হলুদ দাগ কাটা; আর আছে লেজ।

অ্যাপোলো বা পার্ণেসাস প্রজাপতি মূলত হিমালয়ের। দুর্গম তুষার ঢাকা অঞ্চলে বাস। কদাচ সমুদ্রতল থেকে তিন হাজার (3000) মিটার উঁচুতেও দেখা যায়। অ্যাপেলো প্রজাপতি দেখা যায় ইউরোপ, উত্তর এশিয়া, উত্তর আমেরিকা আর মেরু অঞ্চলে। রং সাদা স্বচ্ছ, ডানায় আঁশ নেই বললেই চলে। ডানায় কালো ফিতে, লাল ফুটকি।

পাইরিড

মাঝারি আকারের প্রজাপতি। বেশির ভাগই সাদা রঙের। কখনও হলুদ ও কমলার আভা নজরে পড়ে। পাইরিস শুঁয়োপোকা থাকে বাঁধাকপির পাতায়, সর্ষে শাকে; থাকে ক্রুসিফেরেসি আর কখনও ক্যাপারিডেসিতে। হলুদ রঙের কলিয়াসের শুঁয়োপোকা থাকে শিমজাতীয় গাছের পাতায়। ভারত, শ্রীলঙ্কা ও উত্তর বর্মায় পরিচিত প্রজাপতি ডেলিয়াস ইউক্যারিস *(Delias eucharis)* ৪ সেন্টিমিটার। সাদা রঙের ওপর কালো ডুরে ভরা। ইক্সিয়াস পাইরেনি *(Ixias pyrene)* হলুদ ও কালো রঙের। দেখা যায় শ্রীলঙ্কা, ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলে, বাংলায়, হিমালয়ে আর বর্মায়। ক্যাটোপ্‌সিলা ক্রুকেল

(Catopsila crocale) ও ক্যাটোপ্‌সিলা পমোনা *(Catopsila pomona)* হালকা হলুদ বা সাদা রঙের প্রজাপতি। ভারতে, শ্রীলঙ্কায় ও বর্মায় প্রচুর আছে।

মথ

অধিকাংশ মথই আকারে ছোট। যদিও অনেকেই দেখতে বেশ সুন্দর, তবু এদের দেখা মেলা ভার। বিশেষজ্ঞরাও জানেন না। কারণ এরা প্রধানত নিশাচর।

সবরকম মথই যে বাইরে বাইরে ঘোরে, তা নয়। অনেকে ঘরের ভেতরেও থাকে। টিনিয়া প্যাকিসপাইলা *(Tinea Pachyspila)*, টিনিয়া ট্যাপেজেলা *(Tinea tapetzella)* ও সেটোমরফা রুটেলা *(Setomorpha rutella)* প্রজাতিদের প্রায় প্রতি বাড়িতেই চোখে পড়ে। এদের শুঁয়োপোকা দেরাজে রাখা পশম খেয়ে নষ্ট করে। আবার অনেক মথ, যাদের শুঁয়োপোকা বাইরে গাছে থাকে, বাড়ির বৈদ্যুতিক আলোতে আকৃষ্ট হয়ে ভেতরেও ঢুকে পড়ে। এদের মধ্যে অন্যতম হল নকটুইড ও হক-মথ। তাছাড়া স্যাটারনিড ও বম্বিসিড মথেরাও মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

হক-মথদের দেখা যায় বিশেষত বর্ষায় সময়। আলো দেখে এরা আকৃষ্ট হয়। এদের চিনতে পারাও খুব সহজ। দেহের গঠন টর্পেডোর মতো। ডানা ছুঁচালো। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উড়তে পারে। কিছুর ডানার বিস্তার প্রায় 10 সেন্টিমিটার। সবার শুঁড় যথেষ্ট লম্বা। সহজেই রাতে ফোটা গভীর সুগন্ধ ফুলের মধু চুষে খেতে পারে। শুঁয়োপোকারা মোটাসোটা, মসৃণ, সবুজ বা বাদামি। চোখের মতো চিহ্ন আর ডোরাকাটা। চামড়ার ভাঁজের নিচে এই সব চিহ্ন বা ডোরাকে গুটিয়ে ফেলে চোখের আড়ালে নিয়ে যাওয়া যায়। পেছনে অনেকের মাংসল শিং। একেবারেই নিরীহ, ক্ষতি করে না। বিপদের আশঙ্কায় এরা দেহের সামনের অংশ উঁচু করে তুলে ধরে স্থির হয়ে যায় স্ফিংস-এর মতো। তাই এদের নাম স্ফিঙ্গড মথ। এরা সবাই যে নিশাচর তা নয়। এদের মধ্যে কোনো কোনো মথকে পাহাড়ী অঞ্চলে দিনের বেলাতেও উড়তে দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত পরিচিত সুন্দর স্ফিঙ্গিড মথ হল হার্স কনভলভুলি *(Hherse convolvuli)*। রং ধূসর। পেটের কাছে গোলাপি ডুরে। আকারে বড়। আর আছে অ্যাকিরনসিয়া স্টাইক্স *(Acherontia styx)* বা তথাকথিত নর-করোটি মথ। লালচে। পেটের কাছে নীল হলুদ বুটি। ধড়ের ওপর অদ্ভুত একটা দাগ যা অনেকটা খুলির মতো দেখতে, আর তার সঙ্গে জোড়া ক্রুশাকার হাড়ের 'X' চিহ্ন তাই এই নাম। এদের শুঁয়োপোকা বড় মোটা সবুজ রঙের, খাদ্য হল সিম, বিন, বরবটির পাতা। ডিলেফিলা নেরাই *(Deilephila nerii)* হল গাঢ় জলপাই সবুজ আর গোলাপি বিরাট বড় মথ। শুঁয়োপোকা করবী গাছের পাতা খায়। ম্যাক্রোগ্লসাম্‌ *(Macroglossum)* হল গাঢ় রঙের খঞ্জনা মথ। পাহাড়ী ফুলের কাছে যায়। হিপোটিয়ন *(Hippotion)* হল সমতল ভূমির পরিচিত হক-মথ।

নকটুইড মথ খুবই সাধারণ, চোখেও পড়ে প্রচুর। অনেকেই চাষবাসের কাজে লাগে। বেশির ভাগই কিন্তু আকারে ছোট, তেমন রঙচঙেও নয়, তাই নজরে পড়ে

না। শূককীট নানারকম গাছের পাতা খায়। গুটিপোকা অনেক সময়েই মাটির নিচে থাকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ওফিডেরিস *(Ophideres)*। আকারে বড়, রঙচঙে নকশাকাটা, আলোতে আকৃষ্ট হয়। খায় ফলের রস। পেছনের ডানা হলদে রঙের। তাতে আছে চোখের মতো দাগ। শুঁয়োপোকা বুনো গাছের পাতা খায়। রাতে বয়স্ক মথ পাকা কমলা লেবু, বাতাবি লেবু, আম খায়। খোসা ফুটো করে রস পান করে।

স্যাটারনিড হল বুনো রেশম-মথ। উজ্জ্বল রঙের, আকারে সুবৃহৎ, ডানার প্রসার প্রায় পঁচিশ 25 সেন্টিমিটার। অ্যাটলাস মথের এই মাপ। শুঁড় নেই বলে খেতে পারে না। অধিকাংশই নিশাচর। স্বল্পায়ু। ঘন, উষ্ণ ও আর্দ্র জঙ্গলে থাকে। জঙ্গলের মধ্যে বেশ দূর থেকেও স্ত্রীমথ বহু পুরুষকে আকৃষ্ট করে। অ্যাটাকাস অ্যাটলাস *(Attacus atlas)* হল অ্যাটলাস মথ, এবং অ্যাটাকাস সিন্থিয়া *(Attacus cynthia)* হল এক ধরনের বুনো রেশম মথ, আসামের রেড়ীর তেলের গাছে এদের বাস। অ্যাকটিয়াস সিলিন *(Actias selene)* আর অ্যানথিরা পাফিয়া *(Antheroea paphia)* তসর রেশম মথ ভারতের সবচেয়ে পরিচিত স্যাটারনিড প্রজাতির মথ। অ্যাকটিয়াস সিলিন *(Actias selene)* খুব নজর কাড়া চেহারার। পেছনের ডানায় আছে লম্বা বাঁকা লেজ। রং হল হালকা সবুজ, তার ওপর লাল অর্ধচন্দ্রকার চোখের মতো চিহ্ন। অ্যাটলাস মথ হল ভারতের সবচেয়ে বড় আকারের মথ। তসর রেশম-মথ পোষা নয়; জঙ্গলের বুনো গাছে এরা গুটি বাঁধে, সেই গুটি থেকে রেশম সংগ্রহ করতে হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কীটপতঙ্গ ও মানুষের ঘরবাড়ি

আমাদের ঘরবাড়িতে যে কীটপতঙ্গ দেখতে পাই তা মানুষেরই সৃষ্টি। কীটপতঙ্গের কাছে এটা হল কৃত্রিম জীবন। বাইরে প্রকৃতির কোলে থাকতেই ভালবাসে তারা; ছারপোকা এবং অন্যান্য যে সমস্ত কীটপতঙ্গ আমরা অহরহ নিজেদের আশেপাশে ঘরের মধ্যে দেখতে পাই তাদের জাতভাইরা আজও কিন্তু ঘরের বাইরেই থাকে। যদিও বহুরকমের কীটপতঙ্গ মানুষের সঙ্গে একই ছাদের নিচে মাথা গুঁজে থাকে, তবুও এদের মধ্যে খুব কমই এই বাড়তি আশ্রয়ের সুবিধা নিতে শিখেছে। বিলাসিতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কজনাই বা! যারা মানুষের সঙ্গে থাকতে চায়, তাদের কিন্তু নানান স্বভাবদোষ দেখা দিয়েছে। আশীর্বাদ নয় কারোর কাছেই, এবং মানুষের কাছে অভিশাপ। দেখা যায়, এরা গ্রামের চেয়ে শহরের বাড়িঘরই বেশি পছন্দ করে। এদের ভিড়ভাট্টা তাই শহরেই। গ্রামের ছিমছাম কুটির কীটপতঙ্গকে তেমন আকৃষ্ট করে না; মাঠ ও বাগানের আকর্ষণ ছেড়ে তারা ঘরদোরে আসে না। কিন্তু শহরের ব্যবসাকেন্দ্র ও কলকারখানায় আধুনিক গৃহ সবারে করে আহ্বান। এসো, স্বভাব পাল্টাও, ভিন্ন স্বাদের খাবার চেখে দেখ। সেই নিমন্ত্রণ ছাড়ে কে? একবার মানুষের ঘরবাড়িতে আশ্রয় নিলে বিনে পয়সার অতিথি হিসেবে দিব্যি থেকে যায়। অবশ্য অনেকে শুধু আসা যাওয়া করে, একেবারে জাঁকিয়ে বসে না। গ্রামের বাড়িতেও যে কীটপতঙ্গের উৎপাত নেই তা নয়; বাইরে থেকে কেউ কেউ কখনও ঘরে ঢুকে পড়ে, আবার চলেও যায়। গ্রামের বাড়িতে কয়েকটা মাত্র প্রজাতিই বাসা করে থাকে। কিন্তু শহরের বাড়িতে অনেকে আছে যারা ওখানেই জন্মায়, ক্রমশ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়ে। ইচ্ছে করলেও, বা একটু হাওয়া বদলের জন্যও, এরা আর প্রকৃতির কোলে বাইরের খোলামেলা জগতে ফিরে যেতে পারবে না। মানুষের এটা ভুল ধারণা— যেহেতু শহরের বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সেখানে অনেক বেশি সুযোগসুবিধা। পোকামাকড়ের উৎপাত তাই কম।

যেসব কীটপতঙ্গ শুধু মানুষের সঙ্গেই বাস করে, তাদের বৈশিষ্ট্য কি? যদিও শ্রেণী হিসাবে কীটপতঙ্গ খোলামেলা আবহাওয়া, সূর্যের আলো, সবুজ প্রকৃতি পছন্দ করে, তবু যেসব কীটপতঙ্গ বাড়িতে থাকে, তারা সূর্যালোক এড়িয়েই চলে বা বাইরের জীবনে ভয় পায়; অন্ধকার ভ্যাপসা, নোংরা ঝুলকালিমাখা ঘুপচি কোণই তাদের মনের

মতো। এদের চলাফেরার ক্ষমতাও ধীরে ধীরে কমে যায়। বাইরের জীবনযাপনে অভ্যস্ত জাতভাইদের তুলনায় এদের পায়ের গঠন, ডানার আকার সবই কমজোরি। এদের বোধেন্দ্রিয়ও অত উন্নত নয়। গৃহস্বামীর খারাপ অভ্যাসের কিছু কিছু এদের মধ্যেও বর্তায়। কোন একটা বাড়ির পোকা মাকড় দেখে সেই বাড়িতে কি ধরণের বাসিন্দা বাস করে তা আন্দাজ করে নেওয়া যায়।

গৃহপালিত কীটপতঙ্গের তালিকা দীর্ঘ। আর নানা প্রকারের জীবও আছে। তাই আমাদের আলোচনা মাছি, আরশোলা, ঝিঁঝিপোকা, কাপড়কাটা পোকা, সিলভারফিস পোকা আর ছারপোকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। মানব সভ্যতার এরা অবিচ্ছেদ্য ফল। তোমরা হয়তো ভেবে অবাক হচ্ছো মশার প্রসঙ্গ তুলছি না কেন, যে মশার কামড়ে আমরা রাতে ছটফট করি। কারণ মশা গৃহপালিত নয়, শুধুমাত্র রাতেই এদের আনাগোণা; যতক্ষণ পেট ভরা থাকে রক্তে, ততক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকতেই এরা ভালবাসে।

মাছি

'মাছি থেকে সাবধান—এরা অতি কুৎসিত, নোংরা, গণ্ডমূর্খ। রোগজীবাণু বহন করে, তাতে মানুষ মারাও যায়'—অত্যাধুনিক ও বহুল প্রচারিত আন্তর্জাতিক একটা মাসিক পত্রিকায় এই সাবধান বাণী প্রকাশিত হয়েছে। অত্যন্ত কর্কশ ভাষার এই মন্তব্য। কিন্তু যা পরিষ্কার তা হল, কতখানি অজ্ঞ হলে মানুষ তার এই তথাকথিত উঁচুদরের বিজ্ঞান জাহির করতে পারে।

আমরা, আধুনিক সভ্য কেতাদুরস্ত শহুরে মানুষেরা, মনে করি, মাছি খুবই নোংরা জীব। ধারণাটা পুরোপুরি অসত্য। বিশ্বাস কর আর নাই কর, মাছি হল পৃথিবীর অন্যতম পরিচ্ছন্ন জীব। নিজেদের দেহ এরা আবর্জনা ও মালিন্যমুক্ত রাখে। এমন কি কোনো আজেবাজে বাইরের জিনিস দেহে থাকলে শশব্যস্তে তা পরিষ্কার করে ফেলে। আমরা যা করি না। যখন ভনভন করে উড়ছে না বা খাচ্ছে না, তখনও দেখবে সে ব্যস্ত রয়েছে তার পা দিয়ে নিজের শরীরের ডানা, চোখ, মাথা, মায় সকল অংশ পরিষ্কার করতে, শরীরে বিন্দুমাত্র ময়লা না থাকলেও। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে মাছিকে হয়তো একটু শুচিবায়ুগ্রস্তই বলা চলে।

মাছি আর যাই হোক কুৎসিত নয়। সস্তা আতস কাচ দিয়ে লক্ষ্য করে দেখ, দেখবে এদের সুসমঞ্জস দেহ, সুন্দর গড়ন, নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খ, পাতলা উজ্জ্বল ডানা। গড়ন, আকার, রংয়ের চমকপ্রদ সমন্বয়। যেন জ্যামিতিক সঙ্গীতমূর্চ্ছনা। মাছিকে মূর্খ বলে আমরা নিজেদের অজ্ঞতাই প্রকাশ করি। প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রাম করে জয়ী হতে যতটা বুদ্ধি আর বিশেষ অনুভূতির দরকার, তার সবটাই মাছির আছে প্রচুর পরিমাণে। কেমনভাবে উড়তে হবে, সোজা নামতে হবে না উল্টে, কোথায় খাবার পাওয়া যাবে, কোথায় ডিম পাড়বে, এবং পিষে যাবার হাত থেকে কিভাবে বাঁচতে হবে—সবই তার জানা। নিখুঁতভাবে। আর এই সবের জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে

হয়নি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশে উড়ে থাকতে পারে, নামতেও পারে সোজা, বিমান বন্দরের মত নামার পথ না ছুঁয়ে। মাছির ভনভনানি আসলে ডানার কম্পনের ফল—ডানা সেকেণ্ডে 200-300 বার কাঁপে। মাছি যখন উড়ে গিয়ে কড়িকাঠে বসে তা কি লক্ষ্য করেছ? কি করে তা সম্ভব? কী করে বাতাসে অর্ধেক ঘুরে বা ভিতরে বাঁকা? দক্ষ বিমানচালক যদিও হও, চেষ্টা করে দেখ। রহস্য। মাছির নিরাপত্তা শুধুমাত্র সতর্কতার ওপরই নির্ভর করে না। নির্ভর করে তার দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা এবং ইচ্ছেমত বিদ্যুৎ গতিতে উড়ে যাবার বা বসে পড়ার ক্ষমতার উপরও।

ফড়িংয়ের মতো মাছি শক্ত খাবার খেতে পারে না, আবার ছারপোকা বা প্রজাপতির মতো তরল খাবারও শুষে পান করতে পারে না। খাবারের ভিজে অংশ থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি স্পঞ্জের মতো শোষণ করে নিতে পারে। খাবার শুকনো থাকলে মাছি নিজের লালা দিয়ে তা ভিজিয়ে নেয়, এবং তখন সারবস্তু শুষে নেয়। এদের স্বাভাবিক খাবার হল, গেঁজিয়ে ওঠা তরিতরকারি, আর বিশেষভাবে তৃণভোজী প্রাণীর বিষ্ঠা। পচনধরা শাকসবজি আর খামারের সারের স্তূপে মাছি ডিম পাড়ে। এইসব ডিম ফুটে দুই এক দিন বাদেই বেরিয়ে আসে হালকা হলুদ পা-বিহীন শূক। নাম ম্যাগট। ম্যাগটরা পচা সার, বিষ্ঠা বা তরিতরকারি খায়। এই দিক থেকে এরা ধাঙড়, আবর্জনা দ্রুত দূর করতে সাহায্য করে। চার পাঁচ দিনে এরা পূর্ণ আকার পায়, পরিণত হয় চোঙাকার বাদামি গুটিপোকাতে। এরা তখন থাকে মাটি থেকে পাঁচ-সাত সেন্টিমিটার নিচে। আরও তিন চার দিন গুটি অবস্থায় থাকার পর মাছি বেরিয়ে আসে। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছি হতে তাই সময় লাগে সপ্তাহখানেক। অবশ্য এটা খানিকটা নির্ভর করে আবহাওয়া ও তাপমাত্রার ওপর। সবচেয়ে উপযুক্ত তাপমাত্রা হল ৩৩° সেন্টিগ্রেড। গ্রীষ্মকালে বয়স্ক মাছি বাঁচে এক মাসের মতো; শীতকাল হলে আয়ু তিন মাস।

যদিও মাছি জন্মায় ও বড় হয় সার ও পচনশীল আনাজের মধ্যে, কিন্তু বড় হয়ে এদের নজর মানুষের খাবার দাবারের ওপর ও নোংরা বস্তির ময়লার ওপর পরে। মাছি তাই কলেরা, টাইফয়েড ও আমাশয়-এর জীবাণু বহন করে রোগ ছড়ায়। অদৃষ্টের পরিহাস, এরা নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, আবর্জনা খেয়ে সাফ করে। তবু এরা রোগের জীবাণু বহন করে, মড়ক ছড়ায়। সেইজন্য অবশ্য মানুষই সম্পূর্ণ দায়ী। কারণ তারাই পরিবেশ নোংরা করে, অস্বাস্থ্যকর করে। ভিড়ভাট্টা যত বাড়বে, সভ্যতার প্রসার যত হবে, ততই বাড়বে নোংরা আবর্জনা, আর সেটাই হবে রোগ ছড়ানোর আমন্ত্রণ।

সভ্যজগতে (আমাদের ভারতেও) যে বিশ্বজনীন মাছি দেখা যায় তার নাম মুসকা ডোমেস্টিকা *(Musca domestica)*। এছাড়া আছে মুসকা নেব্যুলো *(Musca nebulo)* —প্রচুর পরিমাণে ভারতে জন্মায়; এবং মুসকা ভিসিনা *(Musca vicina)* আকারে ছোট, প্রায়ই বাড়িতে ঢুকে উৎপাত করে।

মাছির অনেক শত্রু। যেমন টিকটিকি, পাখি, বানর ইত্যাদি। ছত্রাকজাতীয় পরজীবী কীট এদের দেহে বাসা বাঁধে, ফলে মড়ক লাগে। পরজীবী মাইট আর নেমাটোড কীট এদের আক্রমণ করে। মাছির বার্ষিক মৃত্যুর হার 99.6%। তবু জন্মায় লক্ষকোটি। সেইজন্য মক্ষিকাকুল নিশ্চয়ই মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারে।

আরশোলা

আরশোলা খুবই প্রাচীন জীব। প্রাচীনতম জীবাশ্ম দেখে অনুমান করা যায় তা প্রায় বিশ কোটি বছরের পুরানো। সেই আদি যুগের আর্দ্র ও উষ্ণ বনজঙ্গলের মাটিতে রাক্ষুসে আরশোলা ঘুরে বেড়াত। এখনও বহু আরশোলা গ্রীষ্মমণ্ডলের গাছপালার পাতার নিচে বাস করে। কিছু এখন মানুষের আস্তানাতে হানা দিয়েছে এবং স্থলপথে জলপথে পৃথিবীর সর্বত্র চষে বেড়াচ্ছে। তথাকথিত আমেরিকান আরশোলা পেরিপ্লানেটা আমেরিকানা *(Periplaneta americana)* পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিটি বাড়িতে, কারখানায়, গুদামে, ট্রেনে, জাহাজে এদের একচ্ছত্র আধিপত্য। এরা আকারে বড়, চ্যাপ্টা, গাঢ় চকচকে লালচে বাদামি রঙের চকচকে প্রাণী। অত্যন্ত দ্রুতগামী, আলো হাওয়া একেবারেই পছন্দ করে না, গরম ভিজে জায়গায় থাকতে ভালোবাসে। খাবারদাবার গোগ্রাসে গেলে। নর্দমার নালিতে, প্রস্রাবাগারে, রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, খাদ্যশস্যের ও ময়দার বস্তায়, হাত না পড়া পুরনো বইয়ের তাকে, কাঠের বাক্সে এরা লুকিয়ে থাকে। বর্ষার আগে, গুমোট গরমে, রাতের দিকে এরা ডানা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে। দক্ষিণ ভারতের অনেক অঞ্চলে মনে করা হয়, আরশোলা উড়ছে মানেই অদূর ভবিষ্যতে বৃষ্টি নামবে। আরশোলার এই অভ্যেস আসলে মজ্জাগত; মানুষ তাকে গৃহবন্দী করার আগে এরা যে মুক্ত প্রকৃতি পছন্দ করত, তারই নমুনা। বর্ষার আগে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে তখন তারা উড়ত; সেই অভ্যেস রয়েই গেছে। নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান দেশে আরশোলার ওড়ার প্রবণতা একেবারেই নেই।

আরশোলা উথেকা বা অদ্ভুত এক রকম থলির মধ্যে (দেখতে ঠিক ছোট একটা গ্লাডস্টোন ব্যাগের মতো) একসঙ্গে দুই ডজন মতো ডিম পাড়ে। খুদে খুদে নিম্ফ বা বাচ্চা আরশোলা খুবই চটপটে হয়—দেখতে সাধারণত বড় আরশোলার মতোই। ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস *(Blatta orientalis)* আর এক ধরনের আরশোলা, আকারে ছোট। কিন্তু আমেরিকানা পেরিপ্ল্যানেটার মতোই এদের স্বভাব চরিত্র। আরশোলাও মাছির মতো আবর্জনার গাদায় ঘুরে বেড়ায়, আবার মাছির মতোই অবসর সময় নিজের গা-গতর পরিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকে।

পারতপক্ষে এরা মানুষকে আক্রমণ করে না, তার নাগালের বাইরেই থাকে। তবুও যদি কিছু বা কেউ এদের সংস্পর্শে আসে তাহলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে তাকে সাত হাত দূরে যেতে বাধ্য করে। আবার মানুষের খাদ্যে এরা রোগজীবাণু ছড়ায়। কোনো কোনো সময় আরশোলা ঘুমন্ত মানুষের ভুরুর চুল বা সদ্যোজাত শিশুর মাথার নরম চামড়া খেয়ে বিষাক্ত ঘা করে দেয়। আরশোলার অনেক শত্রু, যেমন প্রধানত ছুঁচো, টিকটিকি, গিরিগিটি ও পাখি। বহু ধরনের পরজীবী এদের দেহে থাকে বিশেষত যেমন প্রোটোজোয়া এবং ছোট ছোট পোকামাকড়। পতাকাবাহী এক ধরনের মাছি আছে যাদের বলে ইভানিয়া অ্যাপেণ্ডিগাস্টার *(Evania appendigaster)*। এরা কালো চকচকে পোকা, নিজেদের পেটকে পতাকার মতো ওপরে নিচে নাড়ে, আরশোলার ডিমে পরজীবী। চীন দেশে আরশোলা খুবই রুচিকর

খাবার। ফুটন্ত জলে আরশোলা ফেলে বিশেষ রোগের ওষুধ তৈরি করে তা চায়ের মতো পান করার প্রথাও আছে।

ঝিঁঝিঁপোকা

ঝিঁঝিঁপোকা সাধারণত বাগানে বা মাঠে গর্ত করে বাস করে। তবে একটা বিশেষ ধরনের ঝিঁঝিপোকা গ্রাইলাস ডোমেস্টিকাস *(Gryllus domesticus)* কেবলমাত্র মানুষের বাড়িতেই চিরদিনের অতিথি হিসেবে আস্তানা করে নিয়েছে। এরা মাঝারি মাপের, হালকা বাদামি রঙের, দ্রুতগতির চটপটে স্বভাবের। আলো একেবারেই পছন্দ করে না। সারাদিন কাটিয়ে দেয় চুল্লির আড়ালে, রান্নাঘর বা ভাঁড়ার ঘরের ফাঁকফোকরে লুকিয়ে। রাতে খাওয়ার জন্য যখন বাইরে বেরিয়ে আসে তখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মোলাকাত হয় আর আনন্দে ঝিঁ-ঝি শব্দ করে। সাধারণত ফেলে দেওয়া এঁটো খাবার ও রুটির গুঁড়ো খেয়ে সন্তুষ্ট থাকে। তবু আস্ত রুটি, কেক, আলু, বেগুন এইসব খাবার পেলে কামড়ায়। অনেক সময় আরশোলার মতো এই সব ঝিঁঝিপোকাও সদ্যোজাত শিশুর চুল ও নরম চামড়া খেয়ে নেয়। ঝিঁঝিপোকার ঐকতানও আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডেকে যায়। আরশোলার মতোই এরাও মানুষের দৌলতে সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। মানুষের দ্রুতগতি যাতায়াতের আশীর্বাদধন্য উভয়েই—আরশোলা আর ঝিঁঝিপোকা।

ছারপোকা

সবচেয়ে বিরক্তিকর পোকা হল ছারপোকা। মানুষের সঙ্গে থাকাটাই এর পছন্দ। মারাত্মক ছারপোকার নাম সাইমেক্স *(Cimex)*।

ছারপোকারা ডানাহীন, চ্যাপ্টা, লালচে বাদামি, গোলাকৃতি, দূর থেকে দেখতে মুসুরডালের মতো। আলো অপছন্দ। পছন্দ উষ্ণ আর্দ্র জায়গা। দিনের বেলা আসবাবপত্রে আর দেওয়ালের ফাটলে থাকে লুকিয়ে। রাতে গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে মানুষের চামড়া ভেদ করে রক্ত শুষে খায়। পেট ভরে যাবার পর মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য শান্তি দিয়ে নিজের বাসায় ফিরে যায়, আরাম করে শুয়ে বসে থেকে রক্ত হজম করে।

মানুষের শরীরের গরম আর ঘামের গন্ধে ছারপোকা আকৃষ্ট হয়। অনেক সময় এরা তাই দিনের বেলাতেও আক্রমণ করে। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় এই অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই। এরাই একমাত্র পোকা যারা শহর ও গ্রামের বাড়ির মধ্যে পার্থক্য করে না। পক্ষপাতিত্ব নেই কোন। শুধু বাড়িতে মানুষ থাকলেই হল। ছারপোকা ঘৃণ্য, টিপে মারলে অত্যন্ত বদগন্ধ বের হয়।

ছলনায় দড় ছারপোকা। এদের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে অনেক সত্যিমিথ্যে গল্প জানি। সবটাই কিন্তু গল্প নয়, অনেকটাই অতি বেশি সত্য। ছারপোকা অনাহারে থেকেও

তিন থেকে ছয়মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকে। পাশের দুই-তিনটে পোড়ো বাড়ি পেরিয়ে মানুষ বাস করছে এমন বাড়িতে আশ্রয় নিতে জানে। খাটের পায়া জলে বা কেরোসিনে ডোবানো থাকলে বিছানায় উঠতে এরা বাধা পায়। পরোয়া নেই তাতে। তখন দেওয়াল বেয়ে গুটিগুটি কড়িকাঠে উঠে যায়, সেখান থেকে টুপ করে ঘুমন্ত মানুষের শরীরে লাফিয়ে পড়ে, প্রতিশোধই নেয়।

অবশ্য ছারপোকাদের শুধু দোষ দিয়ে লাভ নেই। মানুষই তাদের নিয়ে যায় এক শহর থেকে অন্য শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পৃথিবীময়। নিয়ে যায় মালপত্র, জামাকাপড়ের সঙ্গে, ট্রেনে, জাহাজে। রেলকামরায় বিনাটিকিটের যাত্রী হিসেবে ভ্রমণ করে, নিখরচার খাবার উপরি পাওনা।

মানুষ ও ছারপোকার এই যোগাযোগ মানুষের মতোই অত্যন্ত প্রাচীন। ছারপোকা প্রাচীনকালে, দুই পায়ে দাঁড়ানোর আগে, মানুষের রক্ত খেতে শেখেনি। নিজের জাতভাইদের মতো গুহাবাসী বাদুড়ের রক্তই পান করত। ছিল তাই পরজীবী। যখন থেকে মানুষ গুহাবাসী হতে শিখল, তখন থেকেই সে ছারপোকার শিকার; হয়তো বা ছারপোকার কাছে বাদুড়ের রক্তের চেয়ে মানুষের রক্ত বেশি স্বাদু। আর ঝুলন্ত বাদুড়ের থেকে মানুষের গায়ের গন্ধও অনেক বেশি। হয়ে গেল 'বাদুড়' ছারপোকা থেকে 'শয্যা' ছারপোকা। মানুষ তারপর নিজেদের বাড়িঘর বানাতে শুরু করল, তার অজান্তে ছারপোকারা সেইসব বাড়িঘরে আশ্রয় নিল। মানুষ যদি আশ্রয়ের লোভে বাদুড়ের গুহায় যেতে পারে, ছারপোকাই বা দোষ করল কি? সে তো ঘরের বিছানায় আশ্রয় নেবেই! আর কড়িকাঠ থেকে বিছানায় অসতর্ক ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া? সে তো আগেও হয়েছে, বাদুড়-গুহার ছাদ থেকে নিচে মাটির ওপর আশ্রয়লোভী মানুষের ওপর ছারপোকা তো ঝাঁপিয়ে পড়তই।

বাড়িতে দুই ধরনের ছারপোকা আছে। অথচ তাদের বিশেষ পার্থক্য নেই। সাইমেক্স লেকটুলেরিয়াস *(Cimex lectularius)* সারা ভারতে সবিশেষ পরিচিত, অবশ্য বিদেশেও। এবং সাইমেক্স রোটান্ডেটাস *(Cimex rotundatus)* —এদের নিবাস ইউরোপে আর উত্তর ভারতে। দুই জাতেরই স্বভাব আর জীবন ধারা কমবেশি একই ধাঁচের। ফাটলে ডিম পাড়ে; ছোট হালকা রঙের ছারপোকা বেরোয় তা থেকে; সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তারা মানুষের রক্ত শোষণ করতে পারে। কখনও বুড়ো ছারপোকার রক্ত খায়। পূর্ণতা পাবার সময় পাঁচবার খোলস বদলায়। আট সপ্তাহের মাথায় যৌন সক্ষম হয়। রক্ত পান করার সময় ক্ষতস্থানে ছারপোকা লালা ঢুকিয়ে দেয়। এতে ক্ষতস্থানে জ্বালা ধরে। এবং রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। ছারপোকা সেই রক্ত ও লালার মিশ্রণ পান করে। রক্তপান না করতে পারলে ছারপোকা বাড়ে ধীরে ধীরে, তবে অনাহারে আয়ু বাড়ে।

ছারপোকা রোগজীবাণু বহন করে এমন কথা জানা নেই। আশ্চর্যের কথা, এদের তেমন কোনো প্রাকৃতিক শত্রু নেই। টিকটিকি, পাখি বা অন্য কীটপতঙ্গ ছারপোকাকে আক্রমণ করে বলেও জানা নেই। ছারপোকা সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। অনাস্থাভাজন জীব। তার পছন্দও এটা।

সিলভারফিস পোকা

সিলভারফিস পোকা লেপিসমা *(Lepisma)* থাকে শহরের বাড়িতে। অবশ্য এদের জাতভাইরা থাকে পাথরে ও পাহাড়ে, গাছের বাকলে ও ঝরাপাতার নিচে। বাইরের আস্তানা ছেড়ে তারা বাড়ির ভেতরে আসতে ইচ্ছুকও নয়। লেপিসমা ছোট্ট মাছের আকারের চকচকে রূপালী চ্যাপ্টা পোকা। দেখা যায় অন্ধকার গরম ভ্যাপসা কোণে, ছবির পেছনে, দেওয়াল কাগজের ভেতর, পুরানো বইয়ে। বই বাঁধবার মাড়, আঠা, কাগজ এদের প্রিয় খাবার। কখনও কাগজে গর্ত করে। বিরক্ত হলে, আলোয় বা প্রকাশ্য স্থানে বেরিয়ে এলে চট করে আবার আড়ালে ঢুকে যায়। রূপোলী রং একটু ঘষলেই পাউডারের মতো উঠে আসে। আসলে ওটা ছোট ছোট আঁশের মতো দেহের ওপর আলগাভাবে লাগানো ঝিল্লী। এদের ডানা নেই, আছে তিনটে লম্বা লেজ।

সপ্তম অধ্যায়

জলাশয়ের কীটপতঙ্গ

প্রাচীনকালের কীটপতঙ্গ ছিল উভচর। দীর্ঘ শৈশব কাটত জলে এবং স্বল্প পূর্ণবয়স্ককাল কাটত আকাশে—ডানার সাহায্যে উড়ে উড়ে। আধুনিক যুগের কীটপতঙ্গ মুখ্যত স্থলচর। অবশ্য অনেকেই জলাশয় আর সমুদ্র পরিক্রমা করেছে। পেয়েছে গৌণজীবন জলচর প্রাণী হিসাবেও।

ভারতবর্ষ জলসমৃদ্ধ দেশ। নদী, ঝর্ণা, পুকুর, হ্রদ, কত কি আছে। জলে ঘনবসতি নানা জাতের নানা প্রকৃতির কীটপতঙ্গের। মেফ্লাই, স্টোনফ্লাই, জলফড়িং, আরশোলা, ছারপোকা, গুবরেপোকা, সিয়ালিড, ক্যাডিসফ্লাই, মশা, ডাঁশ, অন্যান্য মাছি, স্প্রিংটেল ইত্যাদি। এদের মধ্যে অনেকে শূককীট বা গুটি অবস্থাতে জলচর, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হলেই স্থলচর। আবার অনেকের শূককীট ও পূর্ণাঙ্গ উভয় অবস্থাতেই জলে বাস।

বাতাস-টানা স্থলচর কীটপতঙ্গদের জলে বাস করতে গিয়ে অভাবনীয় সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ জলে চলাফেরা করা, ডুবন্ত অবস্থায় শ্বাস নেওয়া—সবই জটিল ব্যাপার। অবশ্য দেখা গেছে, সমস্ত জলচর কীটপতঙ্গই নিপুণভাবে এইসব সমস্যার সমাধান করেছে। বেশির ভাগ কীটপতঙ্গ পেছনের পায়ের সাহায্যে সাঁতার কাটে। পেছনের পাগুলো নৌকার দাঁড়ের কাজ করে। অনেকে আবার পায়ুদ্বার দিয়ে পিচকিরির মতো জল বের করে তীরবেগে সাঁতরায়। বহু জলচর প্রাণী জলে জীবন কাটিয়ে দিলেও বা নিচে ডুবে থাকলেও বাইরের মুক্ত বাতাসেই শ্বাস নিয়ে থাকে। জলে ডুব দেওয়ার আগেই বুক ভরে শ্বাস নেয়। বাতাসের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে জলের ওপরে ভেসে ওঠে, ফের ডুব দেয়। এদের দেহের গঠনই এমন যে বাইরের বাতাস টেনে নিয়ে ডুব দেবার সময় তা ধরে রাখতে পারে। অন্য অনেক জলচর কীটপতঙ্গ মাছের মতো কানকোর সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন শোষণ করে, বাইরের বাতাসের ওপর নির্ভর করে না। তবে মাছের কানকোয় যেমন রক্ত থাকে, কীটপতঙ্গের শ্বাসযন্ত্রে রক্ত থাকে না, থাকে টাটকা বাতাস। আস্রবণ পদ্ধতিতে দেহের রক্তের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বিনিময়ে এরা জলের অক্সিজেন গ্রহণ করে।

জলচর অনেক কীটপতঙ্গ উন্নতমানের দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। পুঞ্জাক্ষি স্পষ্ট দুইভাগে

বিভক্ত : ওপরের ভাগ জলের ওপরের জিনিস দেখার জন্য, নিচের ভাগ জলের ভেতরে দেখার জন্য। এরা যদিও জলে থাকে, এদের দেহ্ কিন্তু ভিজে যায় না। কারণ এদের শরীরে এক ধরনের মোমের জলাভেদ্য প্রলেপ থাকে। জলজ উদ্ভিদ খায়, জলে পচে যাওয়া লতাগুল্ম, জৈব পদার্থ, মৃত প্রাণীও খায়। অনেকে আবার জল খেতে আসা অসতর্ক স্থলচর প্রাণীকেও আক্রমণ করে।

বিপুল সংখ্যক কীটপতঙ্গ অবশ্য আংশিক জলচর। এরা নদীর তীরে, ঝর্ণার কাছে, পুকুরের ও হ্রদের কিনারায় বাস করে। সময়ে সময়ে জলে নেমে ভোজ্যদ্রব্যকে জল থেকে তুলে ডাঙ্গায় এনে ভক্ষণ করে। বহ্ কীটপতঙ্গ বিন্দুমাত্র আলোড়ন না তুলে জলের ওপর আলতোভাবে হেঁটে বা ভেসে বেড়াতে পারে। অবশ্য সাফল্যের পেছনে আছে জলতল—প্রসারণ ধর্মকে নিপুণভাবে কাজে লাগাবার ক্ষমতা। আবার অনেক কীটপতঙ্গ পুরোপুরিই্ জলচর। জলের নিচে ডুব দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত সাঁতার দেয়। অনেকের আবার এমনই্ স্বভাব যে তারা শুধু জলের তলাই্ খোঁজে, ওপরে ওঠার চেষ্টাই্ করে না।

নিয়ম হ্ল, ভাসমান কীটপতঙ্গ পছন্দ করে স্রোতহীন স্থির জল। আর ডুবুরি কীটপতঙ্গ স্থির ও বহমান দুই্ ধরনের জলই্ পছন্দ করে। স্রোতের টান যে জলে আছে সেখানকার কীটপতঙ্গদের দৈহিক গঠন বিশেষ ধরনের, জটিল ; যাতে স্রোতের টানে ভেসে না যায় তার জন্যে নোঙ্গর জাতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে। স্রোতকেই্ এরা কাজে লাগায় এদের জন্য খাদ্য ও অক্সিজেন আনতে। তাই্ বড় একটা নড়াচড়া করে না। স্রোতের জলের অনেক কীটপতঙ্গ আবার নুড়ি, বালি, কুটো ইত্যাদি দিয়ে বাসা বানিয়ে তার ভেতর নিরাপদে বাস করে। জলচর কীটপতঙ্গদের জীবনযাত্রা, রীতিপ্রকৃতি জীববিদ্যায় বিশদ গবেষণার বিষয়। আমাদের বৈঠকখানায় অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরি করে আমরা এদের চাষ করতে পারি।

পুকুর ও সরোবরের কীটপতঙ্গ

পুকুর, সরোবর আর অন্যান্য স্থির জলের কীটপতঙ্গ মূলত দুই্ ধরনের : ভাসমান-শিকারী আর ডুবুরি।

ভাসমান-শিকারীদের কথা

ভাসমান-শিকারীদের মধ্যে আছে এমন পোকা যারা জলের ওপর হেঁটে বেড়ায়, ভেসে বেড়ায়। আছে আর কিছু ঘুরঘুরে পোকা। খুব কমই্ এরা জলে ডুব দেয়। জলের ওপরই্ এরা হেঁটে বেড়ায়, বা খুব জোরে দৌড়ে বেড়ায়। বেশির ভাগ শিকারী কীটপতঙ্গ যূথচর। খোলা জল তাদের পছন্দ। বিশেষ পছন্দ পাড়ে গাছের ছায়ায় ঢাকা জল।

জলে বেড়ানো কীটপতঙ্গ মূলত লুঠেরা। ছারপোকা জাতীয়। ডানা পরিণত, দরকার

মতো উড়তে পারে। লম্বা শুঁড়, পুঞ্জাক্ষি সুগঠিত। এদের পা লম্বা, রোমশ, সরু, এবং জলাভেদ্য। জলাভেদ্য রস দেহ থেকেই ক্ষরিত হয়। জলের ওপর দিয়ে তাই হাঁটাচলা করলেও জলের ওপর কোনো রকম আলোড়ন বা কম্পনের সৃষ্টি হয় না। হাইড্রোমেট্রা ভিটাটা *(Hydrometra vittata)* লম্বা ধাঁচের পোকা, খুবই আকর্ষণীয়, পুকুরেই দেখতে পাওয়া যায়। আর একরকমের জলেভাসা ছারপোকা জাতীয় পোকা হল গেরিস *(Gerris)*, যাদের পেছনের পা অন্য সব পায়ের চেয়ে বেশি লম্বা। হাইড্রোমিট্রা ভিটাটা ও গেরিস উভয়েই একসঙ্গে মহানন্দে দিনের আলোয় জলের ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দৌড়ে বেড়ায়।

ভাসমান-শিকারী কীটপতঙ্গদের মধ্যে সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক বোধ হয় ঘুরঘুরেপোকা গাইরিনিডি *(Gyrinidae)*। দেখেই বোঝা যায়, এরা জলেব ওপর দ্রুত ঘুরপাক খাচ্ছে। আকারে ছোট; চকচকে কালো পোকা; শুঁড় ছোট মাপের। পুঞ্জাক্ষি দুইভাগে বিভক্ত: ওপরের ভাগ জলের ওপরের জিনিস দেখার জন্য, নিচের ভাগ জলের নিচের জিনিস দেখার জন্য। সামনের পা লম্বা। পুরুষ পতঙ্গের সামনের পায়ে চ্যাপ্টা স্পঞ্জের মতো শোষক প্যাড আছে। মাঝের ও পেছনের পা ছোট আর চ্যাপ্টা—সাঁতারের সময় বৈঠার কাজ চলে। শরীরের যে অংশ জলে ডুবে থাকে তা যৌবনের রোমে ঢাকা। শূককীট জলের নিচে থাকে। শ্বাস নেয় কানকোর সাহায্যে। অরেক্টোসেলিয়াম গ্যাঞ্জেটিকাম *(Orectocheilum gangeticum)* পরিচিত একজাতের ঘুরঘুরে পোকা। সমতলে দেখা যায়। আর ডাইনিউটিস ইণ্ডিকাস *(Dineutes indicus)* আকারে বড় আর এক প্রজাতি। সমতল ও পার্বত্য অঞ্চল দুই জায়গাতেই দেখা যায়।

ডুবুরি

পুকুরে, খালে, বিলে, সরোবরে যেসব ডুবুরি কীটপতঙ্গ দেখা যায়, তারা নানা জাতের। এদের মধ্যে আছে বহু জলচর কীটপতঙ্গের শূককীট। যেমন মেফ্লাই, স্টোনফ্লাই জলফড়িং, ক্যাডিসফ্লাই ও মশা। আর আছে বহু পূর্ণ জলচর পোকা, যেমন জলমাঝি, জলচর কাঁকড়াবিছে, করিক্সিড, নটোনেকটিড এবং নকোরিড।

মেফ্লাই এর শূককীট সত্যই জলচর। শ্বাসনালীস্থিত কানকোর সাহাযো এরা শ্বাস নেয়। কানকোর অবস্থান পেটের দুইপাশে। সম্পূর্ণ জলের তলায় থাকে আর শ্যাওলা জাতীয় জলজ উদ্ভিদ খায়। এদের বৃদ্ধি হয় ধীরে, বহু মাস ধরে। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় মেফ্লাই খেতে পারে না, কয়েকঘণ্টার বেশি বাঁচেও না। এদের পাকস্থলী ও খাদ্যনালীতে বাতাস ভরা থাকে যাতে ওড়ার সময় দেহের প্লবতা বৃদ্ধি পায়। জল থেকে পূর্ণাবয়ব পতঙ্গ বেরিয়েই ঝাঁকে ঝাঁকে সোজা ওপরে উঠে যায়; স্ত্রী ও পুরুষ পতঙ্গ মিলনের আগে উড়ে উড়ে নৃত্য করে, উড়ন্ত অবস্থাতেই পরস্পর মিলিত হয়। মিলনের পরই মারা যায় পুরুষ, আর স্ত্রী ডিম পাড়ার জন্য জলের সন্ধান করে। ডিম পাড়ার পর সেও মারা যায়।

জলফড়িং বা গয়ালপোকার জলজ শূককীট অত্যন্ত শক্তিশালী লুঠেরা। এদের লম্বা

নিচের চোয়ালের গড়ন ঠিক ভাঁজ করা কনুইয়ের মতো, আগার কাছে আংটা দিয়ে আটকানো। আগায় ছোট ছোট দাঁতও আছে। নিচের চোয়াল মুখোসপরা বিষদাঁত। অসতর্ক শিকারকে ধরার এই হল ব্রহ্মাস্ত্র। শূককীট সাধারণত শিকার ধরার আশায় সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে অপেক্ষা করে। নাগালের মধ্যে শিকার এলেই বিদ্যুৎ-ঝলকে মুখোস খুলে যায়, দাঁত বাইরে বেরিয়ে আসে। দাঁত ও আংটার মধ্যে তখন অসহায় শিকার আটকে যায়। শিকার সমেত মুখোস গুটিয়ে নিশ্চিন্তে চলে আহারের পালা। কানকোর সাহায্যে এরা শ্বাস নেয়। কানকোই এদের লেজ, দিকনির্দেশক যন্ত্রও। হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে সামনের দিকে জল কেটে এগিয়ে যায়। সাঁতারের সময় পিচকিরির মতো তীব্র বেগে এদের মলদ্বার দিয়ে জল বেরোয়।

পূর্ণাঙ্গ গয়ালপোকা বড় মাপের বাতাসে-ওড়া পতঙ্গ। পছন্দ করে প্রখর সূর্যালোক। উড়তে পারে অত্যন্ত নিপুণভাবে। বহু গয়ালপোকা সুন্দর উজ্জ্বল রঙের। নকশাকাটা, বুটিদার। শরীর চকচকে চিত্রাভ। অধিকাংশই বিরাটকায়, তাদের ডানার বিস্তার প্রায় 10 সেন্টিমিটার। মাথা জোড়া বিরাট বিরাট চোখ। মাথায় যেন শুধু চোখ। চোখের সাহায্যেই এরা ছোট্ট ছোট্ট মশা দেখতে পায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে। পায়ে শক্ত লম্বা কাঁটা। দীর্ঘ সময় ওড়ার পর কাঁটাগুলো দিয়ে কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে বিশ্রাম নেয়। পা দিয়েই ঝাঁপি বানিয়ে এরা খাদ্যবস্তু যেমন মশা ইত্যাদি উড়ন্ত অবস্থায় সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখে, বয়ে নিয়ে যায়। এইভাবে একশোর মত মশা ঝাঁপিতে জমা করে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। ভারতে পরিচিত গয়ালপোকা হল অর্থেট্রাম *(Orthetrum)*, গোমফাস *(Gomphus)*, লিবেল্যুলা *(Libellula)* আর অ্যাগ্রিয়ন *(Agrion)*।

জলচর ছারপোকা

শূককীট ও পূর্ণাঙ্গ দুই অবস্থাতেই এরা জলে বাস করে। বয়স্কদের ডানা খুবই উন্নতমানের। বর্ষাকালে বৃষ্টির পরে রাত্রিবেলা আলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উড়ে যায়। রাক্ষুসে লুঠেরা জীব, বহু কীট পতঙ্গের দেহের রস, এবং মানুষ, মাছ, ব্যাঙাচি ও ব্যাঙের রক্ত খায়। বেশির ভাগেরই সামনের পা শক্ত চিমটের মতো, শিকার চেপে ধরে যাতে সহজে রক্ত খাওয়া যায়। পেছনের পা এমনভাবে গঠিত যা সাঁতার কাটার সময় বৈঠার কাজ করে। খানিকক্ষণ পর পর এরা জলের ওপর ভেসে উঠে, বাতাস টেনে নেয়।

সর্বাধিক পরিচিত জলচর ছারপোকা হল জলবিছা, করিক্সিড, পেছন-সাতারু, এবং দৈত্যাকার জলমাঝি।

জলবিছেরা ল্যাকোট্রিফিস *(Laccotrephes)* ও রানাট্রা *(Ranatra)* জাতের। পা ঠিক কাঁকড়াবিছের দাঁড়ার মতো। মিল শুধু তাই নয়, এদের পেছনে নলাকৃতি লেজও আছে। লেজ আসলে নলের কাজ করে। অর্থাৎ বাইরের প্রকৃতি থেকে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় টাটকা বাতাস টেনে নেয়। ল্যাকোট্রিফিস হল ভারতের নেপা বা জলবিছে। চ্যাপ্টা। ধূসর কালচে রঙের। শরীরের দুইপাশ সমান্তরাল। মোটাসোটা, আঁকশির

মতো সামনের পা। নল দিয়ে বাতাস চলে যায় পিঠ ও ডানার মাঝের প্রশস্ত জায়গায়। এই জায়গাতেই শ্বাসনালীর বাইরের দিকে আছে মুক্ত অংশ, যাতে শ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা হয়। রানাট্রা সরু আকারের ছারপোকা প্রায় 4.5 সেন্টিমিটার লম্বা। করিক্সিডরা ছোট মাপের, সামনের পা ছোট। বর্ষাকালে আলোর দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে আকৃষ্ট হয়। বৈদ্যুতিক আলোর নিচে কখনও দুইঘণ্টায় ঝুড়িঝুড়ি পোকা জোগাড় করা যায়। নটোনেকটিড ছোট মাপের। উল্টিয়ে সাঁতার দেয়। এদের নাম তাই উল্টো-সাতারু। বেলোস্টোমা ইন্ডিকাম *(Belostoma indicum)* বা দৈত্যাকার জলমাঝি (অপর নাম 'পায়ের বুড়ো আঙুল খেকো') আকারে বৃহত্তম। গড়নে চ্যাপ্টা, গাঢ় সবুজ রঙের সামনের পা হয়েছে আবিষ্ট অঙ্গ, আর পেছনের পা বৈঠা। মানুষকে এরা জোরে কামড়ে ধরে। সোনা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, ব্যাঙাচি ও মাছের রক্ত পান করে। এরাও গাদা গাদা আলো দেখে আকৃষ্ট হয়। পুকুরের স্ফেরোডেমার *(Sphaerodema)* পুরুষেরা শূককীট বেরোনো পর্যন্ত ডিমকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

জলচর গুবরেপোকা

উল্লেখযোগ্য প্রজাতি হল ডাইটিসিড ও হাইড্রোফিলিড। প্রথমটা অধিকাংশই ডিম্বাকৃতি। ডানা ও ধড়ের মাঝখানে শ্বাসপ্রশ্বাসের বাতাস বহন করে। মাংসাশী। অনেক সময় নিশাচর। সাইবিস্টার কনফ্যুসাস *(Cybister confusus)* বড় কালো জাতের গুবরেপোকা। দেহের দুই পাশে বাদামি ডোরা। পরিষ্কার জলে বিশেষত ধানক্ষেতের জমা জলে ভারতের সর্বত্র এদের দেখা যায়। আর একটা ছোট আকারের পরিচিত প্রজাতি হল এরিটিস স্টিকটিকাস *(Eretes sticticus)* যাদের শূককীট আবার মশার শূককীট খায়। হাইড্রোফিলিডরা দেখতে অনেকটা ডাইটিসিড এর মতোই। কিন্তু নিরামিষাশী। হাইড্রোফিলাস *(Hydrophilus)*, হাইড্রাস *(Hydrous)* ও বেরোসাস *(Berosus)* ধানক্ষেতে, দীঘিতে আর পুকুরে দেখা যায়।

ক্যাডিসফ্লাই

পূর্ণাঙ্গ ক্যাডিসফ্লাই নভোচর মথের মতো। সন্ধ্যায় বা রাতে উড়তে পছন্দ করে। বিশেষ ভাবে নজর কাড়ে এদের রোমশ ডানা। এদের শুঁড় পাকানো নয়। এরা ম্লান নিষ্প্রভ। বিশেষজ্ঞরাই কেবল কৌতূহলী।

পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের তুলনায় শূককীটের পরিচিতি বেশী। এরা জলচর ক্যাডিস-কীট। প্রাণীতত্ত্ববিদদের কাছে এদের স্বভাব, প্রবৃত্তি ইত্যাদি জীববিদ্যার সকল সমস্যা বিশেষ গবেষণার বস্তু। গবেষণার বিষয় প্রাণী-মনস্তত্ত্ব।

ক্যাডিস-পোকা কাঠি, পাতার টুকরো, চিবানো লতাপাতা, বালি, নুড়ি, রঙবেরঙা পাথরের টুকরো আর ছোট ছোট শামুকের খোল দিয়ে সরু লম্বাধাঁচের রেশম সুতো জড়ানো ঘর তৈরি করে। তার ভেতরেই বাস করে। যেখানেই যায় বাসা বয়ে নিয়ে যায়।
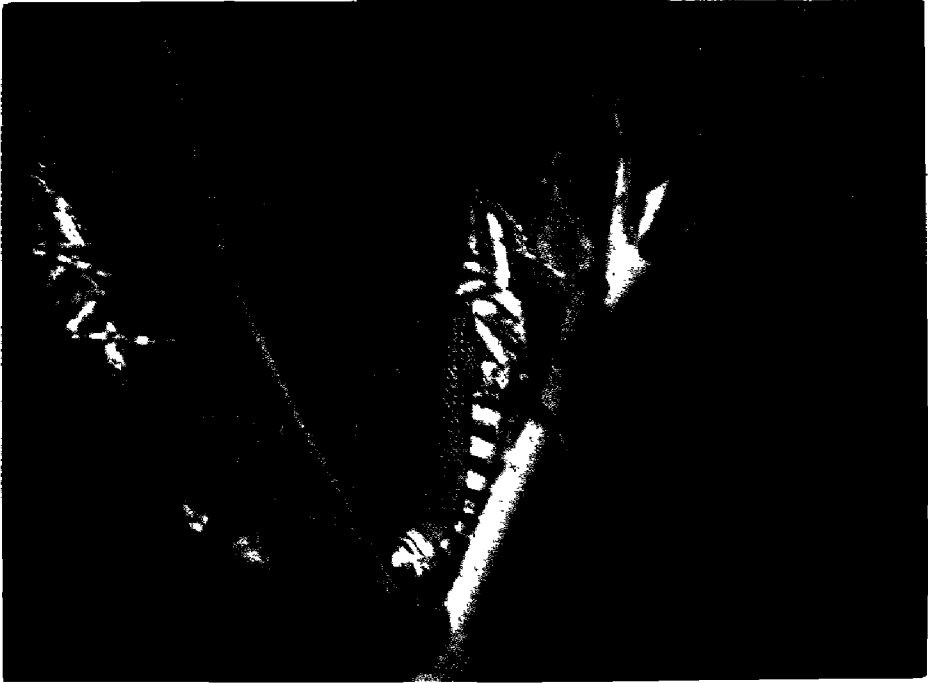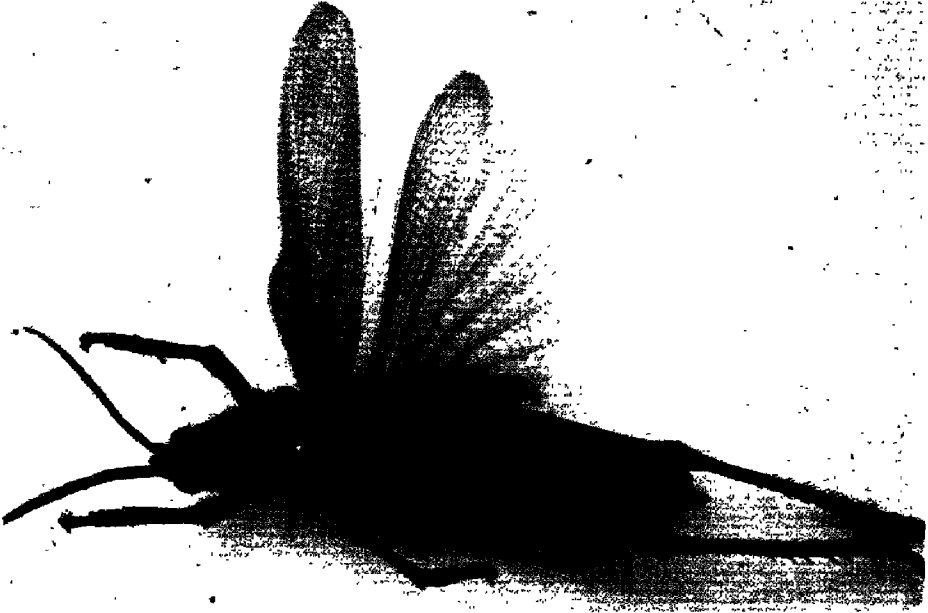
1. মিল্ক উইডের সাধারণ রঙিন ঘাসফড়িং, *পেসিলোসেরাস পিকটাস*

2. সাধারণ লাল কটনবাগ *ডাইভারকাস সিঙ্গুলাটাস*—জবাগাছের পাতায় সঙ্গমরত
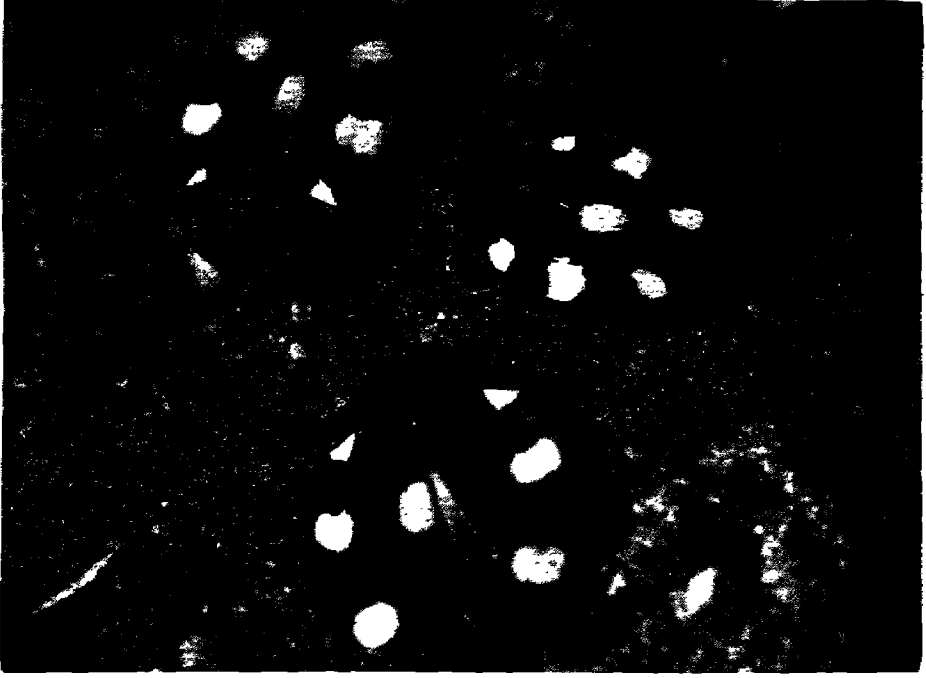
3. ওপরে : *করিডিয়া পেটিভ্যারিয়ানা।* অপূর্ব সুন্দর সাতটি সাদা বিন্দুবিশিষ্ট আবশোলা, জঙ্গলের মাটিতে ঝরাপাতায় যার বাস
নীচে : *অ্যানথিয়া সেক্সগুটাটা :* ছয়টি সাদা বিন্দুবিশিষ্ট সাধারণ টাইগার বীটল
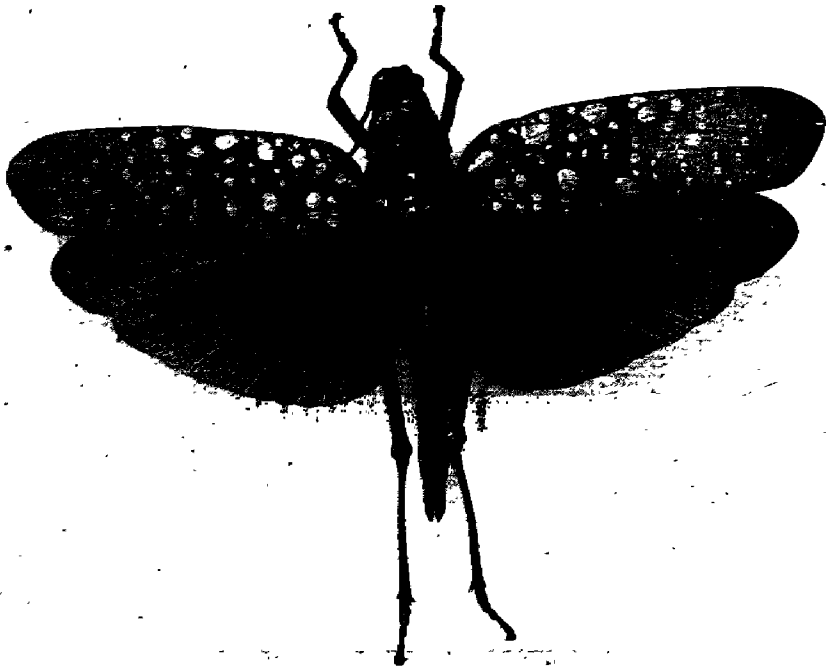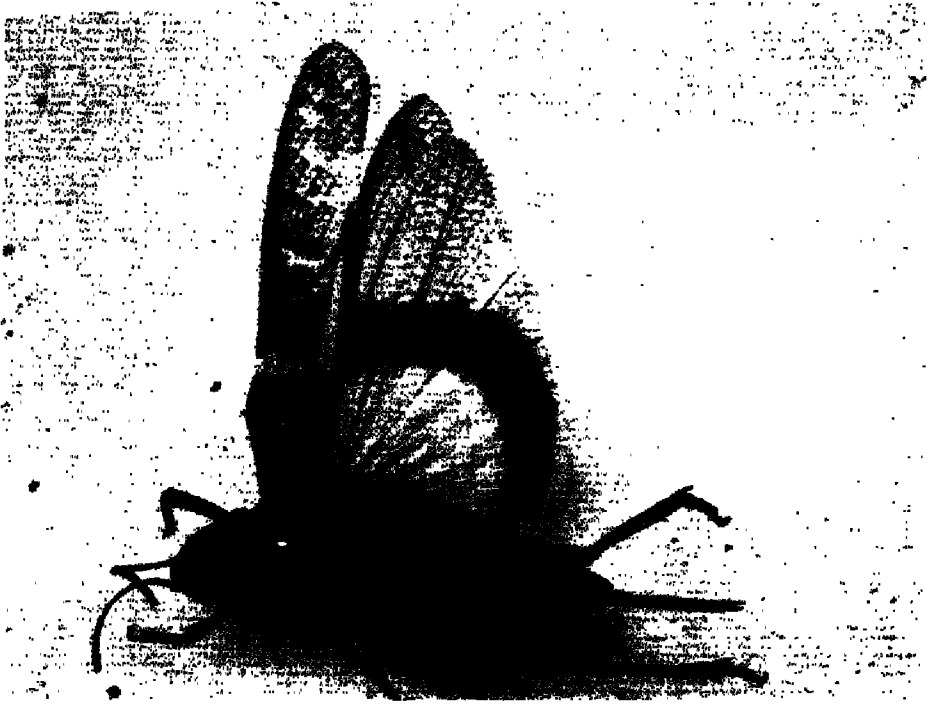
4. ওপরে : হলুদ পাখনা বিশিষ্ট ঘাসফড়িং *গ্যাসট্রিমারগাস মারমোটেরাস*
নীচে : উজ্জ্বল কমলা রঙের বিন্দুযুক্ত কালো পাহাড়ী ঘাসফড়িং *অলারচেস মিলিয়ারিস*, কফি ক্ষেতে যাদের প্রায়ই চোখে পড়ে
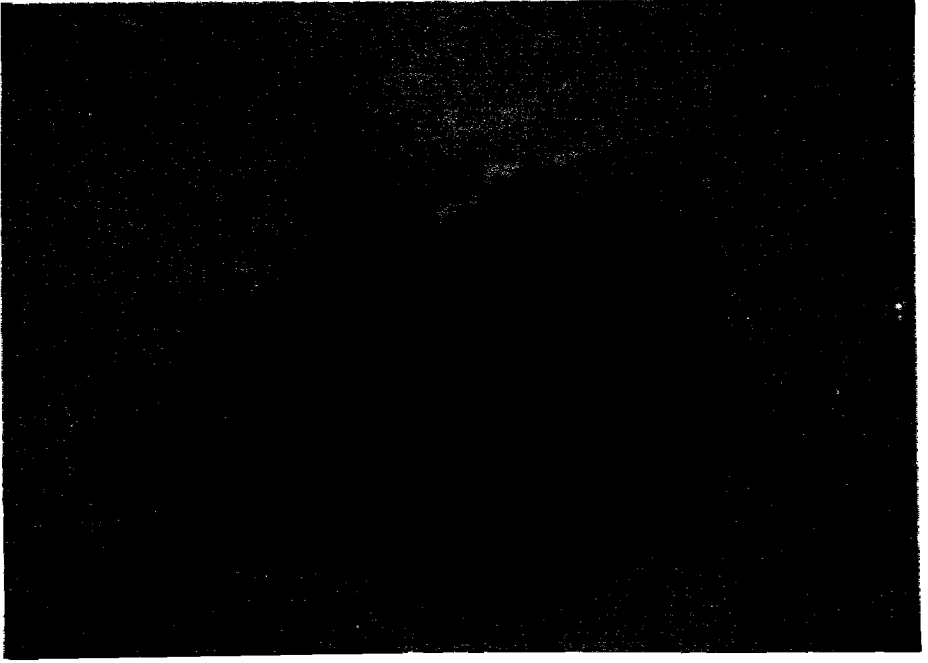
5. ওপরে : ধাতব সবুজ বর্ণের বিন্দুবৈচিত্র্যময় স্কালেটারিড বাগ, *ক্রাইমোকোরিস*
নীচে : পূর্ণবয়স্ক সিকাডা

6. ওপরে : *কাড়্‌বাগ মার্নব্রাসিড,* তেলেঙ্গানা অ্যাকেসিয়ার নরম কাণ্ডে
নীচে : অপূর্ব সুন্দর ধাতব নীল-সবুজ জুয়েল বীটল *স্টার্নোস্পেরা*

7. ওপরে : অদ্ভুত শৃঙ্গযুক্ত বীটল *জাইলোট্রুপস গিডেওন।* পূর্ব হিমালয়ের বাসিন্দা
নীচে : সাধারণ ককশেফার বীটল. মাটিতে খাদ্যের সন্ধানে
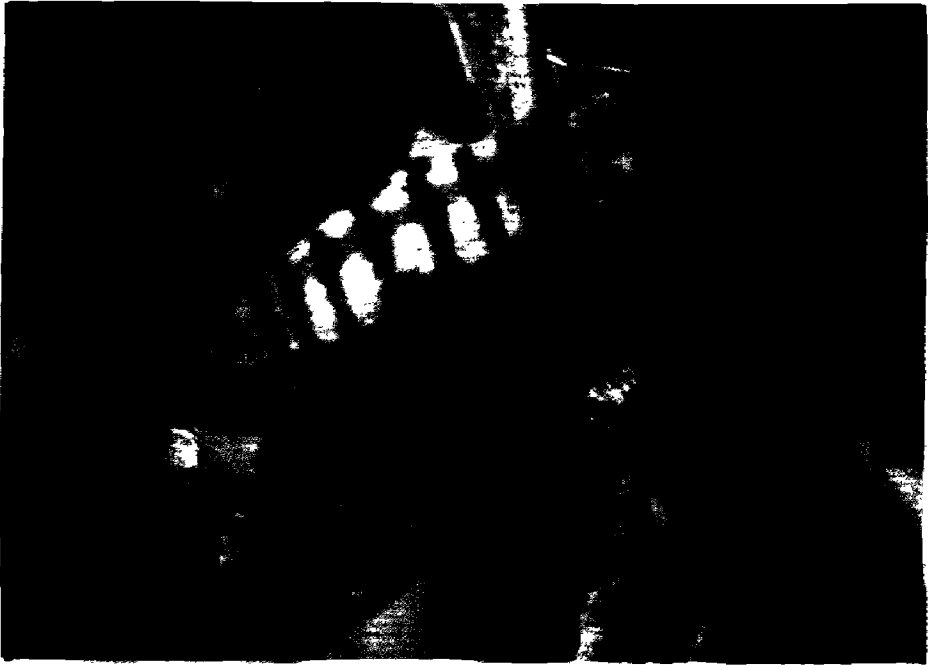
৪. ওপরে : সাধারণ ফলের রস শোষক মথ *ওফিডেরেস*, পূর্ণাঙ্গ মথ ফল ফুটো করে নিয়ে রস পান করে
নীচে : সাধারণ ডেথ্‌স্ হেড মথ *অ্যাকারনসিয়া স্টাইক্‌স্*

9. সাধারণ প্রজাপতি

ওপরে: *প্যাপিলিও পলিটেস রম্যুলাস* (পুরুষ)

নীচে: *প্যাপিলিও ডেমোলিয়াস*। ল্যানটানা ফুলের মধু পান করছে

10. ওপরে : *গ্রাফিয়াম অ্যান্টিফেটস*
নীচে : *গ্রাফিয়াম অ্যাগামেমনন*

11. সাধারণ প্রজাপতি

ওপরে : *বিবলিয়া লিথিয়া*

নীচে : *প্যাপিলিও হেলেনাস হেলেনাস*
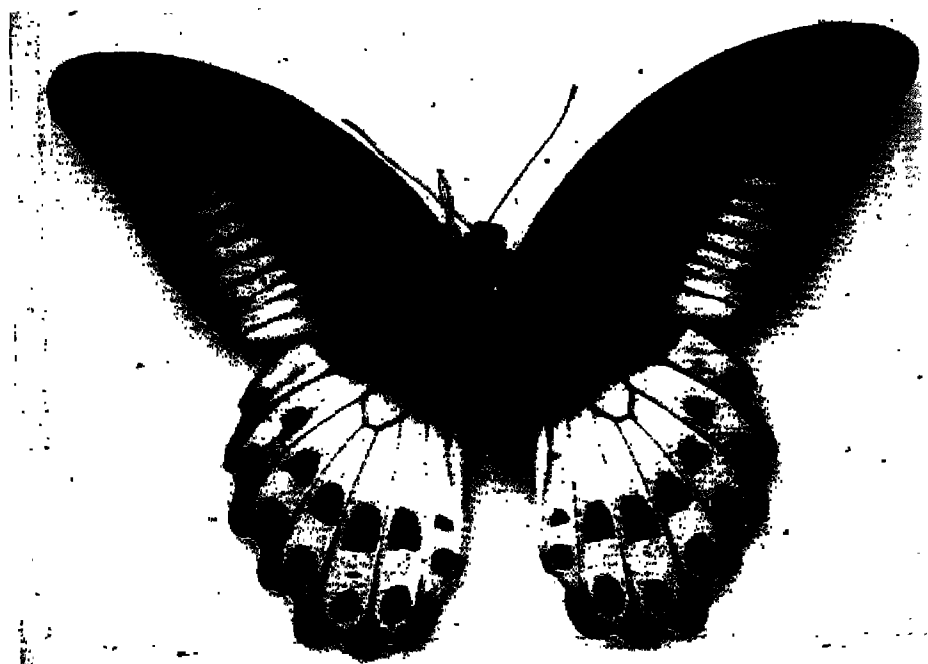
12. ওপরে : *প্যাপিলিও পলিমেনস্টর পলিমেনস্টর*
নীচে : *প্যাপিলিও ক্রাইনো*
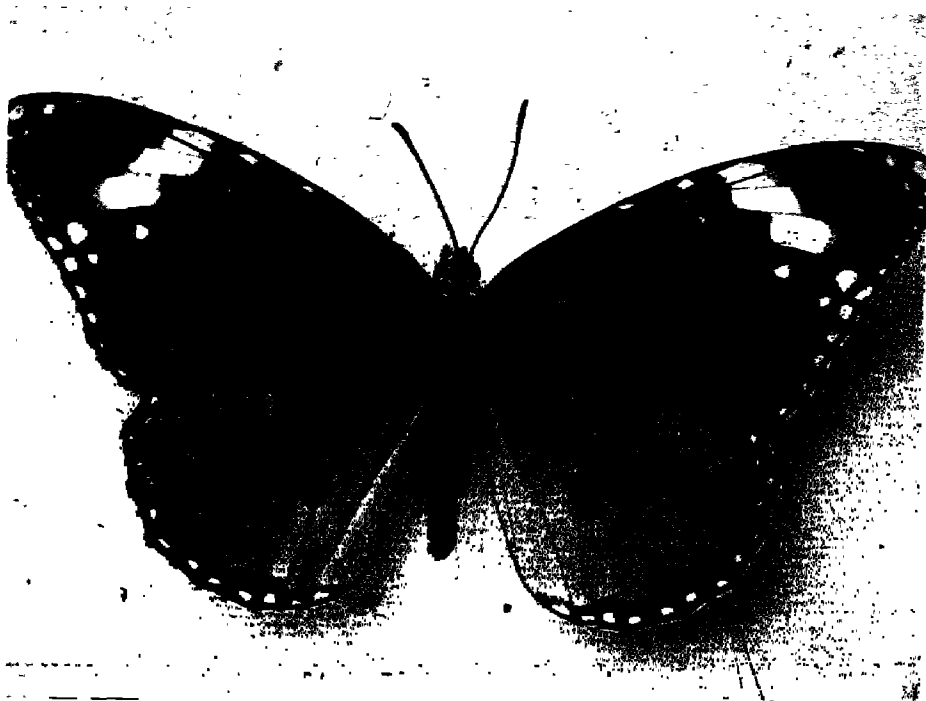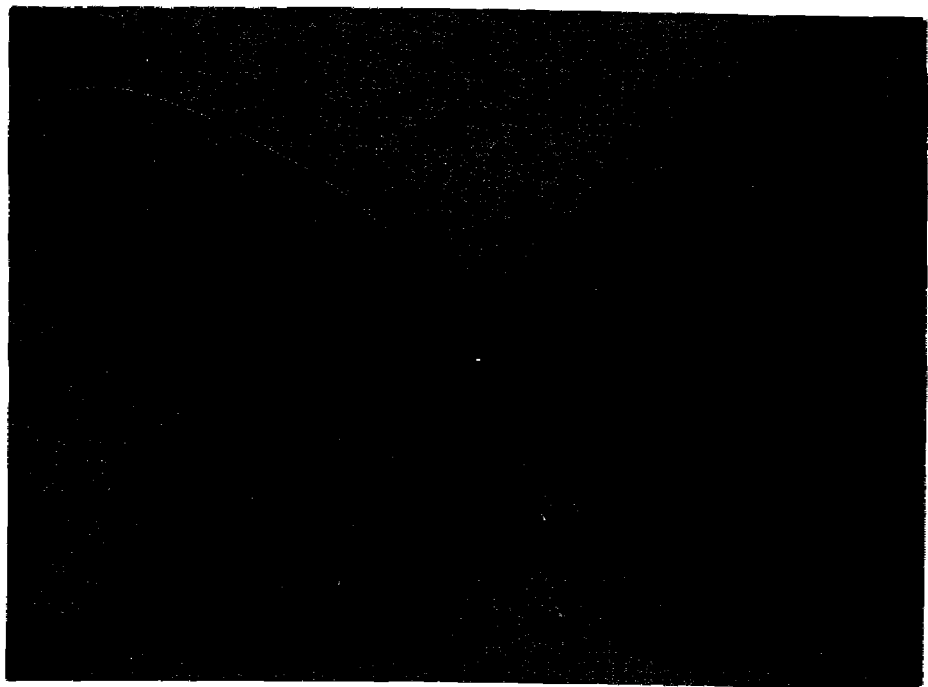
13. সাধারণ প্রজাপতি

ওপরে : *আইডিয়া লিনসেয়াস* (নীলগিরি অঞ্চল)

নীচে : প্লেইন টাইগার *ড্যানায়ুস ক্রিসিপাস*
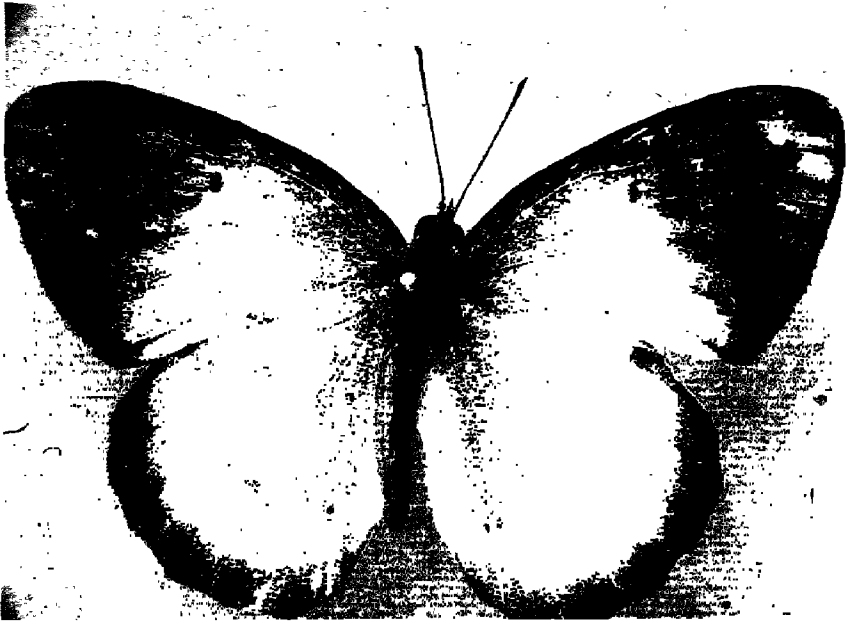
14. ওপরে : মিল্ক উইড প্রজাপতি *ড্যানায়ুস ডেনুসিয়া*
নীচে : *কলোটিস ডানা*
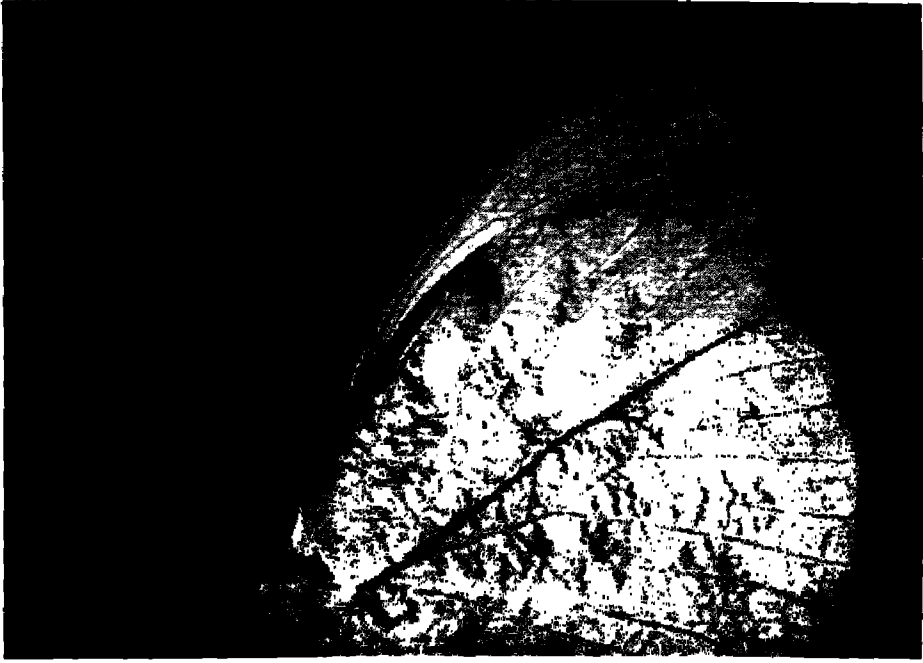
15. সাধারণ প্রজাপতি

ওপরে : *হেবমইয়া গ্লাসিপ অস্ট্রালিস* (নিম্নপার্শ্বস্থ দৃশ্য)

নীচে : *প্রেসিস আলমানা*
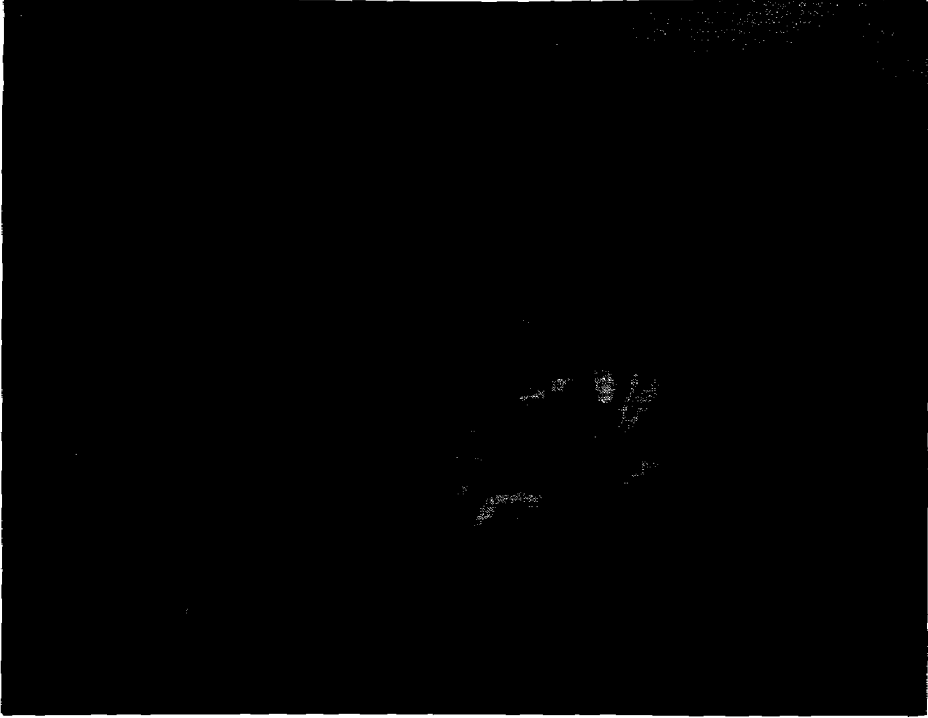
16. ওপরে : কসমস ফুলে মধুপানরত *প্রেসিস*
নীচে : সাধারণ নাবিক প্রজাপতি *নেপটিস হার্ডোনিয়া হার্ডোনিয়া*

নরম শুঁয়োপোকার মতো দেখতে এই ক্যাডিস-পোকা। তিন জোড়া পা সংযুক্ত থাকে ধড়ের সঙ্গে। সরু সরু তারের জালের মতো কানকো থাকে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য। লেজের শেষপ্রান্ত আঁকশির মতো বাঁকানো, যাতে দরকার মতো শূককীট নিজের দেহকে আটকে রাখতে পারে। সামান্যতম বিপদের আশঙ্কা দেখলেই ক্যাডিস-পোকা বাসার ভেতর আত্মগোপন করে, এবং প্রবেশপথের মুখে রেশমের সুতোয় বোনা ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। পোকা এই অবস্থায় সব রকম আক্রমণ থেকে নিরাপদ। আকারে যত বড় হয়, বাসার মাপও সেইমত বাড়ায়। বাসার আকৃতি, ওজন, ও বাসা বানাবার মালমশলা শুধু নিজেদের আকার অনুযায়ী বদলায় না, যে জলে এরা বাস করে সেই জলের প্রকৃতি অনুযায়ীও বদলায়। অর্থাৎ দেখে—জল স্থির, না সামান্য স্রোত আছে, না অত্যন্ত খরস্রোতা। দীঘিতে, পুকুরে, হ্রদে বা অন্যান্য স্থির জলে এমন কি সামান্য স্রোত আছে এমন ছোট নদীতে এরা বাসা বানায়। অপেক্ষাকৃত হালকা বস্তু যেমন, গাছের আঁশ পাতলা কাঠি, ইত্যাদি সুন্দর করে ছোট ছোট করে কেটে পরপর সাজিয়ে রেশম জাতীয় সুতো দিয়ে বাঁধে। এতে বাসা ভেঙে বা গুঁড়িয়ে যাবার ভয় থাকে না। স্রোতের টান থাকলে বা যে পুকুরের জল আলোড়নের সম্ভাবনা আছে, সেখানে বাসা তৈরি হয় অপেক্ষাকৃত ভারি জিনিস যেমন নুড়ি ইত্যাদি দিয়ে, যাতে স্রোতের টানে বাসা ভেসে না যায় বা ঢেউয়ের ধাক্কায় বাসার যাতে ক্ষতি না হয়। বাসার আকার বেশির ভাগ সময়ই চোঙার মতো। তবে পেছনের অংশের থেকে সামনের অংশ বেশি চওড়া যাতে সহজে দেহের সামনের মোটা অংশ আর মাথা বাইরে বের করা যায়। অনেক বাসার আকার চৌকোণা। সামনের দিকে খোলা। পেছন থেকে বন্ধ। পেছনদিকটা অপেক্ষাকৃত সরুও। ক্যাডিস-পোকার বহু প্রজাতি দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে। নদীতে, সেচের খালে-বিলে, রেশমের তাঁবুর মতো বারোয়ারি বাসা বানিয়ে বাস করে। তাঁবু আবার শিকার ধরার ফাঁদও বটে। এরা শ্যাওলা ও জলজ উদ্ভিদ খায়। মাংসাশীও বটে। অন্যান্য জলচর কীটপতঙ্গের শূককীটও ধরে খায়। পাওয়া যায় ধানক্ষেতে, দীঘিতে, পুকুরে, হ্রদে, সংরক্ষিত জলাধারে, সেচনালীতে, নদী-নালাতে। এদের বসবাস ভারতের সর্বত্র সমতলে, পাহাড় পর্বতে, এমন কি দুর্গম হিমালয়েও।

মশা

পরিচিত মশা শিশু অবস্থায় সম্পূর্ণ জলচর। প্রাপ্তবয়স্করা নভোচর। দিনের বেলা অন্ধকার কোণে থাকে লুকিয়ে। রাত বাড়লেই দলে দলে বেরিয়ে এসে রক্ত খায়। তবে মশার শূককীট আর গুটি পোকা জলেই বাস করে।

মশার শূককীট ও গুটিপোকা সব রকম জলে দেখতে পাওয়া যায়, ছোটই হোক, অস্থায়ীই হোক। অবাধে পুকুরে, ডোবায়, বর্ষার কাদাজলে, নালায়, খালে, নদীতে, মায় গাছের গর্তের জমা জলে, কুয়োয়, দীঘিতে, সরোবরে, সর্বত্র এদের বিচরণ। শূককীট যদিও সম্পূর্ণ জলচর, শ্বাস কিন্তু নেয় বাইরের বাতাস থেকে। সরাসরি। তাই

শূককীট ও গুটিপোকা জলের ওপর ভেসে ওঠে। যতক্ষণ না বাতাস নেওয়া শেষ হচ্ছে ততক্ষণ জলের ওপরে থাকে। শরীরের শেষ ভাগে, লেজের কাছে, আছে ছোট্ট নল। তাতে আবার সরু সরু জলাভেদ্য রোম। জলে ভাসমান অবস্থায় নলটা থাকে খোলা। এটাই শ্বাসযন্ত্রের কাজ করে। শূককীট পাতলা লম্বা পেটের ঝাপ্‌টা দিয়ে সাঁতার কাটতে পারে। মুখের কাছে বুরুশের মতো একটা জিনিস, যা দিয়ে স্রোত সৃষ্টি করতে পারে, যাতে খাবারের টুকরো মুখে পোরা যায়। মৃত জৈব পদার্থ, শৈবাল, খুদে গাছগাছালি ও খাদ্যকণা এদের খাবার। অনেক শূককীট আবার অন্য শূককীট খায়, সাধারণত ছোট মশার শূককীট। ডাঁশ ইত্যাদি অন্যান্য কীটপতঙ্গের জলচর শূককীটকেও আক্রমণ করে। মশার শূককীটেরা বাড়ে দ্রুত। তিন-চারবার খোলস বদলায়। এবং ছোট্ট, মোটা, কুঁজো, 'কমা' চিহ্নের মতো দেখতে গুটিপোকায় পরিণত হয়। মশার গুটিপোকার পিঠের ওপরে সামনের দিকে শিঙের মতো, যা দিয়ে এরা বাতাস গ্রহণ করে। বাতাস গ্রহণের সময় এরা জলের ওপর ভেসে ওঠে। এদের লেজে রয়েছে পাখনা। দাঁড়ের কাজ করে, সাঁতার কাটে।

এদেশের জলাশয়ে সাধারণত দুই ধরনের মশার শূককীট দেখা যায়: কিউলিসিন ও এনোফিলিন। মানুষ, বানর ও পাখির দেহে ম্যালেরিয়া জ্বর সংক্রমণ করে এনোফিলিন মশা। আর কিউলিসিন মশা ছড়ায় ভারতে ফাইলেরিয়া এবং অন্যান্য দেশে পীতজ্বর। একমাত্র স্ত্রীমশাই কামড়ায়, রক্তপান করে। পুরুষ মশা খাদ্য গ্রহণে অক্ষম; তবে গাছের রস খেতে পারে। ম্যালেরিয়া ছড়ায় বলে মশাকে আমরা দোষারোপ করি বটে, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্লাসমোডিয়াম *(Plasmodium)* মানুষের মতো এনোফিলিস মশাকেও একইভাবে আক্রমণ করে। এদের অন্ত্রে গ্যাস্ট্রিক টিউমারও হয়। একই কথা খাটে ফাইলেরিয়া রোগজীবাণু বাহক কিউলেক্স মশার ক্ষেত্রেও। ফাইলেরিয়া রোগজীবাণু এদেরও আক্রমণ করে। ভারতে পরিচিত মশা হল কিউলেক্স, ইডিস ও এনোফিলিস। মশা ছাড়াও অন্যান্য বহু নিরীহ মাছি যারা দংশন করে না, এবং ছোটবড় ডাঁশের শূককীটও জলচর।

ছোট নদীর কীটপতঙ্গ

ছোট নদীর কীটপতঙ্গের জীবনযাত্রা পুকুর বা অন্যান্য স্থির জলের কীটপতঙ্গের থেকে মূলত আলাদা। ছোট নদীতে সবসময়ের জন্য স্রোতের টান থাকে, স্থির জলাশয়ে তা থাকে না। স্রোতের টানে কীটপতঙ্গের ভেসে যাবার ভয় থাকে। এরা চায় অবলম্বন। চায় কোনোভাবে জলে ডোবা পাথরনুড়িকে আঁকড়ে থাকতে। দেহের আঁকশি দিয়ে, শোষকযন্ত্র দিয়ে। দেহের গঠনও এমন যাতে স্রোতের সঙ্গে কিছুটা যুঝতে পারে। স্রোত জোরালো হলে এরা ডুবে থাকা পাথর বা নুড়ির নিচে লুকিয়ে পড়ে। স্টোনফ্লাইয়ের শূককীট দেখা যায় ছোট পাহাড়ে নদীর জলের তলায়, পাথরের আড়ালে।

এরা বাড়ে খুবই ধীরে—লাগে প্রায় এক বা দুই বছর। খুব শীতে সন্ধ্যার সময় বয়স্করা বেরিয়ে পড়ে। নদীতে তখন ভাঁটা, জল নেমে গেছে। সেই সুযোগে বড়

বড় শূককীটগুলো পাড়ে উঠে আসে, এবং ডানাযুক্ত পূর্ণাবয়ব স্টোনফ্লাইতে পরিণত হয়। বরফগলা জলে, বিশেষভাবে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের নদীতে, এদের দেখা যায়। হিমালয়ে স্রোতের টান যেসব নদীতে বেশি, সেখানে পাওয়া যায় ব্লেফ্যারোসেরিড ফ্লাই *(Blepharocerid flies)*-এর শূককীট। দেহের নিচে পরপর সাজানো পেয়ালার মতো শোষকযন্ত্র থাকে যা দিয়ে স্রোতের টান থেকে আত্মরক্ষার জন্য ডুবন্ত পাথরে নিজেদের আটকে রাখে। তাদের দেহের ওপর দিয়ে সেকেণ্ডে এক বা দুই মিটার গতিবেগে জল বয়ে গেলেও তারা অক্ষতই থাকে। স্রোতের জলে আবর্জনা ধুয়ে মুছে যায়, অক্সিজেন পাওয়া যায় প্রচুর, এবং ভেসে আসে প্রয়োজনীয় খাদ্যকণাও। তাই এইসব শূককীটের শ্বাসযন্ত্র কানকো অত উন্নত নয়। তবে কাজ চলে যায়। এদের শরীর ঘনবিন্যস্ত, পা ছড়ানো নয়। এতে স্রোত আটকায় সামান্যই। স্রোতের জলের শূককীটকে বদ্ধ স্থির জলে রাখলে অক্সিজেনের অভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যাবে।

অষ্টম অধ্যায়

মরু অঞ্চলের কীটপতঙ্গ

মরুভূমি এমনই এক অঞ্চল যেখানে বৃষ্টিপাত অতি সামান্য। অথবা হয়ই না। হয়তো এক বছর অল্প বৃষ্টি হল, খরা গেল পরপর বেশ কয়েক বছর। একেবারেই উষর। কাঁটা ঝোপ, গুল্ম ছাড়া তেমন গাছপালাও নেই। কখনও তাপমাত্র কম, আবার কখনও কাঠফাটা গরম—তাপমাত্রা 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড-এরও ওপর। বাতাসে আর্দ্রতা কম বলে প্রখর সূর্যালোকে মাটি খুব সহজেই গরম হয়ে যায়। রাতের বেলায় দ্রুত তাপ বিকিরণ হয় বলে মাটি শীতল হয়ে যায়। এমনকি তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রী তাপাঙ্কেরও নিচে নেমে যায়। সারাদিন ধরে তাপমাত্রার ওঠানামা তাই খুবই বেশি। বাষ্পীভবনের হার এত দ্রুত যে গাছপালা প্রাণীদেহ বেশ অনেকটা শুকিয়ে যায়। তাই সবাইকে দেহের জৈবতরল সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়।

ভারত প্রধানত বৃষ্টিপ্রধান দেশ। গাছপালা ও জীবজন্তুর আধিক্য বৃষ্টিনির্ভর। বৃষ্টিপাত যেখানে বেশি, গাছপালা, জীবজন্তুর বাসও সেখানে বেশি। রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের হার অত্যন্ত কম, বিকানীরের কিছু কিছু অঞ্চলে আবার বছরের পর বছর বৃষ্টিপাতই হয় না। এইসব অঞ্চল তাই আধা-মরুভূমি, ছড়িয়ে গেছে পশ্চিমে সিন্ধু, আরব ও সাহারায়।

অনেকেরই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, মরুভূমিতে প্রাণের স্পন্দন দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব অঞ্চলে বহুরকম বিশেষ ধরনের জীবজন্তুর বাস রয়েছে। অন্যান্য স্থানের মতোই মরুভূমিতে কীটপতঙ্গের আধিপত্যই বেশি।

ভারতের মরু অঞ্চল নানা কারণে কৌতূহল জাগায়। বিশেষ উল্লেখ্য কীটপতঙ্গের বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা। দিনের বেলা প্রখর তাপের হাত থেকে বাঁচতে কীটপতঙ্গ সাধারণত মাটির নিচে, গভীর গর্তে থাকে। অথবা খর্বাকৃতি গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে। রাত হলেই খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসে। মরুভূমির বেশির ভাগ কীটপতঙ্গই মাটি খোঁড়া ও সুড়ঙ্গ বানানোর কাজে দক্ষ। আলগা ঝুরঝুরে বালির ওপর এরা খুব দ্রুত দৌড়তেও পারে। অনেকে আবার শুষ্কতা ও তাপের হাত থেকে বাঁচতে বাবলা জাতীয় কাঁটাগাছের ফাঁপা কাণ্ডে ও কাঁটার ভেতর বাসা করে থাকে।

রাতে যদি টর্চ হাতে মরুভূমিতে হাঁটো, দেখবে কত জাতের ঝিঁঝিঁপোকা, গুবরেপোকা, আরও কত অচেনা পোকামাকড়। সবাই বালির ওপর ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে, শত্রুপক্ষের হাত থেকে পালাচ্ছে, খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে, বা ঠাণ্ডা বাতাস উপভোগ করছে। মরুভূমি দিনে ঘুমোয় আর রাতে জাগে। দিনের বেলা মরুভূমিকে দেখলে যেন মনে হয় মৃত।

বছরের যে সময়ে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে, তখন কিছু কিছু কীটপতঙ্গ মাটির নিচে অসাড় অবস্থায় কাটায়। এর নাম গ্রীষ্মযাপন। নিষ্কৃতি শীতকালে। সকলেই বাতাস ও মাটির উচ্চ তাপমান সহ্য করতে পারে। জঙ্গলের বা বাগানের পোকামাকড় এত গরম সহ্য করতে পারবেই না। মারা পড়বে। অনেকে অবলীলায় খুশিমনে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেও থাকে জলন্ত বালির ওপর। পরিচিত অনেক কীটপতঙ্গ কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচে না।

মরু অঞ্চলের জলের অভাব কীটপতঙ্গরা নানা উপায়ে মেটায়। অনেকে মরুদ্যানের কাছাকাছি বাস করে, পারতপক্ষে জল থেকে দূরে যায় না। অধিকাংশই, অবশ্য, যৎসামান্য বা বিনা জলেই কাজ চালিয়ে দেয়। এবং আপাতদৃষ্টিতে শুকনো খাবার থেকেই যে রসটুকু পায় তাই দিয়েই চালিয়ে নেয়।

খাবার যত শুকনোই হোক না কেন, সামান্য জল তাতে থাকেই। তাছাড়া খাবারের অন্যতম রাসায়নিক উপাদানও জল। মরুভূমির কীটপতঙ্গের দেহ গঠন এমনই যে সেই জলের উৎসের সন্ধান তারা পায়।

মরু কীটপতঙ্গের শরীর থেকে জমা জল কখনই বাইবে বেরোয় না, কারণ এদের ত্বক কঠিন, অভেদ্য। এই ত্বক জলেব নিঃসরণ থামায় বা বন্ধ করে। আবার একই সঙ্গে ত্বক যাতে বাতাস থেকে জল টেনে নিতে পারে সেই ব্যবস্থাও আছে। শ্বাসনালীর বর্হিদ্বার আছে এই কঠিন আররণের নিচে। সুরক্ষিত পাতলা রোমের আবরণ দিয়ে। জলীয় বাষ্প শরীর থেকে তাই কোনোভাবেই বেরিয়ে যেতে পারে না। জরুরি অবস্থায় এই খোলা শ্বাসনালী বন্ধও হয়ে যায়, জলীয় বাষ্প বেরোতে পারে না।

যদিও মরুভূমিতে অসংখ্য ফড়িং, ঝিঁঝিঁপোকা, ছারপোকা, গুবরেপোকা, পিঁপড়ে, বোলতা, প্রজাপতি, মথ, মাছি ইত্যাদি আছে, এদের সকলকেই কিন্তু মরুভূমির বিশেষ কীটপতঙ্গ বলা যায় না। অনেকেরই দেখা মেলে উর্বর গাঙ্গেয় সমভূমিতে, ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলের মালভূমি জুড়ে, কার্যত সুদূর দাক্ষিণাত্যে। মরুভূমিতে বাস করার উপযোগী দেহের গঠন এদের নয়। তবে পোকামাকড়ের বাস অনেকটাই নির্ভর করে মরু অঞ্চলে এদের খাদ্য—উদ্ভিদ কিভাবে ছড়ানো তার ওপর।

বিশেষ মরু কীটপতঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে রাজস্থানের উষর ও আংশিক উষর এলাকায়, সিন্ধুপ্রদেশে ও বালুচিস্তানের কোনো কোনো অঞ্চলে। এদের নিকটতম প্রজাতির দেখা মেলে আরবে এবং আফ্রিকায়, বিশেষত সুদানে। যদিও ভারতের মরুভূমি বহুরকম উষর অঞ্চলের কীটপতঙ্গের আশ্রয়স্থল, তবুও আমরা বিশেষ নজর দেব

পঙ্গপালের দিকে। পঙ্গপাল একান্তভাবেই মরুভূমির পতঙ্গ। আসলে ফড়িং। এদের নানা প্রজাতির সঙ্গে বাগানে, বনে, জঙ্গলে, তৃণভূমিতে, শস্যক্ষেত্রে আমাদের পরিচয়। কিন্তু এদের স্বভাবচরিত্র সাধারণ ফড়িং থেকে আলাদা।

সাধারণ ফড়িংরা নির্জনে থাকতে চায়। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায় না। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঝাঁকে ঝাঁকে উড়েও যায় না। কিছু কিছু মরুফড়িং বহু বছর ধরে একক জীবনযাপন করে। এককভাবে সন্তান পালন করে, এককভাবে খাদ্য সংগ্রহেও অভ্যস্ত। তারাই কখনও সখনও কিছু সময় অন্তর অন্তর, যূথচারী হয়ে যায়, কাতারে কাতারে বাড়ে, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে তেপান্তর ও সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সবুজ শস্যক্ষেত্রে বসে, নষ্ট করে দেয়। মূলত একই প্রজাতির, তবুও একাকী ও দলবদ্ধ ফড়িংদের রং, আকার, সংখ্যা আর স্বভাব এক নয়। প্রজাতি আলাদা, বর্গও আলাদা। পঙ্গপালও এক ধরনের ফড়িং যারা নিয়মিতভাবে প্রতি দ্বিতীয় প্রজন্মে যূথচারী ও ভবঘুরে জাতের হয়। সাধারণত তিনভাগের জীবনচক্রে এরা অভ্যস্ত: একক, দলবদ্ধ, ও ক্ষণস্থায়ী অবস্থা। তফাৎ আকারে, স্বভাবে। ক্ষণস্থায়ী অবস্থায় একক ও দলবদ্ধ উভয় অবস্থার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যূথবদ্ধ অবস্থায় পঙ্গপাল একসঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে। যে ডিম তখন পাড়ে, তা ফুটতে দেরি হয়। বলা হয় ডায়াপজ। যৌন সক্ষমতার আগেই অন্য জায়গায় উড়ে যায়। একক অবস্থায় এরা কোথাও যেতে চায় না। ডিম ফোটে স্বাভাবিকভাবেই, ডায়াপজ হয় না। যৌন ক্ষমতা এলেও দেহের রং পরিবর্তন হয় না।

পঙ্গপালের নানা প্রজাতি বিশ্ব জুড়ে। ভারতে দুটো প্রজাতি নিয়ে বিশেষ কৌতুহল। একটা সিসটোসারকা গ্রিগারিয়া *(Schistocerca gregaria)* বা মরুভূমির পঙ্গপাল। দেখা যায় আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলে, উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, আরবে, ইরাকে, আফগানিস্থানে, বালুচিস্তানে, সিন্ধুপ্রদেশে, পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে। পশ্চিমের এরিট্রিয়া, স্পেন ও পর্তুগালে, পূর্বের সুদুর কলকাতায় এরা আক্রমণ চালায়। তবে খুবই কম। পঙ্গপালের বিস্তার দুইভাগে বিভক্ত: এক, স্থায়ী আবাস এবং দুই, অস্থায়ী আবাস। যূথবদ্ধরা এইসব ডিম পাড়ার আবাসে উড়ে যায়।

যূথচারী পঙ্গপালদের মধ্যে রয়েছে অধিকাংশ গোলাপী রঙের নব্য যুবক-যুবতীরা। যারা পূর্ণতা পেলে হয়ে যায় হালকা হলুদ রঙা। একাচারী বয়স্করা কিছুটা ফ্যাকাশে হলুদ রঙের। পূর্ণতা পেলে। নব্য সাবালকদের রং হালকা হলুদ। এক বছরে এরা দুটো প্রজন্মের অধিকারী হয়। ডিম অবস্থায় এরা থাকে 15-40 দিন। ছোট ছোট অপরিণত লাফানো অবস্থা থাকে 40-60 দিন। পঙ্গপালদের বৃদ্ধিতে নির্দিষ্ট সময়-বিভাগ আছে। স্থায়ী আবাসে,·যেখানে এরা সন্তানের জন্ম দেয়, আবহাওয়ার প্রভাব বেশি। তবু শত্রুপক্ষের আক্রমণ এদের বংশবৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রিত করে। বংশ বৃদ্ধির জন্য এদের পছন্দসই জায়গা হল রুক্ষ বালির পাহাড়. নেড়া জমি যেখানে গাছপালা বেশি নেই। অনেক বেশি দূর এরা উড়ে যায়। দেখা গেছে, কিছু পঙ্গপাল সমুদ্রের

মধ্যে একটানা 1,920 কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ে গেছে। এগারো (11) বছর বাদ বাদ পঙ্গপালের ঝাঁক নেমে আসে। সূর্য-কলঙ্কের পর্যায়ক্রমে। অবশ্য অনেক সময়, কম সময়ের মেয়াদে, আসে ছোট ছোট ঝাঁকে। এগারো বছরের এই কালচক্র পুরোপুরি আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল; প্রকৃতিবিদদের কিন্তু এই সম্বন্ধে এখনও স্পষ্ট ধারণা নেই।

আর এক জাতের উল্লেখযোগ্য পঙ্গপালের নাম বম্বে পঙ্গপাল *(Cyrtacanthacris succincta)*। শুধুমাত্র ভারতেই দেখা যায়। জুন মাসে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বেরোয় জুলাইয়ে—ছোট ছোট লাফানো বাচ্চা সেপ্টেম্বর মাসে বড় হয়ে যায়। কখনও ঝাঁক বেঁধে দক্ষিণ ভারতের নানা অঞ্চলে যায়। দেখতে অনেকটা মরুভূমির পঙ্গপালেরই মতো, তবে দেহের রং আরও লালচে।

নবম অধ্যায়

হিমালয়ের কীটপতঙ্গ

হিমালয়ের কীটপতঙ্গের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। পাহাড়ের পাদদেশ আর ঢালু বনাঞ্চল নানা ধরনের কীটপতঙ্গে ভরা। যেমন মেফ্লাই, স্টোনফ্লাই, গঙ্গাফড়িং, ঝিঁঝিঁপোকা, জলফড়িং বা গয়ালপোকা, ক্যাডিসফ্লাই, ছারপোকা, সিকাডা, গুবরেপোকা, পিঁপড়ে, বোলতা, মৌমাছি, প্রজাপতি, মথ, ডাঁশ, মশা, মাছি, ইত্যাদি। এদের মধ্যে অনেকে উষ্ণ আর্দ্র ধুলোবালি ভরা উত্তর ভারতের সমতল ভূমি থেকে উড়ে এসে বাসা বেঁধেছে। সাম্প্রতিককালে ঠাণ্ডা পাহাড়ে বনে। আবার অনেক কীটপতঙ্গ আছে যাদের সমতলভূমিতে দেখাই যায় না; এরা একেবারেই পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা। পাহাড় অঞ্চলেই এদের জন্ম। আরও উঁচুতে, অর্থাৎ যেখানে জঙ্গল শেষ হয়ে শুধু রুক্ষ পাথর, আর আছে বরফ, তুষার আর হিমবাহ, সেখানেও এই পর্বতজ কীটপতঙ্গের দেখা মেলে, তবে সংখ্যায় কম, বৈচিত্র্যও বেশি নয়। এইসব কীটপতঙ্গ থাকে হিমালয়ের উচ্চতর অংশে, সমুদ্রতল থেকে 6,900 মিটার উঁচু হিমরেখার উপরে। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মনুষ্যবসতি অঞ্চল হল তিব্বত। উচ্চতা 4,500 মিটার। কিন্তু কীটপতঙ্গ এর চেয়েও অনেক বেশি উচ্চতায় বহাল তবিয়তে বাস করে।

হিমালয়ের বনাঞ্চল

হিমালয়ের জঙ্গলে কীটপতঙ্গের যেসব প্রজাতি দেখা যায় তারা সাধারণত আর্দ্র-উষ্ণ অঞ্চলের বাসিন্দা। আস্তে আস্তে এরা আরও উপরের বনাঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ বা শীতল আবহাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এদের মূল বাসস্থান হল পূর্ব আসাম, দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন, এবং অংশত মালয়। উষ্ণ-আর্দ্র অঞ্চলের কীটপতঙ্গ দ্রুত হারে ছড়িয়ে যায় পশ্চিম হিমালয়ের উচ্চতায়, দক্ষিণ ঢালের কাশ্মীরের দিকে। কোনো কোনো প্রজাতি হিমালয়ের উত্তরে পূর্ব তিব্বতে ছড়িয়ে গেছে। সুন্দর প্রজাপতি ট্রয়েড *(Orinthoptera)* মূলত মালয় অঞ্চলের বনভূমির। পূর্ব হিমালয়ের বনে এদেরই জাতভাই আছে ট্রয়েড হেলেনা সেরবেরাস *(Helena cerberus)*। ট্রয়েড ইকাস ইকাস *(Aeacus aeacus)* অন্য একটা প্রজাতি, ফরমোসা থেকে গাড়োয়াল হিমালয় পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। কাইজার-ই-হিন্দ প্রজাপতি টিনোপালপাস ইম্পিরিয়ালিস *(Teinopalpus imperialis)* পূর্ব হিমালয়, আসাম আর উত্তর বর্মার পাহাড়ে দেখা যায়। দক্ষিন-চীন, ইন্দোচীন

এবং মালয়ের জঙ্গলের বাসিন্দারা পশ্চিম হিমালয়ের জঙ্গলে যত বাসা বেঁধেছে ততই হয়েছে তাদের মৌলিক পরিবর্তন, জন্ম নিয়েছে স্থানীয় প্রজাতি। পশ্চিমে যেতে যেতে তফাৎ হয়েছে তাদের পৈতৃক আদলে। তাই পূর্ব থেকে পশ্চিম হিমালয় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতি এবং তাদের বহু ধারা-উপধারার, শাখা-উপশাখার সন্ধান মেলে। হিমালয়ের প্রজাপতির অনেকেই এসেছে মূলত ইন্দোচীন, দক্ষিণ-চীন, থাইল্যান্ড আর বর্মা থেকে। ইন্দোচীনের প্রজাপতি চিলাসা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পূর্ব হিমালয়ে, যদিও কাশ্মীরেও এরা একেবারে অনুপস্থিত নয়। চিলাসা অ্যাগেস্টর *(Chilasa agestor)* -এর দেখা মেলে টনকিন থেকে সিকিম, চিলাসা অ্যাগেস্টর গোবিন্দ্রা *(Chilasa agestor govindra)* পাওয়া যায় কুমায়ুন থেকে কাশ্মীর, এবং চিলাসা অ্যাগেস্টর চিরাগশাই (*(Chilasa agestor chiragshai)* আছে পশ্চিম কাশ্মীরে। প্যাপিলিও বুট *(Papilio bootes)* ছড়িয়ে আছে পশ্চিম চীন থেকে আসাম ও পূর্ব হিমালয় হয়ে গাড়োয়াল হিমালয় অবধি। আর এক প্রকার প্রজাপতির নাম প্যাপিলিও রিটেন্টর *(Papilio rhetentor)*। চীন আর হাইনানে ছিল মূল বসতি। ছড়িয়ে পড়ে উত্তর বর্মার পাহাড়ে, কুমায়ুন পর্যন্ত হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। প্যাপিলিও প্রোটেন্টর *(Papilio protentor)* দেখা যায় প্রথম ফরমোসা, হাইনান, চীন, টনকিন ও বর্মায়, এখন ছড়িয়ে পড়েছে পূর্ব হিমালয় থেকে পশ্চিমের কাশ্মীব পর্যন্ত।

হিমালয়ের বনাকীর্ণ ঢালে অসংখ্য সিকাডা-ব বাসস্থল, চারদিকে রডোডেনড্রন আর ওক বনে শোনা যায় এদের ঐকতান। এছাড়া আছে অসংখ্য লম্বা শিংওয়ালা ফড়িং; আছে প্রেইং ম্যানটিড, কাঠিপোকা, পাতাপোকা, ছাবপোকা—গাছেব বাকলে, সবুজ পাতায়, বনেব মাটিতে ঝরাপাতাব পুরু আস্তরণে। নানা ধরনেব হাজাব হাজাব গুবরেপোকা এখানে বাস করে। নেপাল ও পূর্ব হিমালয়ে আছে ল্যাম্প্রোফোরাস নেপালেনসিস *(Lamprophorus nepalensis)* প্রজাতিব জোনাকি। অনেক গয়ালপোকা যেমন কক্সিনেলা *(Coccinella)* ও ক্রক-বীটল *(Autocrates aeneus)*। এদের চোয়াল শক্ত। এবং স্ট্যাগহর্ন বীটল থাকে পূর্ব হিমালয়ের জঙ্গলে। লুকানাস লুনিফার *(Lucanus lunifer)* হল রাজা স্ট্যাগহর্ন বীটল। ওডোন্টোলেবিস কিউভেবা *(Odontolabis cuvera)* হল উজ্জ্বল সোনালী স্ট্যাগহর্ন; এবং ডরকাস অ্যান্টিয়াস *(Dorcus antaeus)* আর হেমিসোডোরকাস নেপালেনসিস *(Hemisodorcus nepalensis)* সাধারণ হিমালয়েরই গুবরেপোকা। দেখা যায় নানা জাতের ডাং-রোলার ও শেফটার বীটল।

বনরেখার উপরের কীটপতঙ্গ

হিমালয়ের উঁচুতে বনজঙ্গল নেই, আছে বিস্ময়কর তুষার, বরফ আর পাথরের রাজ্য। বায়ুর চাপ, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা সবই কম। বাতাসে অক্সিজেন অল্প, তবে রোগজীবাণু ও ধুলোবালি নেই। বাতাসে উষরতা বেশি, সর্বদাই শনশন ঠাণ্ডা হাওয়া, বাতাসের বেগ ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায়। আছে তীব্র আলো, বিকীর্ণ হচ্ছে অতি-বেগুনী রশ্মি। দিনের বেলা পরিষ্কাব আবহাওয়ায় সূর্যের তাপ এত প্রবল যে উন্মুক্ত প্রাণীদেহ তেতে ওঠে। তাপমান ওঠে 50-60 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আবার ছায়া

পড়ে যেসব অঞ্চলে সেখানকার তাপমান 7 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, কি তারও কম। তাপ বিকিরণের হারও এত দ্রুত যে পাশ দিয়ে মেঘ চলে গেলে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাপমান কমে যায় আশপাশের তাপমানের চেয়েও। বাতাসে আর্দ্রতা কম আর সবসময়ই জোরে বাতাস বইছে বলে শরীর থেকে জল শুকিয়ে যায় খুব দ্রুত। সমুদ্রপৃষ্ঠের আবহাওয়ার তুলনায় অর্ধেক লঘু বায়ুস্তর। বনেজঙ্গলে, সমতলে, বাগানে ও শস্যক্ষেত্রে বাস করা সাধারণ কীটপতঙ্গ এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। তুষারাবৃত পার্বত্য অঞ্চলে তাদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া পরিমণ্ডল ঠিক এইরকম, পৃথিবীর সাধারণ সমতলভূমির আবহাওয়ার তুলনায় সেই বায়ুস্তর অর্ধেক লঘু। তাই হিমালয়ের বনাঞ্চলের উপরিভাগে কীটপতঙ্গের জীবনযাপন অনেকটা ভিন্‌গ্রহের বাসিন্দাদের মতোই। যেন ভারতের মাটিতে জাত নয়, যদিও ভৌগলিক দিক দিয়ে আমাদের মতো এরা শতকরা একশো ভাগ ভারতীয়।

হিমালয়ের বনাঞ্চলের উপরে বসবাসকারী কীটপতঙ্গ সবদিক দিয়েই বিশেষ ধরনের। অন্যান্য ভারতীয় কীটপতঙ্গ থেকে আলাদা। আমাদের পরিচিত কীটপতঙ্গ উষ্ণতা, সূর্যালোক আর গাছপালা ভালোবাসে, কিন্তু হিমালয়ের কীটপতঙ্গ ভালোবাসে শৈত্য, এড়িয়ে চলে তীব্র আলো, পছন্দ করে পাথর ও বরফের নিচে, মাটির তলায়, আর পুরু শ্যাওলা, গুল্ম জাতীয় আস্তরণের ভেতর লুকিয়ে থাকতে। বাস্তবিক, জীবনযাপনের জন্য এরা শীতল আবহাওয়া, তুষার ও বরফের ওপর নির্ভরশীল। এইসবের জন্যই এরা বাঁচে। নইলে এক মুহূর্তও বাঁচতো না। শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় জল এরা এই তুষার আর বরফ থেকেই সংগ্রহ করে। উঁচু অঞ্চলের কীটপতঙ্গ তাই তুষার বা হিমবাহের ধারে কাছে থাকে; তুষার থেকে দূরের এলাকায় কাউকে দেখাই যায় না। দীর্ঘ শীতের সময়, যখন তাপমাত্রা কমে -45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে নেমে যায়, কীটপতঙ্গ তখন 10-15 মিটার পুরু বরফের ঢাকনার নিচে আশ্রয় নেয়। ঢাকনাটা কম্বলের কাজ করে। তখন এরা মারা যায় না, শীতঘুম দেয়। তারপর বসন্ত আসে, এরা হয়ে ওঠে সক্রিয়, কর্মচঞ্চল। সেই আট থেকে দশ সপ্তাহ স্থায়ী গ্রীষ্মকালে বংশবৃদ্ধির জন্য তৎপর হয়।

শূন্য ডিগ্রী তাপাঙ্কের কাছাকাছি আবহাওয়ায় এদের শ্রীবৃদ্ধি। উষ্ণতা সামান্য বৃদ্ধি পেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যায়। এমনকি মানুষের হাতের উষ্ণতাও এরা সহ্য করতে পারে না।

এদের দেহ গাঢ় তন্তুরঞ্জক পদার্থে ঢাকা। দেহের রংও সাধারণ সমতলভূমির, এমন কি হিমালয়ের জঙ্গলের কীটপতঙ্গের রঙের তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও গাঢ়। গাঢ় তন্তুরঞ্জক পদার্থ তীব্র আলো বিশেষত অতিবেগুনী রশ্মির হাত থেকে কীটপতঙ্গকে রক্ষা করে। এবং বরফের ওপর থাকার সময় প্রয়োজনীয় উষ্ণতা শুষে নিতে এই তন্তুরঞ্জক সাহায্য করে।

উঁচু অঞ্চলের বহু কীটপতঙ্গ খায় পুষ্পল ছত্রাক, শ্যাওলা ও অন্যান্য পার্বত্য লতাগুল্ম। তবু বেশির ভাগ কীটপতঙ্গই খাদ্যের জন্য নির্ভর করে গ্রীষ্মের বাতাসে উড়ে আসা দূরের উত্তর ভারতের ধুলোবালি ভরা সমতলভূমির ফুলের পরাগরেণু, অপুষ্পল গাছের

বীজগুটি, নানা বীজ, মৃত মাকড়সা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের ওপর। বাতাসে ভেসে আসা খাদ্যবস্তু ওপরের ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে এসে শীতল হয়ে যায়। বাতাসেই উড়ে যায় হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চলে। উচ্চতর পার্বত্য অঞ্চলের কীটপতঙ্গের খাদ্যের জোগান সমতলভূমি থেকে এইভাবে উড়ে আসে। তুষার ঢাকা বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং হিমবাহ কীটপতঙ্গদের খাবারের জায়গা। এইসব জায়গাতেই বাতাসবাহিত খাদ্যবস্তু খুঁজতে আসা অন্যান্য কীটপতঙ্গ ও মাকড়সাদের শিকার করে। উচ্চতা যত বাড়ে, দেখতে পাই তত বেশি মাংসাশী ও লুণ্ঠনজীবী পোকামাকড়। সবচেয়ে উঁচু অংশে কীটপতঙ্গেরা প্রায় সবাই মাংস খায়, শিকার করে।

উঁচু পার্বত্য অঞ্চলের বেশির ভাগ কীটপতঙ্গের ডানা নেই। উড়তেও পারে না। অনেকের হয় একেবারেই ডানা নেই, অথবা কিছু কিছু প্রজাতি আছে যাদের ডানা ছোট বা অব্যবহারে নষ্ট হয়ে গেছে। যাদের ডানা আছে, তারাও পারতপক্ষে ওড়ে না। খুব কমই উড়তে পারে, তাও হাওয়া না বইলে। ঠাণ্ডা তীব্র বাতাস থাকলে ওড়া শুধু শক্ত নয়, অপ্রয়োজনীয়ও বটে।

যদিও এরা হিমালয়ের তুষার ও বরফের মধ্যে জীবন কাটায়, তবু মেরু অঞ্চলের কীটপতঙ্গের চেয়ে এরা মূলত আলাদা। সুমেরু ও কুমেরু দুই মেরুদেশের কীটপতঙ্গের গায়ের রং অনেক বেশি হালকা। হিমালয়ের পোকামাকড়ের দেহে ভারি রঞ্জক পদার্থ। মেরুদেশে শীত ও বরফ সত্ত্বেও কীটপতঙ্গ বেঁচে থাকে। আর হিমালয়ে এরা বরফ ও শীতের দৌলতেই বেঁচে থাকে। মেরু অঞ্চলের কীটপতঙ্গের মূল জন্মভূমি সমতল অঞ্চল, কিন্তু হিমালয়ের উচ্চতম অংশের কীটপতঙ্গ অনেক লঘু পরিমণ্ডলের প্রাণী।

অধিকাংশ কীটপতঙ্গ আলাদা আলাদা স্তূপ পর্বতে থাকে। ফলে হিমালয়ের প্রতি চূড়ায় নিজস্ব বিশেষ ধরনের কিছু কিছু প্রজাতি আছে যাদের জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু সেখানেই। ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত উচ্চতার সঙ্গে প্রজাতির স্তরভেদ ঘটে। যেসব প্রজাতিকে 3,000—3,500 মিটার উচ্চতায় দেখা যায়, তাদের আবার 4,000 মিটার উচ্চতায় দেখা যায় না। সেখানে অন্য কীটপতঙ্গ, যাদের পাত্তা মেলে না 4,500 মিটার উচ্চতায়। যেসব প্রজাতিকে 5,800—6,300 মিটার উচ্চতায় দেখা যায়, তার থেকে নীচু অঞ্চলে তারা বাঁচতে পারে না। বনরেখা থেকে যত ওপরে যাওয়া যায়, ততই কীটপতঙ্গের প্রজাতিদের সংখ্যা কমতে থাকে, 6,000 মিটার উচ্চতায় সব মিলিয়ে এক ডজন স্থায়ী প্রজাতিও নজরে পড়ে না। পাহাড়ী বনজঙ্গলের কীটপতঙ্গের সংখ্যা নিচের জঙ্গলের কীটপতঙ্গের অর্ধেক। আরও ওপরে, চির তুষারবৃত অঞ্চলে, এরা সংখ্যায় বনরেখার এক-দশমাংশ। হিমালয়ের বনরেখায় শুরু নতুন বিশ্বজগৎ যা পার্থিব আবার অপার্থিব, একই সঙ্গে।

হিমালয়ের জঙ্গলের কীটপতঙ্গ ইন্দোচীন, দক্ষিণ-চীন ও মালয়ের বাসিন্দাদের বংশধর। কিন্তু বনরেখার উপরের কীটপতঙ্গ সম্পূর্ণভাবে এই অঞ্চলেই জন্মায়। বরং এদের সঙ্গে পামীর, তিয়েনসান ও মধ্য এশিয়ার উত্তরাংশের তুর্কীস্থানের পাহাড় পর্বতের কীটপতঙ্গর মিল আছে। এদের পূর্বসূরীরা আদৌ ভারতীয় নয়। মূলত এরা শুষ্ক তৃণাবৃত নিষ্পাদপ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। শীতল আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল থাকতে থাকতে উচ্চভূমির শৈত্য

ভালবাসতে শিখেছে। হিমালয়ের উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের আদিপুরুষের বাসভূমির উচ্চতাও বেড়ে গিয়েছিল। সেদিক থেকে চিন্তা করলে হিমালয়ের জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে এইসব কীটপতঙ্গের জীবনবৃত্তান্তও অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

উচ্চস্থানের কিছু কীটপতঙ্গ

উচ্চ হিমালয়ের প্রধান কীটপতঙ্গ হল মেফ্লাই, স্টোনফ্লাই, ডানাহীন ফড়িং, গুবরেপোকা, ক্যাডিসফ্লাই, প্রজাপতি, মাছি ও স্প্রিংটেল। কিছু পিঁপড়ে ও ভোমরা (মৌমাছি নয়) এইসব অঞ্চলে দেখা যায়।

বরফ ও তুষারগলা জলের পাহাড়ী নদীগুলোতে মেফ্লাই, স্টোনফ্লাই, ক্যাডিসফ্লাই আর ডিপটেরাসের শূককীট থাকে। হিমালয়ের সাধারণ মেফ্লাই হল বিটিস *(Baetis)*; স্টোনফ্লাইরা নেমুরা *(Nemura)*, ক্যাপনিয়া *(Capnia)* ইত্যাদি। বিশেষ ধরনের কিছু ডাঁশের শূককীট ও গুটিপোকা অপরিণত অবস্থায় এই জলে বাস করে। এদের শূককীট ও গুটিপোকারা নিজেদের দেহ নোঙর করার বা ডোবা খুঁটি ও পাথরে আটকে রাখার ক্ষমতাও থাকে। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সেইভাবে তৈরি। এরা 0.5-3 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমানের ঠাণ্ডা জলে ভালো থাকে। স্রোতও খুব বেশি।

প্রায় 4,000 মিটার ও তার ওপরে যেসব হিমবাহ হিমালয়ের অন্দর-উপত্যকায় রয়েছে, পাহাড়ী ডাঁশ ডিউটেরোফ্লেবিয়া *(Deuterophlebia)*-র শূককীট তাতে দেখা যায়। বহমান ঠাণ্ডা জলের নিচে ডুবে থাকা পাথরের আড়ালে থাকে। আংটার মতো বাঁকানো এক জোড়া নকল পা দিয়ে শক্ত করে পাথর আঁকড়ে থাকতে পারে, তার ওপর হামাগুড়িও দিতে পারে। যাতে স্রোতের টানে ভেসে না যায়। লেজের ও শুঁড়ের কাছে সরু ফ্যাকাশে পাতলা ঝিল্লীযুক্ত কতকগুলো নল আছে। এগুলো তারের জালির কানকোর কাজ করে। পাহাড়ী ডাঁশের বাস উত্তর পশ্চিম হিমালয়ে, তিয়েনসান, আলতাইয়ে, কোরীয় পর্বতমালায়, কামচাটকায়, কানাডিয়ান রকি পর্বতে এবং উত্তর আমেরিকার রকিতে। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এইসব ডাঁশের শুঁড় সরু আর লম্বা। দেখতেও ঠিক মেফ্লাইয়ের মতো। প্রথম আবিষ্কৃত হয় কাশ্মীরে হরমুখ হিমবাহের নিচে। হিমালয়ের আর কোথাও দেখা যায় না।

জলের ধারে, গলে যাওয়া বরফ ও হিমবাহের কিনারে নানা জাতের ক্যারাবিড গুবরেপোকা দেখতে পাওয়া যায়, যেমন নেব্রিয়া *(Nebria)*, বেম্বিডিয়ন *(Bembidion)*, ভ্রাম্যমান পোকা অ্যালিওক্যারা *(Aleochara)* ও এথিটা *(Atheta)*। এদের সঙ্গী টেনেব্রায়োনিড বীটলও। গ্রীষ্মের সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে এরাই শিকারের খোঁজে তুষারের ওপর উঠে আসে।

সাদা বরফ কালো হয়ে যায় তুষার অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ বরফ মাছিতে ভরে গিয়ে। এরা গাঢ় রঙের স্প্রিংটেল, প্রোআইসোটোমা *(Proisotoma)*। ধীরে গতিতে হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজে বেড়ায় বাতাসে ভাসা পুষ্পল ছত্রাক, পরাগরেণু, অন্যান্য মৃত জৈব পদার্থ। ভ্রাম্যমান বীটলের একটা প্রজাতি সবচেয়ে উঁচুতে থাকে। থাকে 5,600 মিটার উচ্চতায়। এটা বিশ্বরেকর্ড, অন্তত গুবরেপোকার ক্ষেত্রে। আর 5,000 মিটার উঁচুতে থাকে ডানাবিহীন

ফড়িং কনোফেমা *(Conophema)* ও গম্ফোম্যাসট্যাক্স *(Gomphomastax)*। অদ্ভুতদর্শন কালো ডানাবিহীন কেওড়াজাতীয় কীট অ্যানেকিউরা *(Anechura)* তুষারাঞ্চলের কিনারে থাকে মাটি আর পাথরের নিচে। বহু সংখ্যক রোমশ অ্যাম্প্রোমাইড ও ঝুলন্ত মাছিও দেখা যায়। প্রজাপতির যেসব প্রজাতি উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা তারা হল প্যাপিলিও *(Papilio)*, আর্গিনিস *(Argynnis)*, পাইরিস *Pieris)*, কলিয়াস *(Colias)* ও পার্নাসিয়াস *(Parnassius)*। শেষের প্রজাতি 3,000 মিটারের নিচে থাকে না। বরং 6,300 মিটার উঁচুতে উঠতে দেখা যায়।

সুউচ্চ হিমালয়ের কীটপতঙ্গের জীবন প্রবাহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চল বিশেষত উপদ্বীপ অঞ্চলের কীটপতঙ্গের তুলনায় খুব বেশিদিনের নয়। এর যৌবন দ্রুত হারে ক্রমবিবর্তনেই প্রকাশ পায়। হিমালয়ে মানুষেরই জীবদ্দশায় কীটপতঙ্গের একাধিক প্রজাতির জন্ম হয়েছে। এখনও বহু প্রজাতির উদ্ভব হয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক বিশেষ গোষ্ঠীর আবির্ভাবের জন্য হিমালয় অঞ্চল প্রসিদ্ধ। সেই অনুপাতে ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলে কীটপতঙ্গেরা বহুকালের পুরানো, স্থায়ী ও সর্বজনীন। এরা প্রাচীন গন্ডোয়ানা কীটপতঙ্গ এবং পূর্বের ইন্দোচীন ও মালয়ের বনাঞ্চলের প্রজাতির অবশেষ। পরে এরা মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রাচ্য অঞ্চলের কীটপতঙ্গই বিবর্তিত হয়ে হিমালয়ের জঙ্গলের কীটপতঙ্গের সৃষ্টি করেছে। আবার উপদ্বীপ অঞ্চলে এরাই পরিণত হয়েছে অবশিষ্টাংশে।

দশম অধ্যায়

কীটপতঙ্গ ও মানুষ

ঠিক আমাদের মতো ভারতের কীটপতঙ্গের মাতৃভূমি ভারতই। এই মাটিতেই এদের জন্ম। মানুষের চেয়েও অনেক বেশিদিন এরা এখানে বাস করছে। মানুষের সঙ্গেই জলবায়ু, খাদ্যভাণ্ডার সবই ভাগ করে নেয়। ভারতের আদিবাসীরা হল কীটপতঙ্গ। মানুষ আসে অনেক পরে। এরা যদি কথা বলতে পারত, তবে আমরা জানতে পারতাম এদেশের মাটির বিবর্তনের ইতিহাস। একদা গর্বিত আরাবল্লী পর্বতমালার নিরাবরণ অবস্থা, বিশাল অথচ তরুণ হিমালয়ের উৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা করতে পারতাম। মানুষ কত পরে কেমন করে এল, ছড়িয়ে পড়ল, সর্বত্র বসতি স্থাপন করল, সবই জানতে পারা যেত। কীটপতঙ্গেরা নিশ্চয়ই দুঃখের সঙ্গে বলত মানুষ কত বড় বিশ্বাসঘাতক। সবিস্ময়ে এরা দেখত কাঁধের ওপর বসানো মানুষের মোটা মাথা কত বেশি নিরেট।

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে, কীটপতঙ্গকে চারভাগে ভাগ করা যায় : 1. নিরপেক্ষ কীটপতঙ্গ ; 2. ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ ; 3. প্রয়োজনীয় কীটপতঙ্গ ; এবং 4. হিতকারী কীটপতঙ্গ। বিভাজন অবশ্যই কৃত্রিম, বিজ্ঞানসম্মত নয়। নিতান্ত সুবিধাজনক বলেই গ্রহণ করা হয়েছে। অত সহজে কোনো কীটপতঙ্গকে পুরোপুরি ক্ষতিকারক বা প্রয়োজনীয় বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মৌমাছি আমাদের প্রয়োজনীয় যখন সে আমাদের মধু ও মোম দেয় ; উপকারী যখন সে ফুলের পরাগমিলন ঘটায় ; এবং ক্ষতিকারক যখন হুল ফোটায়। আবার এমনও হতে পারে, যে কীটপতঙ্গ বর্তমানে ক্ষতিকারক বা দেশের কোনো বিশেষ স্থানে ক্ষতিকারক, সেই হয়তো অন্য জায়গায়, ক্ষতিকারক নয়, অথবা মানুষের কাছে তার কোন মূল্যই নেই। ভুলে না যাই এই বিভাজনের ভিত্তিমূল সমগ্র কীটপতঙ্গের খুব সামান্য শতাংশ। তবুও বিভাজনকে পরখ করা যায়, যদিও সবটাই নিতান্ত গল্পের মত।

নিরপেক্ষ কীটপতঙ্গ

ভারতের কীটপতঙ্গের বৃহত্তম অংশ (শতকরা 99 ভাগেরও বেশি) সাধারণ মানুষের মনে তেমন কোন আগ্রহ জাগায় না। মানুষের জীবনযাত্রা এবং ভারতের অসংখ্য

কীটপতঙ্গের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ সমান্তরাল, কোথাও মিলিত হয় না। কোনোভাবেই এরা একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। কীটপতঙ্গ জন্মাচ্ছে, বড় হচ্ছে, মারা যাচ্ছে—এইসব ব্যাপারে মানুষ উদাসীন। শুধুমাত্র প্রকৃতিপ্রেমিকরাই এদের নিয়ে মাথা ঘামান। তাও কেতাবি আগ্রহ। এমন কি কৃষিবিজ্ঞানী, বনবিজ্ঞানী, এবং পশুচিকিৎসক—এরাও জানেন না কিছু। কীটপতঙ্গেরা নিজেদের জীবন নিজেরাই চালায়, চুপিসাড়ে বজায় রাখে প্রকৃতির ভারসাম্য, লোকচক্ষুর আড়ালে কোন চিহ্ন না রেখেই মারা যায়। কোথায় এদের বসতি? সর্বত্র। মাটিতে, ঘাসে, জঙ্গলে, জলে। আমাদের গাছপালা, বসতি ও অন্যান্য বহুকিছুর সঙ্গেই এরা অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এদের ছাড়া কিছু পেতাম না আমরা।

ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ

ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ তারাই যারা মানুষের স্বার্থে আঘাত করে। মানুষ কোনো জিনিসের দখল নিয়েছে, ভোগ করছে, কিন্তু কীটপতঙ্গ তাতে বাধ সাধছে। সেখানেই সংঘাত। কীটপতঙ্গেরা নষ্ট করে মানুষের তৈরি শস্য, শাকসবজি, ফলমূল। নষ্ট করে গুদামজাত ফসলও। কাঁচামাল, তৈরি মালেরও ক্ষতি করে, ব্যবহারের অযোগ্য করে। আসবাবপত্র, জামাকাপড়, বইপত্র, শিল্পদ্রব্য ধ্বংস করে। মানুষকে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত করে, শারীরিক যন্ত্রণা দেয় বা রোগ ব্যাধি ছড়ায়। হয়তো বা গৃহপালিত পশুপাখিকে আক্রমণ করে বা তাদের দেহে রোগজীবাণু সংক্রামিত করে। আবার যেসব কীটপতঙ্গ মানুষের বন্ধু, তাদের শত্রু বনে যায়। আবার যারা মানুষের শত্রু এরা তাদেরই বন্ধু সাজে।

কীটপতঙ্গেরা কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে, পশুপালনে ও জনস্বাস্থ্যে যে পরিমাণ ক্ষতি করে, সবসময় তা তেমন ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। আর যখন এই ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি এত বেশি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায় তখন কীটপতঙ্গেরা আখ্যা পায় 'ক্ষতিকারক'। সৌভাগ্যবশত, মাত্র কয়েকটা কীটপতঙ্গ সঠিক অর্থে ক্ষতিকারক। অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম সংখ্যক কীটপতঙ্গই ভারতের কৃষি প্রকৃতিবিদদের মাথাধরার কারণ। রক্ষণশীল চাষীরা তাদের চিরায়ত বিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে রয়েছে অবিচলিত। ভারতের এই 'সামান্য' ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গদের তালিকা দেওয়াও সম্ভব নয়। কারণ সেই তালিকাও যথেষ্ট দীর্ঘ হবে। হবে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা কয়েকটা উদাহরণই দিতে পারি।

পঙ্গপালের নাম ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের তালিকায় সবচেয়ে ওপরে। কত দেশ যে এরা ধ্বংস করেছে তা বলা শক্ত। এরপর উইপোকা ও ঘুণপোকা। এরা নষ্ট করে চা, আখ ইত্যাদি ফসল, ফলের গাছ, কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য, কাঠের আসবাব ও ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিস। এছাড়া আছে ধানক্ষেতের ফড়িং যেমন, হায়ারোগ্লিফাস বানিয়ান *(Hieroglyphus banian)* ও অক্সিয়া ভেলোক্স *(Oxya velox)*, ধানের পোকা লেপ্টোকোরাইজা ভ্যারিকরনিস *(Leptocoriza variicornis)*, চালের পোকা

হিসপা আরমিজেরা *(Hispa armigera)*, আখের ভেতরে মথের ডিম ফোটা শূককীট। কার্পাস গাছের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে বলওয়ার্ম শূককীট। এরা ইয়ারিয়াস *(Earias)* ও প্ল্যাটিড্রা *(Platyedra)* মথের শূককীট। আলুর ক্ষেতে আর গুদামে থাকে আলু মথের শূককীট। ফলের মাছি ডেকাস আলাবু জাতীয় ফলে, আর কমলালেবু ও আমে ডিম পাড়ে আর সম্পূর্ণ নষ্ট করে। আপেলের ক্ষতি করে কডলিং মথের শূককীট। চালের গুবরেপোকা ক্যালান্ড্রা ওরাইজি *(Calandra oryzae)* এবং শস্যগোলার গুবরেপোকা ক্যালন্ড্রা গ্রানারিয়া *(Calandra granaria)* গুদামজাত ধান ও গম নষ্ট করে। টেনেব্রায়ো *(Tenebrio)*, সিলভানাস *(Silvanus)*, কোরসাইরা *(Corcyra)*, সিটোট্রোগা *(Sitotroga)* ইত্যাদি এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গেরা ময়দা ও অন্যান্য গুদামজাত খাদ্যশস্যে ডিম পাড়ে, এদের শূককীট এগুলো খাবার অযোগ্য করে দেয়।

খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ফলমূল ও গুদামজাত দ্রব্য ধ্বংস করা ছাড়াও বেশ কিছু কীটপতঙ্গ আছে যারা মানুষের দেহে সংক্রামক রোগজীবাণু ছড়ায়। কীটপতঙ্গ বাহিত এরকম কয়েকটা অসুখ হল: ম্যালেরিয়া জ্বর ও পীতজ্বর, ঘুমঘুমভাব, ফাইলেরিয়া বিউবনিক (গ্রন্থিস্ফীতি), প্লেগ, টাইফাস, টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, পেটের অসুখ, মায়াসিস, ঘা, বেলেমাছি রোগ, আর অন্যান্য গরম দেশের অসুখ। যারা এইসব রোগ ছড়ায় তারা হল মশা, বেলেমাছি বা ফ্লিবোটোমাস *(Phlebotomus)*, মাছি, ফ্লেশফ্লাই, আইফ্লাই, মাথা ও দেহের উকুন, ইঁদুর, মাছি, ইত্যাদি। অনেক কীটপতঙ্গ আবার গবাদি পশু, ঘোড়া, কুকুর, হাঁস-মুরগী, অন্যান্য গৃহপালিত পশুপাখিকে আক্রমণ করে। তাদের ভেতর মহামারী ছড়ায়। মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শস্য, শাকসবজি ও ফলের গাছের রোগ ছড়ায় এফিড, সাদামাছি ইত্যাদি। এরাও মানুষের শত্রু।

প্রয়োজনীয় কীটপতঙ্গ

প্রয়োজনীয় কীটপতঙ্গেরা মানুষের খাবার, জামাকাপড়, ওষুধ, মোম, লাক্ষা, রঞ্জক পদার্থ ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের জোগানদার। বহু কীটপতঙ্গ ও তাদের শূককীট ভারতের নানা অঞ্চলে অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য। পঙ্গপাল, গঙ্গাফড়িং, নোংরা খোঁড়া পোকা ও অন্য অনেক কীটপতঙ্গকে তেলে, মাখনে বা ঘিয়ে ভেজে, মশলা মাখিয়ে, আফ্রিকা, মিশর, সুদান, আরব ও আমেরিকার বহু জায়গায় খাওয়া হয়। আমেরিকার অনেক অভিজাত রেস্তোরাঁতে রান্না করা গঙ্গাফড়িং চকোলেটে ডুবিয়ে পরিবেশন করা হয়। ভারতের অনেক বুনো জংলী উপজাতি উইপোকা আর নোংরা খোঁড়া পোকা ঘিয়ে ভেজে মশলা মাখিয়ে, ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ করে মিশিয়ে খায়। মহাভোজ!

মধু হল মানুষের পুষ্টিকর খাদ্য। স্মরণাতীত কাল থেকেই মধুর জোগান দেয় মৌমাছি। মোমেরও জোগানদার। কারখানায়, ওষুধপত্রে কাজে লাগে মোম। বম্বিক্স *(Bombyx)*, অ্যাট্টাকাস *(Attacus)* ও অন্যান্য রেশম মথের গুটি থেকে আমরা রেশম পাই যার মূল্য অনেক। সেই বৈদিক যুগ থেকে। বেদে বলা হয়েছে রেশম পোকা যেমন নিজেদের দেহ থেকে রেশম তৈরি করে, ঈশ্বরও তেমনই নিজের শরীর থেকে

আমাদের সৃষ্টি করেছেন। রামায়ণেও রেশম ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বর্ণনা আছে, ভগবান বিষ্ণু হলুদ রেশম বস্ত্র ও বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী সাদা রেশম বস্ত্র পরিধান করেন। লাক্ষা পোকা টাকার্ডিয়া *(Tachardia)* উৎপন্ন করে রজন বা জতু। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে এর ব্যবহার। এমনকি বর্তমান যুগের কৃত্রিম প্ল্যাস্টিক ও ভারতের একচেটিয়া লাক্ষা ব্যবসাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। মহাভারতের পাঠকও জানে বিস্ময়কর লাক্ষার কথা। লাক্ষা দিয়ে বানানো জতুগৃহের কথা। শত্রুকে ধ্বংস করতে জতুগৃহে আগুন দেওয়া যায় সুযোগ বুঝে। লাক্ষা রঞ্জক দিয়ে আমাদের দেশে কিছুকাল আগেও কাপড় রং করা হত। লাল রঞ্জক ব্যবহার করা হয় মিষ্টি মিঠাইয়ে ও প্রসাধন দ্রব্যে। কক্সিড বাগ জাতীয় লাল-রঞ্জক শুষ্ক কীটের দেহ থেকে আহরিত। কক্সিড থাকে শিয়ালকাঁটা জাতীয় গাছে। বাইবেলে উল্লেখ আছে মান্না জাতীয় খাদ্যের। আসলে এটা টামারিস্ক বা হলুদ রঙের ঝাউগাছের পোকা ট্রাবুটিনার দেহনিঃসৃত শুকনো গাঢ় মধু। ওক গাছের গায়ে ফোঁড়ার মতো স্ফীতি বানায় সাইনিপিড বোলতা, তার থেকে তৈরি হয় কালি ও রঞ্জক পদার্থ। এটা আবার কাজে লাগে কাঁচা চামড়া পাকা করতে। ক্যান্থারাইডিন লাগে ওষুধে। মাথার তেল বানাতে। পাওয়া যায় ফোসকা-পোকা থেকে। যথা লিট্টা *(Lytta)*, মেলো *(Meloe)* ও মাইলাব্রিস *(Mylabris)* থেকে। মণিকার পোকাদের চকচকে উজ্জ্বল রামধনুরঙা ধাতব পাখনা কাজে লাগে অলঙ্কার বানানোতে। একই কাজে লাগে মরফো প্রজাপতির ডানাও। জীবাণুনাশক ও ব্যাকটিরিয়া নাশক হিসেবে কাজে লাগে কিছু কিছু ফ্লেশফ্লাইয়ের শূককীট। জীবাণুনাশক বস্তুর নাম অ্যালানটইন। মুক্ত ক্ষতে যাতে পচন না ধরে তার জন্য এর ব্যবহার। মানুষের ঘা এতে তাড়াতাড়ি সারে। অনেক মাছ মানুষের খাদ্য। তারা খায় মেফ্লাই ও মশার শূককীট। মাছ ধরার কাজে টোপ হিসেবে ছিপে ব্যবহার করা হয় বেশ কিছু জাতের মাছিকে। কলামাছি ড্রোসোফিলা *(Drosophila)* বাড়ে খুব। এক একটা প্রজন্ম কয়েকদিনের মধ্যেই পূর্ণতা পায়। আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে প্রজনন বিদ্যার গবেষণার কাজে লাগানো হয় এদের। সংকর জাতের উত্তরাধিকার আবিষ্কারের কাজে এদের অবদান অনেক।

হিতকারী কীটপতঙ্গ

হিতকারী কীটপতঙ্গ তারাই যারা কোনো না কোনো ভাবে মানুষের উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করে। খাদ্যবস্তু হিসেবে বা কাপড়চোপড় ও ওষধপত্রে ব্যবহৃত না হলেও এদের কাজকর্ম মানুষকে নানাভাবে উপকৃত করে।

বহু কীটপতঙ্গ অন্যান্য কীটপতঙ্গের শত্রু যারা কৃষিকাজ, শিল্প, বাণিজ্য ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। এরা শত্রুর শত্রু, তাই আমাদের মিত্র। অনেক সময় বাগান, শস্যক্ষেত্র আর ফলবাগিচার আগাছা পরিষ্কার করে। এদের সাহায্যে আমরা শস্য, ফুল, ফল ও শাকসবজির ফলন বাড়াতে পারি। হিতকারী কীটপতঙ্গ তাই আমাদের সহায়ক বন্ধু।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিতকারী কীটপতঙ্গ ফসল ফলাতে, বীজ বুনতে তরিতরকারি, ফল ও বাদামের চাষ করতে মানুষকে সাহায্য করে। ফুলের পরাগমিলন ঘটিয়ে।

কিন্তু এর স্বীকৃতি নেই। সামান্য সংখ্যক ফুলের পরাগরেণু বাতাসবাহিত। অন্য সমস্ত ফুলই পরাগমিলনের জন্য একান্তভাবে নির্ভরশীল কীটপতঙ্গের ওপর। প্রকৃতপক্ষে, গাছে গাছে ফুল ফোটে বিশেষ বিশেষ কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করার জন্য। ফুলে মধুও থাকে ঘুষ দেবার জন্য। কীটপতঙ্গ সেই মিষ্টি খাদ্যের লোভে উড়ে যায় এক ফুল থেকে অন্য ফুলে, সঙ্গে বহন করে নিয়ে যায় পরাগরেণু যা গাছের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই ধরনের উদ্ভিদকে বলা হয় এনটোমোগ্যামাস ; এদের ফুল এমনভাবে গড়া যে একটা বিশেষ প্রজাতির কীটই ভেতরে যেতে পারে, আর কেউ পারে না। সেইসব প্রজাতির কীটেরা ফুলের উজ্জ্বল রং, চুল, নকশা দেখে সরাসরি মধুভাণ্ডে যায়। পায় গর্ভকেশর বা পুংকেশর। মধুভাণ্ড খুঁজে পেতে কীটপতঙ্গকে কষ্ট করতে বা সময় নষ্ট করতে হয় না। অবশ্য ফুলের মধুলোভী কীটপতঙ্গও এ ব্যাপারে এতই পটু যে তারাও বিশেষ বিশেষ ফুলেই শুধু মধু পান করতে যায়। ফুল ও কীটপতঙ্গ একে অপরের জন্যই সৃষ্ট। এইসব কীটপতঙ্গের দেহে এমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে যা দিয়ে সহজেই এরা মধুকোষ থেকে মধু ও পরাগরেণু সংগ্রহ করে, উড়েও যায়। কীটপতঙ্গদের পছন্দমাফিক ফুলকে একাধিক ভাগে ভাগ করা যায়। আমরা পাই হাইমেনপ্টেরা ফুল, যাদের মধুভাণ্ড লুকানো, যাদের ফুলের গঠনযন্ত্র অত্যন্ত জটিল। হাইমেনপ্টেরা প্রজাতির কীটপতঙ্গ যেমন মৌমাছি, ভোমরা ও ছুতোর মৌমাছিরা খুবই বুদ্ধি খরচ করে ফুলের গঠনযন্ত্রকে চালায়। স্ক্রফুলারিয়া *(Scrophularia)*, আইরিস *(Iris)*, প্রাইমুলা *(Primula)*, অ্যাকোনিটাম *(Aconitum)*, ল্যাবিয়েটি *(Labiatae)*, অর্কিড, প্যাপিলিওনেসি *(Pailionaceae)* ইত্যাদি এই ধরনের ফুল। লেপিডপ্টেরা ফুলের মধুকোষের নল লম্বা। নলের শেষে আছে মধুভাণ্ড। লুকানো কিন্তু পরাগরেণু বহনকারী পরাগকোষ থাকে বাইরে মুক্ত অবস্থায়। মধুপানের সময় প্রজাপতি ও মথের বসার জায়গা কখনও থাকে, কখনও থাকে না। লিলি, ফ্লক্স *(Phlox)*, ডায়াস্থাস *(Dianthus)* ইত্যাদি প্রজাপতি-আকর্ষণ ফুল। লোনিসেরা *(Lonicera)*, স্যাপোনারিয়া *(Saponaria)*, ইত্যাদি ফুল মথকে আকর্ষণ করে। ডিপ্টেরা ফুল সাধারণত সাদা বা নীল রঙের। এদের মধুকোষে খুব সহজে পৌঁছানো যায়। যেমন যায় ভেরোনিকা *(Veronica)* ফুলে। অনেক ক্ষেত্রে মধুকোষ আংশিক লুকানো থাকে। যেমন অ্যারাম *(Arum)*, অ্যারিস্টোলোশিয়া *(Aristolochia)*, অ্যাসক্লেপিয়েডেসি *(Asclepiadaceae)* ইত্যাদি ফুলে। ফাইকাস *(Ficus)* একটা বিশেষ ফুল যাতে ক্যালসিডয়েড প্রজাতির স্ত্রী বোলতা *(Blastophaga)* পরাগমিলন ঘটায়।

বাগানের অধিকাংশ ফলের গাছে, তরিকারির গাছে, শিম, বরবটি, বীন ও কড়াইশুটি গাছে, তৈলবীজ, কার্পাস, তামাক, কফিতেও গবাদি পশুর খাদ্যে ও অন্যান্য ভেষজ গাছে পরাগমিলন ঘটায় কীটপতঙ্গেরা। ফলের বাগিচায় মৌচাক রাখার বন্দোবস্ত করলে ফলন বাড়ে। কীটপতঙ্গেরা নিয়মমাফিক কাজ করলে বা বিদ্রোহ করলে মানুষ কখনই ডাল, তৈলবীজ, কার্পাস, আম, কমলালেবু, আপেল, নাসপাতি, ডুমুর ইত্যাদি বহু গাছের ফলন পেত না। অপুষ্টি, অনাহারে অর্ধেক মানুষ মারা যেত, জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান হত।

দ্বিতীয় আর একধরনের হিতকারী কীটপতঙ্গ আছে যারা বিভিন্ন ধরনের আগাছা খেয়ে তাদের বৃদ্ধি রোধ করে, মানুষের উপকার করে। আমাদের শস্যক্ষেত্র বা বাগানে বা বাড়ির খিড়কিতে যত আগাছা হয়, তাদের প্রত্যেকটা কোনো না কোনো কীটপতঙ্গের খাদ্য। তাই আগাছায় মাঠ, ঘাট, ক্ষেত ছেয়ে যায় না। আগাছা ধ্বংসকারী কীটপতঙ্গদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কাঁটাজাত নাগফণীর আঙুরেপোকা ড্যাকটাইলোপিয়াস টমেন্টোসাস *(Dactylopius tomentosus)*। প্রায় চল্লিশ বছর আগে দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র ফসলের হানি করেছিল সাধারণ এই কাঁটাভরা পুনসিয়া *(Opuntia)* আগাছা। দেখা গেল, মাঠে ঘাটে সর্বত্র এরা দুর্ভেদ্য বেড়ার সৃষ্টি করেছে। পরে দেখা গেল আঙুরেপোকা এমনভাবে এইসব আগাছার ওপর বংশবৃদ্ধি করেছে যে কিছুদিনের মধ্যেই আগাছাই নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

তৃতীয় ধরনের হিতকারী কীটপতঙ্গ হল লুঠেরা ও পরাশ্রয়ী কীটপতঙ্গ। এরা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গদেরই আক্রমণ করে। শত্রুর শত্রু বলে এরা আমাদের বন্ধু, সাহায্যকারী, 'ক্ষতিকর' কীটপতঙ্গের বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধে 'পঞ্চম বাহিনী' গেরিলাযোদ্ধা কীটপতঙ্গের দুর্ভাগ্য ও মানুষের অপার সৌভাগ্য যে, কীটপতঙ্গের অপ্রশম্য শত্রু কীটপতঙ্গই। এই ঋণ আমরা কোনদিন কোনোভাবেই শোধ করতে পারব না। সাধারণ লুণ্ঠনকারী কীটপতঙ্গেরা হল প্রেইং ম্যানটিড, জলফড়িং, সিসিনডেলিড, ক্যারাবিড, গয়ালপোকা, ভীমরুল, বোলতা, পিঁপড়ে, ডাকাতেমাছি। সারাদিন ধরে এরা অগুন্তি ফড়িং, ঝিঁঝিঁপোকা, মাছি, মশা, শুঁয়োপোকা, এফিড ও অন্যান্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে। নিশ্চিন্ত ভাবে জানে কোথায় শিকার পাওয়া যাবে, কিভাবে কৃষিপোকাদের মারতে হবে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের এই জ্ঞান মানুষের কিন্তু নেই। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গকে ধ্বংস করতে তাই মানুষকে সাহায্য নিতে হয় এইসব বন্ধু পোকামাকড়দের উন্নত জ্ঞানের। লুণ্ঠনজীবী কীটপতঙ্গই শুধু নয়, কীটপতঙ্গের দেহে যেসব পরজীবী কীটপতঙ্গের বাস, তারাও আশ্রয়দাতার আয়ুসীমা কমিয়ে দেয়। নব্বুই শতাংশের মৃত্যুর কারণ এই পরজীবীরা। সন্দেহের উদ্রেক না করে এবং অতীব দক্ষতার সঙ্গে পরজীবী কীটপতঙ্গেরা আশ্রয়দাতার ডিম, শূককীট, গুটি ইত্যাদি আক্রমণ করে। খুঁজে বের করে সবচেয়ে দুর্বলদের। একজন চাষী কিন্তু এত ভাল খোঁজ পায় না। ধ্বংসলীলা চলে সুনিপুণভাবে। ভারতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরজীবীরা হাইমেনপ্টেরা ও ডিপ্টেরা গোষ্ঠীভুক্ত। হাইমেনপ্টেরা প্রজাতির দেহে সাধারণত থাকে ব্র্যাকোনিড *(Braconids)*, ইকনিউমনিড *(Ichneumonids)*, ইভানাইড *(Evaniids)*, ক্যালসিডয়েড *(Chalcidoids)*, প্রকটোট্রাইপিড *(Proctotrypids)*, ও বেথিলিড *(Bethylids)*। আর ডিপ্টেরার বড় শত্রু হল ট্যাকিনিড *(Tachinids)*।

ভারতে পরিচিত পরজীবী কীটপতঙ্গের সংখ্যা কম করে হাজার পাঁচেক। এখনও অনেক আবিষ্কৃতই হয়নি। প্রায় সকলেই এরা মানুষের উপকারী বন্ধু। এত স্বল্প পরিসরে এদের স্বভাব ও জীবনের ইতিহাস নিয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। কয়েকটা উদাহরণ দেব। ধানক্ষেতের ক্ষতি করে যে ফড়িং তার ডিমে পরাশ্রয়ী হিসেবে থাকে প্রকটোট্রাইপিড

সেলিও *(Scelio)*। পূর্ণাঙ্গ ফড়িংকে আশ্রয় করে ট্যাকিনিডরা। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় সত্তর শতাংশের বেশি ফড়িংয়ের ডিমে পরজীবী কীট রয়েছে। খাদ্যশস্যের পাতা খায় যে শুঁয়োপোকা, তাদের দেহে থাকে ব্র্যাকোনিড জাতের পরজীবী যেমন অ্যাপানটেলিস *(Apanteles)* এবং ক্যালসিডয়েড জাতের পরজীবী ব্র্যাকিমেরিয়া *(Brachymeria)*। ক্যালসিডয়েড ট্রাইকোগ্রামা *(Trichogramma)* এক থেকে দুই মিলিমিটার দীর্ঘ খুদে মাছি। এরা হাইমেনপ্‌টেরাস পরজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী। নানা জাতের লেপিডপ্‌টেরার ডিমকে আক্রমণ করে। সব লেপিডপ্‌টেরাই কৃষি, খাদ্য ও অরণ্যসম্পদের শত্রু।

মানুষের কাজে কীটপতঙ্গ

মানুষ দ্রুত বুঝতে পেরেছিল পরজীবী ও লুঠেরা কীটপতঙ্গ ক্ষতিকর প্রজাতিদের ধ্বংস করতে কতখানি অগ্রণী ভূমিকা নেয়। দুইজন বিশিষ্ট আমেরিকান কীটতত্ত্ববিদ হলেন হাওয়ার্ড ও রাইলি। এদের মাথায় আসে পরীক্ষাগারে যদি এইসব লুঠেরা ও পরাশ্রয়ী কীটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধি করানো যায় এবং তাদের মাঠে মাঠে বাগানে ছেড়ে দেওয়া যায় তবে অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গেব মোকাবিলা করা যাবে। পদ্ধতিকে বলা হয় জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ। আমেরিকায় ও ভারতে বেশ কিছু ক্ষতিকর কীটপতঙ্গকে লুঠেরা ও পরজীবী কীটপতঙ্গের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়েছে। শত্রু কীটপতঙ্গের বিরুদ্ধে বন্ধু কীটপতঙ্গকে মানুষ টাকা দিয়ে পুষছে।

ভারতে প্রথম ও সবচেয়ে সফলভাবে লুঠেরাকে কাজে লাগাবার ঘটনা হল দক্ষিণ ভারতে ছেঁদা-বাঁশি পোকা পেরিসেরিয়া পারচেজি *(Pericerya purchasi)*-র হাত থেকে রক্ষা পেতে গয়ালপোকা রোডোলিয়া কার্ডিনালিস *(Rodolia cardinalis)*-এর ব্যবহার। ছেঁদা-বাঁশি পোকা গোড়ায় ছিল অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা, খাদ্য ছিল বাবলা গাছ। ফলের গাছ বা শস্যক্ষেত্রের তেমন ক্ষতি করেছে বলে শোনা যায়নি। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে অস্ট্রেলিয়া থেকে দক্ষিণ ভারতে কিছু বাহারে বাবলা গাছ নিয়ে আসা হয় রাস্তা সাজানোর জন্য। সেই সঙ্গেই চলে আসে এই পোকা। অত্যন্ত দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি করে এরা ছড়িয়ে পড়ে নীলগিরি পর্বতমালার ফল বাগিচায়। ফলের কারবার শিকেয় ওঠার জোগাড়। তখন আমেরিকার দেখাদেখি ওইখান থেকে গয়ালপোকা আনিয়ে মাঠে ঘাটে চাষ করে ছেড়ে দেওয়া হয় দক্ষিণ ভারতের অঞ্চলে। ফলে চাম পোকার সংখ্যা দ্রুত কমে যায়। আঙরেপোকা ডাকটাইলোপিয়াস টমেন্টোসাস *(Dactylopius tomentosus)* দিয়ে কাঁটাভরা নাগাফণীর নিধন যজ্ঞও হয়। আগেই এর আলোচনা হয়েছে। মথ-বোরার শুঁয়োপোকা আখ গাছের রস আর সেগুণ গাছের পাতা খেয়ে ক্ষতি করে। এদের ডিমে পরাশ্রয়ী কীট হল ট্রাইকোগ্রামা *(Trichogramma)*। এই পরাশ্রয়ী কীটের সাহায্যে শুঁয়োপোকার ডিমকে ধ্বংস করা হয়। পরাশ্রয়ী পোকাকে লালন করা হয় কক্রাইয়া সেফালোনিকা *(Cocryra cephalonica)* প্রজাতির ডিমে। এই পরাশ্রয়ী শূককীটকে পরীক্ষাগারে বাড়ানো হয় গুঁড়োকরা জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা

ইত্যাদি শস্যে। মথের ডিম সুবিধামত আকারের কার্ডবোর্ডে আটকে রেখে দেওয়া হয়। স্ত্রী ট্রাইকোগ্রামা এই মথের শরীরেই ডিম পাড়ে। ডিমগুলোকে ক্ষেতে আখের গায়ে বা অন্য গাছে লাগিয়ে দেওয়া হয়। ডিম ফুটে পরজীবী কীট বেরিয়ে এসে আখের পাতায় ক্ষতিকর আখের মথ-বোরার খুঁজে তার শরীরে প্রবেশ করে এবং সেখানেই ডিম পেড়ে রাখে। শস্যক্ষেত্রে হানা দেবার আগেই মথ দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। ক্ষেত্রে পরজীবী কীট ছড়ানোর বেশ কিছু সময় পর দ্বিতীয়বার ছাড়ার প্রয়োজন হয়। পরীক্ষাগারে পরজীবী ট্রাইকোগ্রামা উৎপাদন এবং ঠাণ্ডা ঘরে রেখে প্রয়োজন মতো দূরদূরান্তরে শস্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে ফসল-সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে। পরাশ্রয়ী ও লুণ্ঠনজীবী কীটপতঙ্গ সত্যিই যে মানুষের হিতকারী বন্ধু আজ তা স্বীকৃত। সুবিধা হল, এরা নির্দিষ্ট শত্রুকেই ধ্বংস করে যেখানে রাসায়নিক কীটনাশক ছড়ালে ধ্বংস হয় ব্যাপকতর।

জমাখরচের হিসাব

কীটপতঙ্গের মানুষের তথা মানুষের সঙ্গে কীটপতঙ্গের যোগাযোগ ভারতে অতি প্রাচীন। মানুষ যখন পৃথিবীতে প্রথম পা রাখে পৃথিবীর কীটপতঙ্গ তাকে স্বাগত জানায় এবং পরস্পর একে অপরের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। ভারতীয় চাষী ও ভারতীয় কীটপতঙ্গ নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নেয়, অল্পবিস্তর রক্ষা করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। অন্যান্য জীবজন্তুরাও এতে সামিল হয়। শান্তিতেই বাস করছিল তারা, উভয়ের ভালমন্দকে মানিয়ে নিচ্ছিল, অংশীদারিত্বের কোড তৈরি হচ্ছিল। শস্যক্ষতি গড়ে কম হচ্ছিল। কৃষক যা ফসল উৎপন্ন করত, 'উপকারী' কীটপতঙ্গেরা দেখত যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল জন্মায়। ভারতীয় বর্ষা, খরা ও বন্যার ভীমরতি এবং ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। কিন্তু কীটপতঙ্গ যে পরিমাণ ফসল নষ্ট করে, তার জন্য মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হয়নি। কোনদিন অনাহারের জন্য কীটপতঙ্গ দায়ী নয়। কীটপতঙ্গ মাঠে ঘাটে ক্ষেতে ছড়িয়ে থাকে কিন্তু কৃষকেরা তা ঠিক বুঝতে পারত না। মানুষ যেমন ভুলে যায় তার পাকস্থলীর কথা। আবার একদিন যখন পেটে ব্যথা হয়, তখনই বোধ হয় একটা কিছু আছে। মানুষ জানে 'ক্ষতিকর' কীটপতঙ্গ ধ্বংস করবে প্রকৃতিরই নন্দীভৃঙ্গী। তাদের কাজ তারাই করুক।

মানুষ ও কীটপতঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ভারতে একরকম; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্য রকম। আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান আমাদের তুলনায় অনেক উন্নত ও আধুনিক। মনে হতে পারে ভারতের কীটপতঙ্গ প্রকৃত ভারতীয়দের মতো অহিংসা ও ধর্মে বিশ্বাসী। আমেরিকার কীটপতঙ্গদের এইসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। ভারতের কৃষিশিল্প সাত হাজার বছরের পুরানো। বেশিও হতে পারে। আমেরিকার চাষবাস এই সেদিনের। আমেরিকায় বসতি স্থাপনের সময় নতুন দেশে অনেক পুরানো পরিচিত শস্যের বীজ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমেরিকার আদিম কীটপতঙ্গেরা এইসব শস্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও শস্য হানিতে তৎপর হয়। ঔপনিবেশিকরা যখন শস্য বীজ নিয়ে গেল, তখন

পুরানো পৃথিবীর শস্যভোজী কীটপতঙ্গও সঙ্গে গেল। পুরানো পৃথিবীতে এইসব কীটপতঙ্গ অতটা ক্ষতিকর ছিল না। তাদের তাঁবে রেখেছিল তাদের শত্রুরা, যেমন লুণ্ঠনকারী ও পরজীবীরা। কীটপতঙ্গদের প্রাকৃতিক শত্রুরা কিন্তু আমেরিকায় যেতে পারেনি। ফলে পুরানো পৃথিবীর কীটপতঙ্গেরা নতুন বসতিতে পুরানো শস্যে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। আবার পুরানো ফসলের সঙ্গে সঙ্গে নতুন স্বাদের ফসল যেমন ভুট্টায় আকৃষ্ট হয়। এবং শত্রু বনে যায়। ভারতের মত নতুন বাসিন্দারা প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনতে পারেনি। সময়ও ছিল না তাদের হাতে। স্বভাবসিদ্ধ দ্রুততায় আমেরিকাবাসীরা ফসল ফলপাকড় ফলানোর নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে। পারস্পরিক ভাল এতে সম্ভব হয়নি।

আসলে আমাদের বিশেষজ্ঞরা বুঝতেই পারেন না "অধিক ফসল চাই" নীতির ওপর ভিত্তি করে যে তথাকথিত উন্নত আধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর হয়ে পড়ছি আমরা, তাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্যই নষ্ট হচ্ছে। প্রাচীন ভারতের কৃষকেরা প্রকৃতিনির্ভর ছিল। কীটপতঙ্গেরা যদি ক্ষতিকর হয়েই থাকে, তার জন্য দায়ী কিন্তু কৃষিকাজে আধুনিক উন্নতি আনার জন্য চাষীদের বাধ্য করার প্রচেষ্টা।

আমরা যখন বিষাক্ত রাসায়নিক কীটনাশক ডিডিটি *(DDT)*, বি এইচ সি *(BHC)* ইত্যাদি ছড়াই তখন দুর্ভাগ্যবশত ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমরা হিতকর বন্ধু কীটপতঙ্গেরও জীবনহানি ঘটাই। 'হিতকর' কীটপতঙ্গরাই এতদিন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরিশ্রম করেছে। এদের মেরে ক্ষতি করছি আমরাই। দোষ দেব কাকে? কীটনাশক বস্তুতে এতই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ক্ষতিকারকরা যে এদের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে, তাদের প্রাকৃতিক শত্রুরাও কিছু করতে পারছে না। ফলে আগের চেয়ে আরও দ্রুত এদের বংশবৃদ্ধি ঘটছে। কীটনাশক ছড়িয়েও কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। আরও জোরালো কীটনাশক ব্যবহার করছি আমরা। তাতেও ফল হচ্ছে না। হিতকারী কীটপতঙ্গের সংখ্যা জোরালো কীটনাশক ব্যবহারের ফলে কমে গেছে। অদ্ভুত এক আবর্ত চক্র। দুইভাবে অপরাধ করছি আমরা। প্রথমে ভাঙছি কীটপতঙ্গদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি, দ্বিতীয়ত বন্ধুদের মারছি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপদ্ধতি চালু করতে গিয়ে।

ভারতে আরও একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। কীটপতঙ্গ যদি একেবারেই না থাকে, তাহলে আমরা বেশি ফসল ফলাতে পারতাম যাতে ভারতে কেউ অভুক্ত থাকত না। এটা নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকবার ছল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কীটপতঙ্গ মানুষের যা ক্ষতি করে সেই অনুপাতে ভারতে এই ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম। সকল কীটপতঙ্গ মিলে যা ক্ষতি করে তার থেকে অনেক বেশি ভাল করে, এবং এই উভয় দেশেই। জমা খরচের হিসাবে কৃতিত্বটা কীটপতঙ্গদেরই। সব দিক চিন্তা করলে মানুষ কীটপতঙ্গের কাছে সর্বতোভাবে ঋণী, কীটপতঙ্গ প্রতি বছর ফল ফসলের গরু ছাগলের, কাঁচামাল-তৈরি মালের, জনস্বাস্থ্যের যা ক্ষতি করে তার থেকেও বেশি সে মানুষকে পাইয়ে দেয়। তার সঙ্গে তো আবর্জনা সাফাই, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, আগাছা পরিষ্কার করা—এগুলো

আছেই। এই সবের খরচ যোগ করে, দেখবে ঋণের বোঝা কত। কিন্তু মানুষ কি সেই ঋণ শোধ করে? আর করবেই বা কেমন করে? সোজা কথায়, ঋণ অপরিশোধ্য। তবে বন্ধুত্ব দিয়ে, সমঝোতা দিয়ে ঋণের বোঝা হয়তো বা খানিকটা লাঘব করা যায়।

ভারতে কীটপতঙ্গদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার কাজে খুবই উত্তেজনা আছে। পুরস্কারও মিলতে পারে। এদের বিষয়ে আমরা কতটুকুই বা জানি? অনুভব করবার মন নিয়ে যদি এগোই, দেখব এরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বহু সমস্যার আংশিক বা পূর্ণ সমাধান করছে, অবশ্য নিজেদের মতো করে। অনেক সময়ে আমাদের পন্থা ইঁদুরের, অন্য সময়ে ওদের। সমস্যা সমাধানে উভয়েই সফল। ফল একই। আসলে মানুষ ও কীটপতঙ্গ উভয়েই পরস্পরের জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, এরা একে অন্যের ওপর গভীরভাবে নির্ভর করে। মানুষই হোক আর কীটপতঙ্গই হোক, সর্বক্ষেত্রে জীবন একইরকম। 'একোবাসি সর্বভূতারান্তরাত্মা''—সর্বভূতে ঈশ্বর।

নির্দেশিকা

Lasertypeset at Meghna Computer Service, Calcutta-700006
and printed at The Central Electric Press, New Delhi-110028